রজত জয়ন্তী

সমরেশ মজুমদার

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

RAJAT JAYANTI

by

Samaresh Majumder

First Published,
January, 1960

Price
Rs.80/- Only.

ISBN 81-7332-132-2

প্রথম প্রকাশ

বইমেলা, ১৯৬০

দাম

৮০ টাকা

গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে এস. বি. নায়ক কর্তৃক
প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪এন, ডাঃ এস.
সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

যেখানে যা আছে

অ ম রা ব তী র দ র জা য়

দু'পকেটে দু' হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল নায়োরবি। সমানে একটা ছোট্ট বাগান। বাগানের এক পাশ দিয়ে সিঁড়িটা নেমে গেছে রাস্তায়। সাউথ ব্রঙ্কসের এই তল্লাটে বাড়িগুলো পরস্পরের সঙ্গে এমন গা লাগিয়ে যে কেঁচোর মত রাস্তাগুলোকে খুঁজে বের করাই মুশকিল। দরজায় দাঁড়াতেই এক ঝলক বাতাস এলো। নোন্তা নোন্তা বাতাস। পকেট থেকে হাত বের করল সে। বারো ডলার হাতের মুঠোয়। এই ঘর খুঁজলে আর একটাও সেন্ট পাওয়া যাবে না। সারা পৃথিবীতে তার সম্বল বারো ডলার।

চাতালে এসে দাঁড়াতেই সে পার্লকে দেখতে পেল। নিজের ঘরের জানালায় পার্ল একটা ব্রা পরে নিশ্চয়ই দাঁড়াতে পারে। কিন্তু পার্ল যা বলতে পারে তাই বলল, 'হাই হোয়াইটি!'

নায়োরবির চোয়াল শক্ত হল। কিন্তু চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নেওয়া ছাড়া সে যখন কিছুই করল না, তখন বিশ্রী রকমের একটা হাসি ছুঁড়ে পার্ল জানলা ছেড়ে চলে গেল। দিস ইজ ব্যাড, ভেরি ব্যাড। বিড়বিড় করল নায়োরবি। এ পাড়ার সবাই তাকে বিদ্রূপ করে হোয়াইটি বলে ডাকে। ডেকে মজা পায়। যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় এবং সেখানে পড়াশুনা চালাবার জন্যে জেদ ধরে তাদের সবাই হোয়াইটি বলে ডাকে, ঠাট্টা করে। বিয়ারের খালি ক্যান ছুঁড়ে মারে। স্কুল শেষ করে নায়োরবি যে আর একটু এগিয়েছিল সেটা মিসেস জোন্সের জন্যেই। বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। ভদ্রমহিলার বাড়ি বোস্টনে। পাঁচ বছরের মা-মরা সতীনপুত্রকে ভদ্রমহিলা অস্বাভাবিকভাবেই ভালবেসে ফেলেন। হাইস্কুল শেষ করার পর নায়োরবি যখন নাটকের কলেজে ভর্তি হতে চাইল তখনও তিনি আপত্তি করেন নি। কলেজে গ্রাজুয়েশন কোর্সে ভর্তি হবার ক্ষমতা নায়োরবির ছিল না। অত টাকা মিসেস জোন্স দশ ঘণ্টা কাজ করেও জমাতে পারেননি। ভদ্রমহিলা মারা গেলেন মাস তিনেক আগে। র‍্যালফ হাউসের সামনে গুলি চলছিল। বিকেলে পাড়ার একজন ক্যারিয়ার খুন হয় তার বদলা। মিসেস জোন্স তার মধ্যে পড়ে গেলেন। হাসপাতালে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

দরজাটা বন্ধ করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এল নায়োরবি। ছেলেগুলো এখনই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। চোখাচুখি হতেই একজন চেঁচাল, 'হাই হোয়াইটি।'

নায়োরবি হাসল। তর্ক করে কোন লাভ নেই। ছুরি তো আছেই, পিস্তলও কেউ কেউ সঙ্গে রাখে। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল। ছেলেটা একটু প্রসন্ন হল। ওর নাম টিটো। এদের সে ছেলেবেলা থেকেই চেনে। টিটো চিৎকার করল, 'কামন হোয়াইটি! তোমাকে একটা সমাধান

করে দিতে হবে।' টিটো সঙ্গীদের নিচু গলায় কিছু বলতে তারা মাথা দোলাল। রাস্তা পার হয়ে নায়োরবি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জনা পাঁচেক। প্রত্যেকের চেহারা পোড় খাওয়া। টিটো জুলপির দুই ইঞ্চি কামিয়ে ফেলেছে। টিটো একটু ঝুঁকে দাঁড়াল, 'দ্যাখো হোয়াইটি, আমরা এই পাঁচজন, সবাইকে তুমি চেনো, চেনো তো? গুড! এই রাস্তাটা আমাদের। তোমার কাজ হল আমাদের গ্রেড ঠিক করে দেওয়া। স্ট্রীট-নলেজ যার বেশি সে 'এ' গ্রেড পাবে, তারপর বি সি ডি ই। ওকে?'

নায়োরবির একই সঙ্গে মজা এবং ভয় লাগছিল। এখনও এদের ছেলেমানুষী গেল না। সেইসঙ্গে নিজেকে সি ডি ই হিসেবে ভাবতে কেউ চাইবে না আর না চাইলে হাত মুঠো হবে।

সে মাথা নাড়াল, 'আমি তো কোন ফারাক দেখছি না। তোমরা যারা ক্র্যাক বিক্রি করে বেঁচে আছ তাদের প্রত্যেকেরই স্ট্রীট-নলেজ খুব ভাল, নইলে ব্যবসাটা করতে পারতে না।'

'শীট্! এটা এক ধরনের জ্ঞান দেওয়া। তোমাকে তার জন্যে ডাকিনি হোয়াইটি। যা বলছি তাই করো।' বলতে বলতে টিটো ঘুরে দাঁড়াল, 'হেই লিমো, ওকে এ্যাটেণ্ড কর।'

নায়োরবি দেখল, স্টিফেনদের ফাস্টফুডের দোকানের পাশের গলির ছায়ায় দাঁড়ানো লোকটার দিকে এগিয়ে গেল লিমো। যারা কিনতে আসে তারাও জানে কোথায় পাওয়া যাবে, কি দাম দিতে হবে। এক মিনিটের মধ্যেই তাই লিমোকে ফিরে আসতে দেখা গেল শিস্ দিতে দিতে।

'ইয়া হোয়াইটি।' টিটো থুতু ফেলল।

'লুক টিটো, আমি কালো হয়ে জন্মেছি, আমি বেঁচে আছি কালো হয়ে, আমি মারা যাব কালো হিসেবেই। সুতরাং কেউ আমাকে হোয়াইটি বললে আমার ভাল লাগে না।'

'হু কেয়ার্স? তুমি শালা স্কুলে পড়েছ, আমাদের সঙ্গে মেশোনি, রাস্তায় দাঁড়াওনি। তুমি সাদাদের নকল করতে চাও! কোন কালো মেয়ে তোমার সঙ্গে শুয়েছে? উত্তর দাও?'

'না। তার কোন দরকার হয়নি।'

'শী উইল নেভার আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইউর লাঙ্গুয়েজ। উই ওয়ান্ট মানি, উওম্যান এ্যাণ্ড গুড ফুড। দ্যাটস অল। আর এগুলো পেতে গেলে টেনসনে থাকতেই হবে। বুম বুম বুম। ও কে! এবার বল, আমাদের মধ্যে কাকে এ গ্রেড দেবে?' টিটো পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

নায়োরবি পাঁচজনের মুখের দিকে তাকাল পরপর। হঠাৎই প্রত্যেকটা মুখ প্রচণ্ড শক্ত হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকের চোখের তারা এখন স্থির। এইভাবেই প্রায় অকারণে এরা উত্তেজিত হতে খুব ভালবাসে। উত্তেজনা ছাড়া এদের বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু সেই সঙ্গে আক্রমণের আশংকা নায়োরবিকে ভীত করল। সে গলা পরিষ্কার করল, 'তার আগে আমাকে তোমাদের সম্পর্কে জানতে হবে।'

লিমো চেঁচিয়ে উঠল, 'হাপ্! সময় নষ্ট করছে হোয়াইটিটা।'

টিটো হাত তুলল, 'এখন কিছুক্ষণ হোয়াইটি বলবি না। ওয়েল, কি জানতে চাও?'

চটপট মাথা পরিষ্কার করে নিল নায়োরবি, 'কে প্রথম খুন হতে দেখেছে? কে নিজে কটা খুন করেছে? ক্র্যাক বিক্রী করতে গিয়ে কে ক'বার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে? রাস্তায় কাজ করতে এসে তোমাদের কার কি মনে হয়েছে? এসব প্রশ্নের জবাব চাই।'

লিমো চেঁচাল, 'হোয়াইটিটা প্রিস্টের মত কথা বলছে!'

টিটো সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে পা চালাল। ঝট করে সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচাল লিমো। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে অন্যদিকে তাকাল। টিটো এবার নায়োরবির দিকে এগিয়ে এল, 'তোমার কাছে কত ডলার আছে?'

'বারো ডলার।' ভয়ে ভয়ে জানাল নায়োরবি। সত্যি বলাই ভাল।

'এটা যখন ফুরিয়ে যাবে তখন তুমি কি করবে?'

'আই ডোণ্ট নো।'

'উইদাউট সাম ক্যাশ ইন ইওর পকেট ইউ এইন্ট নোবডি!'

নায়োরবি চুপচাপ মাথা নাড়ল।

'তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছ না কেন?'

'আই এ্যাম নট দ্যাট টাফ! ইফ ইউ আর সফ্‌ট ইউ আর লস্ট্‌।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসার আওয়াজ উঠল। পাঁচজনেরই কথাটাকে খুব পছন্দ হয়েছে।

টিটো বলল, 'ঠিক আছে, তুমি জো-কে চেনো?'

বাফেলো জো-কে কে না চেনে এখানে? চেহারার জন্যেই ওর খ্যাতি। ফর্টিসেকেণ্ড স্ট্রীটের একটা সেক্সশপে ডোরম্যানের কাজ করে জো। নায়োরবি মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আমি জো-কে তোমার কথা বলব। তুমি আজ বিকেলে ওর সঙ্গে দেখা কর।' টিটো কথাটা বলতেই নিকিকে দেখতে পেল সবাই। এই ভর-সকালেই থাই পর্যন্ত চামড়ার জুতো আর মিনি চামড়ার স্কার্ট পরে শরীর দুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দলের একট ছেলে শিস্‌ দিতে দিতে নিকির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'তোমার শুনলাম এইডস হয়েছে!'

সঙ্গে সঙ্গে শরীর বেঁকিয়ে তারস্বরে চিৎকার শুরু করল নিকি। পৃথিবীর সমস্ত কুৎসিত শব্দ একসঙ্গে ছুঁড়ে মারতে লাগল আকাশে। ছেলেরা হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল তাই শুনে। আশেপাশের বাড়ির জানলার অলস মুখগুলোকে দেখা গেল এবার। গালাগাল দিতে দিতে নিকি চলে যেতেই সিটি বাজল। সঙ্গে সঙ্গে টিটোরা লাফিয়ে গলিতে নামল। চোখের পলক ফেলার আগেই তারা উধাও। নায়োরবি কি করবে বুঝতে পারছিল না এবং তখনই পুলিশের গাড়িটাকে সে দেখতে পেল। পেট্রল গাড়িটা থেকে একটা কালো অফিসার চেঁচিয়ে উঠল, 'গেট অফ দ্য কর্ণার।' নায়োরবি পা চালাল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নামল অফিসার গাড়ি থেকে, 'হে বয়! স্টপ আই সে!' নায়োরবি দাঁড়াল। লোকটা তার সামনে পৌঁছালে সে কালো রিভলবারটাকে দেখতে পেল, 'ইউ আর স্লিপিং হেয়ার?'

নায়োরবি চটপট মাথা নাড়ল, 'নো।'

'তাহলে এখানে কি করছ?'

'আমি টেলিফোন করতে যাচ্ছি।'

'তুমি ওদের চেনো?'

'কাদের?'

'এ্যাই, তোমার পেটে এমন একটা লাথি মারব যে প্রশ্ন করা বেরিয়ে যাবে। দাঁড়াও।' অফিসার ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনের বাড়ির জানলার অলস মুখটাকে প্রশ্ন করল, 'হেই বাড্ডি, ডু ইউ নো হিম?'

'ইয়া! দে কল হিম হোয়াইটি!'

সঙ্গে সঙ্গে মুখটা হাসিতে ফুলে উঠল অফিসারের, 'ওয়া!' তারপর ফিরে গেল পেট্রল গাড়ির দিকে। ঠোঁট কামড়াল নায়োরবি। কালো অফিসার বলেই মজা পেল কথাটা শুনে। সে হাঁটতে লাগল। টিটোর কথাটা তার মাথায় পাক খাচ্ছিল, 'উইদাউট সাম ক্যাশ ইন ইওর পকেট ইউ এইন্ট নোবডি!'

রাস্তার মোড়েই বিগ ম্যাক-এর পাশে পরপর চারটে টেলিফোন। দুটোর বাক্স ভেঙে কেউ কয়েন কালেক্ট করে গেছে। দুটো এখনও সচল। পকেট থেকে কাগজ বের করে সে নাম্বার টিপল। সাড়া পাওয়ামাত্র সে মিসেস ওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। মিসেস ওয়ার্ড লাইনে এলে সে নরম গলায় বলল, 'আমি নায়োরবি, নায়োরবি জোন্স। আমাকে আপনার মনে আছে?'

'তোমার নাম্বার কি?'

'ওয়ান জিরো টু ফোর।'

'হোল্ড অন।'

টেলিফোন ধরে থাকল নায়োরবি। বিপ বিপ শব্দ হতেই আবার পয়সা ফেলল। মিসেস ওয়ার্ডের গলা পাওয়া গেল, 'সরি নায়োরবি, এখনও কোন খবর নেই।'

'আই নিড এ জব ম্যাম। আই উইল ডু গুড।'

'আই নো দ্যাট। তুমি আমাকে নেক্সট উইকে একটা ফোন করতে পার। ওহো, তোমার তো উনিশ বছর বয়স, তাই না?'

'ইয়েস ম্যাম, উনিশ বছর বয়স, গায়ের রঙ জেড ব্লাক, চুল অবশ্য খুব কোঁকড়া নয়—।'

'দ্যাটস গুড। শোন, ইণ্ডিয়া বলে একটা দেশের নাম শুনেছ?'

'কোথায় এটা?'

'ইট'স পার্ট অফ এশিয়া। বিগ কান্ট্রি বাট ভেরি পুওর।'

'ও। আমাকে কি করতে হবে?'

'ইণ্ডিয়া থেকে একটা পার্টি এসেছে নিউইয়র্কে স্যুটিং করতে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু এরা বেশী পেমেন্ট করতে পারবে না বলে আমি ইন্টারেস্ট নিচ্ছি না। কিন্তু

তোমার মত, লুক, এদের কাছে কাজ করলে তুমি কোন পয়েন্ট আর্ন করবে না, তবে সামান্য কিছু ডলার পেতে পার।'

'বেশ, আমাকে তারই ব্যবস্থা করে দাও।'

'ও কে! ঘণ্টা দুয়েক বাদে টেলিফোন করো।'

রিসিভার নামিয়ে নায়োরবি চারপাশে তাকাল। আইলিন আসছে। মেয়েটা ওর সঙ্গে পড়ত। চোদ্দ বছরেই গর্ভবতী হয়ে যায়। রুবেনের সঙ্গে প্রকাশ্যেই তখন হাত ধরে হাঁটত। রুবেন দশ বছরেই স্কুল ছেড়ে দিয়েছিল। ওই বয়সেই শরীরটা বেশ বড়সড় বলে আলি হবার স্বপ্ন দেখত। খুব হাত চালাতো সেই সময়। নিজেকে টাফ দেখানোর জন্যে কায়দাকরা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জামাকাপড় কিনত। সেই রুবেন জেনে গেল যখন পিস্তলের দরকার পড়বে তখন ঠিক কোন জায়গায় গেলে চটপট সেটা পাওয়া যায়। কিন্তু পনের বছরে পা দিতেই টিটোদের সঙ্গে মারপিটে রাস্তায় পড়ে গেল রুবেন। সাউথ ব্রঙ্কসে একবার যদি তুমি পড়ে যাও তো চিরকালের জন্যে পড়লে। পরদিন ইস্ট রিভারের জলে রুবেনের মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে। এখানে এটাই স্বাভাবিক ঘটনা, এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

আইলিন সামনে এসে বলল, 'হাই, এখানে দাঁড়িয়ে?'

'ফোন করছিলাম।'

'কোন দিকে যাবে?'

'ম্যানহাটন। তবে ঘণ্টাদুয়েক বাদে।'

আইলিন কাছে এল, 'আচ্ছা, তুমি এখন ঠিক কি কাজ করছ বল তো?'

'এ্যাক্টিং। ভাল সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'ইউ উইল নেভার গেট ইট।' আইলিন ঠোঁট বেঁকাল, 'কজন মরগ্যান ফ্রিম্যান হতে পারে? গতসপ্তাহে চেল্‌সাতে ওঁর 'ড্রাইভিং মিস ডেইজি' দেখেছি। ফ্যান্টাস্টিক।'

নায়োরবি বলল, 'ফ্রিম্যানকে গোল্ডেন গ্লোব নমিনেশন দেওয়া হয়েছে বেস্ট অ্যাক্টরের জন্যে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে কে দেবে? এইসব উল্টোপাল্টা ভাবো বলেই তোমাকে সবাই হোয়াইটি বলে। শোন, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। তুমি আমার বাড়িতে একটু আসবে?' আইলিনের গলার স্বর নরম হল। দু'ঘণ্টা অনেক সময়। নায়োরবি মাথা নাড়ল। আইলিনের বাড়িতে একটা টেলিফোন আছে। গেলে আর বাক্সে পয়সা ফেলতে হবে না।

সিঁড়ি ভেঙে বাচ্চাদের চিৎকার শুনতে শুনতে ওরা তিনতলায় উঠে এল। সিঁড়ি বারান্দা এমন নোংরা করে রাখাই এখানকার রেওয়াজ! সাউথ ব্রঙ্কস অথবা হার্লেম একই চরিত্র নিয়ে রয়ে গেছে। নায়োরবির মাঝে মাঝে মনে হয় পরিষ্কার হয়ে থাকলে সাদাদের নকল করা হবে বলেই কেউ সেভাবে থাকতে চায় না। বেশ কয়েকবার বেল বাজাবার পরে আইলিনের মাতাল বাপ দরজা খুলল। মেয়েকে দেখে জড়ানো গলায় বলল, 'বাড়িতে ক্লায়েন্ট আনতে

তোর মা নিষেধ করেছে, তবু সেটা কানে যায় না? তা এনেছিস যখন তখন আর কি করা যাবে! পাঁচটা ডলার দে, আমি একটু ঘুরে আসি।'

সঙ্গে সঙ্গে আইলিন কাক চিৎকার আরম্ভ করল, 'ইউ ব্লাডি বাস্টার্ড, মা যে কেন তোমার সঙ্গে ঘর করে? চোখের মাথা খেয়েছ বুড়ো শকুন, এত লোক প্রতিদিন রাস্তায় গুলি খেয়ে মরছে তুমি কেন যে মর না! ও মা! শুধু মদ খাওয়ার ধান্দা, ছি ছি ছি।'

অন্য ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বিভিন্ন বয়সী নারী পুরুষ দাঁত বের করে এই দৃশ্য দেখছিল। বুড়ো চোখ কচলালো, 'তুমি কে বাবা দেবদূত?'

নায়োরবি জবাব দিল, 'আমি নায়োরবি।'

'অ। তুমি! এখানে কি মনে করে? অ্যাঁ?'

আইলিন বলল, 'বাবার কথায় কান দিও না, ভেতরে এসো।'

ঘরে পা দতেই বোঁটকা রসুনের গন্ধ ধক্ করে নাকে এল। ছেঁড়া সোফার পাশে খালি মদের বোতল, জিনিষপত্র আগোছালোভাবে রাখা। আইলিনরা দুটো ঘর নিয়ে থাকে। তাকে দ্বিতীয় ঘরটায় নিয়ে গেল আইলিন। তিনটে বিছানা। তৃতীয়টা বাঙ্ক। দেওয়ালে আইলিনের ছেলের ছবি সযত্নে রাখা। এই ঘরটা অপেক্ষাকৃত ভদ্র।

একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে আইলিন নিজে বিছানায় বসল, 'আমি খুব ক্লান্ত।'

নায়োরবি কি বলবে বুঝতে না পেরে পা ফাঁক করে চেয়ারে বসল।

একটু সময় নিয়ে আইলিন বলল, 'শোন, এ্যাক্টিং-এর ধান্দা তুমি ছেড়ে দাও।'

'কেন? এটাই একমাত্র লক্ষ্য আমার।'

'কিন্তু তুমি জানো না, কবে তুমি সফল হবে।'

'জীবনের আর এক নাম হল লড়াই করা। লড়াই ছাড়া সাফল্য আসে না।'

'কিন্তু ফিল্ম বল আর ভিডিও বল, নাইনটি পার্সেন্ট চরিত্র হল সাদাদের জন্যে।'

'ছিল। এখন কালোদের নিয়ে সপ্তাহে দু'দিন সোপ অপেরা হচ্ছে।'

'তোমার তো কোনো গার্ল ফ্রেণ্ড নেই?'

'না।' হাসল নায়োরবি, 'আমার বন্ধুই নেই।'

'তুমি এই বয়স পর্যন্ত কোন মেয়ের সঙ্গে শুয়েছ? লুক, আমরা সেই ছেলেবেলাকার বন্ধু, তুমি স্বচ্ছন্দে জবাব দিতে পার।'

নায়োরবি মাথা নাড়ল, 'ইয়া। একবার। দুবছর আগে।'

'অদ্ভুত! তুমি কি মনে করো না এটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার? এ পাড়ার সব ছেলেই রোজ একবার—। থাক গে, আমি জানি তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রোজগার করবে না, অন্য কোন কাজের ধান্দা করছ না কেন? একটু খাটলেই দিনে তিরিশ ডলার কামাতে পার।'

'ভেবে দেখি। একজন আমাকে বাফেলো জো-এর সঙ্গে দেখা করতে বলেছে।'

'মাই গড। ও তোমাকে ফর্টিসেকেণ্ড স্ট্রীটে কাজ দিতে পারে।'

'তেমন দরকার হলে করতে হবে।'

'আরে তাই যদি করবে তো আমাকে বল।'

'কি করবে তুমি?'

আইলিন একটু এগিয়ে আনল শরীরটাকে, নিচুগলায় বলল, 'গত সপ্তাহে আমি সেক্সোফোনে জয়েন করেছি। ফর্টিসেকেণ্ড স্ট্রীট আর এইটথ্ এভিন্যুর মোড়ে। আমাকে শুধু জন্মদিনের পোশাকে বক্সের মধ্যে নাচতে হয়। কাউকে স্পর্শ করতে দিই না। কোম্পানি আমাকে আট ঘণ্টার জন্যে একশ ডলার পেমেন্ট করে। সপ্তাহে চারদিন। ওখানকার অফিসে কাজ পাইয়ে দিতে পারি তোমাকে।'

'খুব ভাল।' নায়োরবি হাসল, 'আমাকে যদি ওরা নাইট ডিউটি দেয় তাহলে করতে পারি। দিনের বেলাটা কাজে লাগাতে অসুবিধা হবে না।'

'আমার ছেলের ছবি দেখেছ?' দেওয়ালের দিকে তাকাল আইলিন।

'খুব সুন্দর।'

'ও এখন শিকোগায় আমার মাসীর কাছে আছে।'

'ও।'

'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি?'

'আমরা? একসঙ্গে?'

'হোয়াই নট? আমিও একা তুমিও একা। তারপর যদি ভাল লাগে বিয়ে করা যাবে। তুমি এখনই একটা সুন্দর বাচ্চাকে ছেলে হিসাবে পেয়ে যাবে। কেমন লাগছে ভাবতে?'

'নট ব্যাড। তবে নিজের ওপর একটুও ভরসা নেই আমার।'

'আমার ওপর ছেড়ে দাও সব। আসলে দূর থেকে তোমাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুব খারাপ লাগছিল। আমরা একসঙ্গে ছেলেবেলায় খেলেছি। আমরা পরস্পরকে জানি, তাই না? মনে হয় একসঙ্গে থাকতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।'

'আমার দিদির সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'ও!' মাথা ঝাঁকাল আইলিন, 'ও কখনই রাজী হবে না। ওরকম হাড়গিলগিলে বুড়ি কোন মেয়েমানুষকে সুখী দেখতে চায় না। তুমি কি বাচ্চা ছেলে যে দিদির অনুমতি নিয়ে আমার কাছে আসবে? ঠিক আছে, ভেবে দ্যাখো।' উঠে দাঁড়িয়ে আইলিন, 'আমাকে এখনই তৈরী হতে হবে। তুমি একটু অপেক্ষা কর।' আইলিন ঘরের বাইরে চলে গেল।

নায়োরবি চুপচাপ বসে রইল। তার বেশ মজা লাগছিল। এই প্রথম কোন মেয়ে তাকে এই ধরনের প্রস্তাব দিল। আইলিন এখনও কুমারী। কুমারী মেয়ে এমন প্রস্তাব দিতেই পারে। আসলে চৌদ্দ বছর বয়সে যখন ওর পেট বিশ্রী রকমের দেখতে হল শেষ পর্যন্ত তো ও বন্ধুই ছিল। এ পাড়ায় কুমারী মায়ের সংখ্যা প্রচুর। জীবনের শুরুতেই একবার মা হয়ে নেয় তারা। বছর দশ পনের বাদে বিয়ে-থা হলে দ্বিতীয়বার মা হওয়া এখন ফ্যাসান।

'আমার দিকে তাকিও না, আমি এখন চেঞ্জ করব।' বলতে বলতে আইলিন ঘরে ঢুকল। ওর হাতে স্কার্ট জামা আর অন্তর্বাস।

নায়োরবি হাসল, 'তুমি যে কাজ কর তার পরেও দেখছি লজ্জা পাও।'

'সেখানে চারপাশে দেওয়াল থাকে। কেউ আমার কাছে পৌঁছাতে পারে না। তুমি প্রভোকড হতে পার। উপোসী বাঘ তো।' আইলিন মিষ্টি হাসল।

'আমি একটা ফোন করতে পারি?' উঠে দাঁড়াল নায়োরবি।

'নিশ্চয়ই। ওখানে রিসিভার আছে।'

নায়োরবি এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে আইলিনের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

মিসে ওয়ার্ড লাইনে এলে সে নিজের পরিচয় দিল, 'আমি নায়োরবি, ওয়ান জিরো টু ফোর।'

'ও হ্যাঁ। তোমার জন্যে সুখবর আছে। ঠিক চারটের সময় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টারের সামনে চলে যেও। সেখানে স্যুটিং পার্টিকে দেখতে পাবে। ডিরেক্টারের নম রয়। তোমাকে নিউ ইয়র্কের একটা ভিখিরীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। চার-পাঁচটা ডায়লগ আছে।'

'মেক আপ?'

'ক্যারি ইওর ওন কিটস্। পঞ্চাশ ডলার পাবে এবং তা থেকে আমাদের কিছু দিতে হবে না। বাই।' লাইন কেটে গেল। জোরে নিশ্বাস নিল নায়োরবি। পঞ্চাশ ডলার এখন তার কাছে কম নয়। সে পেছনে না ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি এখন একটু বাড়িতে যেতে পারি?'

'কেন?' আইলিনের গলা ভেসে এল।

'একটা অভিনয়ের কাজ পেয়েছি। জিনিসপত্র নিতে হবে। বিকেল চারটের মধ্যে পৌঁছাতে হবে।'

'ও। তা আমাকে একবার দেখবে না?'

আইলিনকে দেখল নায়োরবি। দেখে বলল, 'সুন্দর।'

উঁচু গলায় হেসে উঠল আইলিন, তারপর বলল, 'দশ মিনিটের মধ্যে বিগম্যাকের সামনে চলে এস। অবশ্য আমার কাজের জায়গায় যদি যেতে চাও।'

দিদির আসার সময় নয় এটা। নিজের ঘরে ঢুকে ব্যাগ গুছিয়ে নিতে নিতে নায়োরবি বেশ উত্তেজনা বোধ করছিল। এ্যাক্টিং কোর্স অনেক কিছুর মত তাকে মেক আপ করাও শিখতে হয়েছে। মিনিট তিনেকের মধ্যে নিজের চেহারা বদলাতে পারে সে।

ব্যাগ নিয়ে বিগম্যাকের কাছে পৌঁছাতেই আইলিন এসে গেল। পাশাপাশি হাঁটার সময় আইলিন বলল, 'আমার জীবনে তুমিই হলে প্রথম পুরুষ যে শরীর দেখেও উত্তেজিত হয় না।

নায়োরবি শব্দ করে হাসল, কিছু বলল না জবাবে।

ইয়াঙ্কি স্টেডিয়াম থেকে ডি ট্রেন ধরল ওরা। এইসময় পাতাল ট্রেন একটু ফাঁকা থাকে। পাশাপাশি বসে আইলিন ওর হাঁটুতে হাত রাখল, 'আমি কিন্তু খুব সিরিয়াস।'

'কিন্তু মনে রেখো পাড়ার সবাই আমাকে হোয়াইটি বলে।'

'আমি ওটা মুছে দেব।'

'আর একটা ব্যাপার তোমার জানা দরকার। টিটো আমাকে কাজের অফার দিয়েছে।'

মুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল আইলিন, 'তুমি নিয়েছ?'

'না, এখনও নিইনি।'

'তাহলে নিও না। আমি রুবেনকে ভুলতে পারি না। অফকোর্স একটি মানুষ মরে গেলে তাকে সবসময় আঁকড়ে থাকা যায় না। কিন্তু টিটোরা ওকে মেরেছে এটাও তো ঠিক।'

'তুমি পুলিশকে বলনি কেন?'

'কি লাভ হত? আমার বাচ্চাকে ওরা মেরে ফেলতে পারত।'

ঝুপঝুপ করে একশ পঁয়ত্রিশ স্ট্রিটের স্টেশনগুলো পার হয়ে যাচ্ছে। রকফেলার স্টেশন আসামাত্র ওরা উঠে পড়ল। এখন পৌনে দুটো বাজে। ফর্টিসেকেণ্ড স্ট্রীটের বাইরে এসে নায়োরবি বলল, 'আমাকে আর দু'ঘণ্টার মধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেডে পৌঁছাতে হবে। মনে হচ্ছে এখন তোমার ওখানে না যাওয়াই ভাল।'

আইলিন জিজ্ঞাসা করল, 'লাঞ্চ করেছ?'

'না।'

'ঠিক আছে, ওই ম্যাকডোনাল্ডে চল। তোমার স্যুটিং শেষ করে যদি রাত দশটার মধ্যে আসতে পার তাহলে কথা হবে। আমি তোমার কথা বলে রাখব।'

'লুক বেবি, আমার কাছে দশ-বারো ডলার আছে।' ম্যাকডোনাল্ডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে স্পষ্ট জানিয়ে দিল নায়োরবি।

'শীট! তোমাকে কে বলেছে খরচ করতে?'

দুটো বিগম্যাক আর কালো কফি নিয়ে এল আইলিন। রঙিন টেবিলে সেগুলো রেখে মুখোমুখি বসল ওরা। ম্যাকডোনাল্ডে খাবার সস্তা। কিন্তু ব্রঙ্কসের অনেক দোকানে এর চেয়ে সস্তায় খাবার পাওয়া যায়। এখন চারপাশে প্রচুর সাদা, বাদামী, তামাটের ভিড়। সন্ধ্যে হয়ে গেলেই এ পাড়াতে কালোর সংখ্যা বাড়ে। চুপচাপ খাচ্ছিল নায়োরবি। বিগম্যাকের একটা টুকরো গিলে আইলিন বলল, 'তুমি একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছ।'

'কি রকম?'

'আমি বুঝতে পারছি না। তুমি ঠিক কি চাও?'

'আমি, আমি একজন অভিনেতা হতে চাই।'

'ব্যস?

'হ্যাঁ। একজন অভিনেতার কোন জাত থাকে না। সে সাদা না কালো না তামাটে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। যে কোন সাদা অভিনেতা ওথেলো করার সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যায় তুমি জানো?'

'কিন্তু কোন সাদা চরিত্রে কালোদের নেওয়া হয় না, তাই না?'

'ট্র্যাশ। অফ ব্রডওয়েতে কালো অভিনেতা ম্যাকবেথ করেছে।'

'বেশ তো, তুমি থিয়েটারে সুযোগ নিচ্ছ না কেন?'

'সবকটা দরজায় নক করেছি। লাইনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। দিন আসবেই।'

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সামনে নায়োরবি ঠিক সাড়ে তিনটের সময় পৌঁছে গেল। চমৎকার রোদ্দুর চারধারে। পার্কিং স্ট্যাণ্ডে একটা বড় ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে কয়েকজন এশীয়। স্যুটিং পার্টি বলে মনে হল না ওর। ওখানে সামান্য একটা ভিডিও স্যুটিং-এও বিশাল স্টুডিওভ্যান স্পটে আনা হয়! ইউনিটের লোকজন ক্রউড কন্ট্রোল করে। ইতিমধ্যে চারটে ছবিতে এক্সট্রার পার্ট করেছে নায়োরবি। অভিজ্ঞতা ভালই।

পৌনে চারটে বাজল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সেই ভ্যানের জানলায় একটা ইউম্যাটিক ক্যামেরা নিয়ে কেউ ছবি তুলছে। এরাই স্যুটিং করবে নাকি? এত অল্প ব্যবস্থা? সে এগিয়ে গেল টুপি মাথায় লোকটার সামনে, 'মাপ করবেন, আপনারা কি স্যুটিং করতে এসেছেন?'

'কেন বলুন তো?' লোকটা সন্দেহের চোখে তাকাল।

'আমার এজেন্ট মিসেস হার্ডি এখানে পাঠিয়েছেন। আমার নাম নায়োরবি।'

বলামাত্র লোকটা খুব খুশী হল। হাত বাড়িয়ে ওর হাত স্পর্শ করল, 'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। পুলিশ এখানে রিফ্লেক্টার নামাবার অনুমতি দেয়নি। তাই একটু চুরি করে স্যুটিং করতে হবে।'

'কি রকম ভিখিরী?'

'এই নিউইয়র্কের রাস্তায় যেমন দেখা যায়।'

'কোন সংলাপ আছে?'

'হ্যাঁ। দুটি ছেলেমেয়ে এখান দিয়ে যাবে। আপনি তাদের কাছে পয়সা চাইবেন। তারা দেবে না। মেয়েটি ভয় পাবে। ছেলেটি বিরক্ত হবে। একটু দাঁড়ান।' পরিচালকের নির্দেশে ভ্যানের ভেতর থেকে দু'জন অভিনেতা অভিনেত্রী বেরিয়ে এল। নায়োরবি দেখল দুজনেরই রঙ তামাটে। সংলাপ পড়ানো হল। শেষ সংলাপটি খুব উত্তেজনাপূর্ণ। আকাশের দিকে মুঠো ছুঁড়ে তাকে বলতে হবে, 'ও মার্টিন লুথার কিং, তুমি শহীদ হলেও পৃথিবীটা একই রকম রয়ে গেল।' দু'তিনবার নিচুগলায় রিহার্সাল দিতেই ভিড় জমে গেল। নায়োরবি দেখল দর্শকদের বেশীরভাগই ট্যুরিস্ট। পরিচালক একটু বিব্রত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মেক আপ নিয়ে কি করা যায়! আমাদের সঙ্গে অবশ্য সরঞ্জাম আছে—!'

নায়োরবি বলল, 'তিন মিনিট সময় দিন।'

সে ফুটপাতে হাঁটুমুড়ে বসে ব্যাগ খুলল। মেকআপের বাক্স বের করে মুখে কালো রঙ মাখল এমন করে যাতে বোঝা যায়। মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে কপালে লাল ফেট্টি বাঁধল। তারপর সেই ছেঁড়া ওভারকোটটা চাপিয়ে নিয়ে একটা ভাঙা মগ বের করল। পরিচালক মুগ্ধ চোখে ওর তৈরী হওয়া দেখছিলেন। এবার বললেন, 'দারুণ! আপনি দেখছি দারুণ প্রফেশনাল। ইণ্ডিয়াতে আমরা এটা ভাবতেই পারি না। ও কে! কাজ শুরু করা যাক।'

ক্যামেরাম্যান এবার ফুটপাতে। নায়োরবি মগ নিয়ে বসে আছে। ছেলেমেয়ে দুটো কাছে আসতেই সে মগ নাচাল, 'হেল্প মি স্যার, এ ডলার ম্যাম।'

মেয়েটি চমকে উঠল। ছেলেটি চাপা গালাগাল দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নায়োরবি আকাশের দিকে মুঠো তুলে প্রচণ্ড চিৎকার করে সেই সংলাপটা বলল।

পরিচালক খুব খুশী। শট ও কে হয়েছে শুনে নায়োরবি কোট খুলে ব্যাগে পুরল। মাথার লাল ফেট্টিটাও। তোয়ালেতে মুখ মুছবে যখন তখন প্রোডাকশনের একজন এসে তার হাতে পঞ্চাশ ডলারের নোট ধরিয়ে দিতে সে ধন্যবাদ জানাল।

তার কাজ শেষ, এবার যেতে পারে। পরিচালক করমর্দন করে ভ্যানে উঠলেন। নায়োরবি পঞ্চাশ ডলার হাতে নিয়ে ওদের চলে যেতে দেখল।

'ইউ এ্যাক্টর?'

নায়োরবি মুখ ফিরিয়ে দেখল একজন সাদা বৃদ্ধ তাকে প্রশ্নটা করলেন। সে কাঁধ নাচাল, 'ইয়া।' তারপর ব্যাগ তুলে নিল।

'দাঁড়াও। আগে তোমার উচিত নিজের মুখ পরিষ্কার করা।'

মুখে আঙুল ঘষতেই রঙ উঠে এল। মাথা ঝাঁকিয়ে আবার ব্যাগ খুলে তোয়ালে বের করল নায়োরবি। বৃদ্ধ বললেন, 'তোমার উচিত ছিল একটু কম চেঁচানো। যে সংলাপটা বললে সেটা যদি তুমি নিজে অনুভব করতে তাহলে চেঁচাতে না, কিন্তু ব্যথা প্রকাশ করতে পারতে।'

'হতে পারে!' নায়োরবির এই উপদেশ ভাল লাগছিল না।

'কিন্তু এই দৃশ্যটি বড় পুরোনো। সাদা-কালোর মধ্যে এখনও মিল হয়নি বটে কিন্তু আমাদের শহরের মেয়র একজন কালো চামড়ার মানুষ, তাই না?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

বৃদ্ধ পকেট থেকে পার্স বের করে তা থেকে একটা কার্ড বের করলেন, 'অ্যাক্টর হিসেবে তুমি নিজের নাম রেজেস্ট্রি করেছ?'

'নিশ্চয়ই।'

'কি নাম তোমার?'

'নায়োরবি জোন্স।'

'এটা নাও। কাল সকাল দশটায় আমার সঙ্গে দেখা করো। সপ্তাহে চারশো দেব। কাজটা বড় নয়। আগে নিজেকে প্রমাণ করা। দশটা মানে কিন্তু দশটা।' বৃদ্ধ চলে গেলেন।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নায়োরবি। সে কার্ডটার দিকে তাকাল, মাইকেল সিলভার। ন্যাশন্যাল থিয়েটার। লোকটা কে? তরতর করে রাস্তার পাশের টেলিফোনে বুথে পৌঁছে মিসেস হার্ডিকে ফোন করল সে, 'স্যুটিং হয়ে গেছে। আপনাকে ধন্যবাদ। ওরা আমাকে পঞ্চাশ ডলার দিয়েছে।'

'ঠিক আছে। মাঝে মাঝে ফোন করো।'

'মিসেস হার্ডি, ন্যাশনাল থিয়েটারে মাইকেল সিলভার বলে কেউ আছে?'

'মাই গড! তুমি একটা মূর্খ। সিলভার হল ঝুনো নারকেল, সহজে ভাঙ্গে না। থিয়েটারটার মালিক ওই। হ্যাঁ, ও নতুন প্রোডাকশন নামাচ্ছে, কিন্তু কেন বল তো? ও তোমার মতন নতুনদের থিয়েটারের ছায়া মাড়াতে দেয় না।'

'ভদ্রলোক আমাকে আগামীকাল দেখা করতে বলেছেন। সপ্তাহে চারশো ডলার দেবেন বলেছেন।'

'সত্যি? কি আশ্চর্য! তোমার সঙ্গে যোগযোগ হল কি করে? মাই গড! তুমি তো জ্যাকপট পেয়ে গেছ। ওয়েল, কন্ট্রাক্ট সাইন হয়ে গেলে এজেন্সির কমিশনটা পাঠিয়ে দেবে। উইশ ইউ গুড লাক!' রিসিভার নামিয়ে রেখে চারপাশে তাকাল নায়োরবি। নিজের কানকেই এখন বিশ্বাস হচ্ছে না। মাইকেল সিলভার তাহলে থিয়েটারটার মালিক? আর সে উপদেশ শুনে বিরক্ত হচ্ছিল? ব্যাগে হাতে সে লাফিয়ে উঠল। জেসাস, তুমি কত দয়াময়!

টিউবে ওঠার সময় নায়োরবির মনে হল তার আত্মবিশ্বাস বেশ বেড়ে গেছে। ফর্টিসেকেণ্ড স্ট্রীট আসতেই আইলিনের কথা মনে পড়ে গেল। মেয়েটা তাকে আজ খুব যত্ন করে লাঞ্চ খাইয়েছে। ওকে ডিনার খাইয়ে দেওয়া উচিত কিন্তু দশটার আগে বেচারার ছুটি হবে না। তার যে আর কাজের দরকার নেই সেটাও বলা উচিত। দশটা পর্যন্ত কোথায় কাটানো যায়। এখনও সাড়ে তিনঘণ্টা বাকি!

হঠাৎ আইলিনকে তার ভাল লেগে গেল। কারো সঙ্গে এসব কথা আলোচনা করা যায় না। আইলিনকে ভাল শ্রোতা মনে হয়েছে। আচ্ছা, আইলিনকে ডেকে আনলে কেমন হয়? আজকের রোজগার পঞ্চাশ ডলার তো সঙ্গে আছেই।

টিউব থেকে নেমে সে বাইরে বেরিয়ে সামান্য হাঁটতেই আইলিনের কাজের জায়গায় পৌঁছে গেল। রঙিন হোর্ডিং-এ উত্তেজক শব্দাবলী। নগ্ন মেয়েদের ছবি। ডিসকো লাইট। সে ভেতরে ঢুকতেই কাউণ্টারের লোকটা চেঁচাল, 'হেই বাডি, টোকেন কেনো।'

'আমি আইলিনে সঙ্গে কথা বলব। দরকার আছে।'

'সে ওপরে কাজ করছে।'

'একটু ডেকে দাও।'

'অসম্ভব। দশটার পরে এসো।'

'এখনই কথা বলা দরকার।'

লোকটা সোনালি দাঁতে হাসল, 'গোলমাল মনে হচ্ছে! সুবিধে হবে না। হাই জন, লোকটাকে দ্যাখো তো।' হাঁক শুনে বিশাল চেহারার ডোরম্যান এগিয়ে এল।

নায়োরবি হাত বাড়াল, 'চারটে টোকেন দাও।'

এক ডলারে চারটে কয়েন নিয়ে আলো-আঁধারির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সে। অর্ধনগ্ন সাদাকালো নারী ঘুরছে। আহা, এখানে কোন রঙের সমস্যা নেই। কী-হোল কোন্‌টা? সে একটা মোটা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, 'আইলিন কোথায়?'

মেয়েটা বুথগুলো দেখিয়ে দিল নিঃশব্দে। ট্যুরিস্টদের ভিড় চারপাশে। তাদের তাড়া লাগাচ্ছে কর্মচারীরা। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। ভেতরে ডায়াস। তার চারপাশে ছোট ছোট বুথে দর্শকরা। একটা বুথ খালি হতেই নায়োরবি ঢুকে গেল। টোকেন ফেলতেই ছোট্ট জানালা উঠে গেল। শুধু তার চোখের মাপে একটা ফাঁক। সে ভেতরে তাকাতেই আইলিনকে দেখতে পেল। বিবস্ত্র আইলিন নেচে যাচ্ছে। গোটা পঁচিশেক বুথ একটা প্ল্যাটফর্মকে ঘিরে সাজানো। দর্শক সেই বুথে ঢুকে টোকেন ফেললে আইলিনকে দেখতে পাবে। ভাল করে বোঝার আগেই জানালা বন্ধ গেল। দ্বিতীয় টোকেন ফেলতেই আবার জানলা খুলল। বিবস্ত্র আইলিন। চোখ বন্ধ। আহা, নাচে ছন্দ আছে। নাচতে নাচতে এগিয়ে আসতেই সে ছোট্ট জানলায় হাত নাড়তে লাগল। আইলিন সরে গেল। জানালা আবার বন্ধ হয়ে যেতেই নায়োরবির খেয়াল হল। ও নিশ্চয়ই কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ভেতর থেকে। তার চোখ ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না আইলিন। কাঁচের আড়ালে পঁচিশটি বুথের পঁচিশজোড়া চোখের তফাৎ বোঝা সম্ভব নয়। আবার টোকেন ফেলল দরজা খুলল। আইলিন নাচছে। সে চিৎকার করে ডাকল। শব্দ দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল। দর্শকদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ভেতরে আর একটা কাঁচের দেওয়াল দেওয়া আছে।

চতুর্থ টোকেন শেষ হওয়ামাত্র নায়োরবি আবার টোকেন কিনতে ছুটল। ইতিমধ্যে তার বুথে অন্য দর্শক ঢুকে গেছে। মরীয়া হয়ে সে অন্য খালি বুথের সন্ধান করতে লাগল। পঁচিশ বুথের মাঝখানের প্ল্যাটফর্মে নেচে চলেছে আইলিন। তিরিশ সেকেণ্ডের সুযোগে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছে নায়োরবি। টোকেন ফুরোলে আবার কিনছে। ভেতরে যাওয়ার উপায় নেই। শুধু ঘুরে ঘুরে দেখা আর দেখাতে চাওয়া। তার উপার্জিত পঞ্চাশ ডলার খুব দ্রুত কমে যাচ্ছিল। ক্রমশ আইলিন, তার শরীর এবং নগ্নতা ছাপিয়ে নগ্নের ছন্দে এক অসহায় স্বপ্নকে স্পর্শ করার উন্মাদনায় মাতাল হয়ে নায়োরবি খালি বুথের সন্ধানে ঘুরপাক খেতে লাগল।

আ কা শে র আ ড়া লে আ কা শ

মাঠঘাট পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে ট্রেনটা বিকেল শেষ করে দিল। জানলায় বসে রোদ মরে যেতে দেখেছিল সে, ছায়া গাঢ় হতে হতে ঘোলা পৃথিবী। ছুটন্ত ট্রেন থেকে অনীক সূর্য-হারানো পৃথিবীর শরীর চুঁইয়ে বেরনো অন্ধকারকে অনুভব করতে পারল এক সময়। পর পর এইসব পরিবর্তন দেখতে দেখতে অদ্ভুত বিষণ্ণ আরামে আক্রান্ত হয়ে গেল সে। অনীক জানলায় মাথা রেখে চাঁদ উঠতে দেখল।

আর তখনই পৃথিবীটা অন্যরকম হয়ে গেল। গাছগাছালি, মাঠ আর অপূর্ব নীল আকাশকে স্নান করাতে সোনার থালার মতো চাঁদ পৃথিবীর সামান্য ওপরে গুঁড়ি মেরে উঠে এসেছে। একদম নিটোল নারীর মতো চাঁদ। এই মুহূর্তে নিজের শরীরের আলোয় সে আলোকিত। এমন উদাসীনা নারীর খবর একমাত্র শুক্লপক্ষই দিতে পারে। ক্রমশ সেই তিরতিরে জ্যোৎস্নায় ভেজা অলৌকিক প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা তীব্র আকর্ষণ অনীকের বুকে পৌঁছে গেল। এমন এক মায়াময় ভুবন পৃথিবীতে তার জন্যে অপেক্ষা করছে অথচ সে ট্রেনের কামরায় নেহাতই প্রয়োজনের তাগিদে বসে—এ হতে পারে না। মানুষ শত চেষ্টা করলেও এক জীবনের বেশি বাঁচতে পারে না। যা কিছু প্রয়োজন তা যত জরুরিই হোক, সেই জীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফুরিয়ে যায়। অতএব নিয়ম ভাঙতে যে ক্ষতি তার জন্যে তোয়াক্কা করে কি লাভ। ট্রেনের গতি কমতে কমতে এক নাম-না-জানা স্টেশনে ক্ষণিকের জন্যে জিরোতেই অনীক নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। প্ল্যাটফর্ম না বলে ইঁটবাঁধানো চত্বর বলাই সঙ্গত।

নামা মাত্রই ট্রেনটা নড়ে উঠল। তারপর যেতে হয় তাই যাচ্ছি এমন ভঙ্গিতে আলোকিত কামরাগুলো একে একে চোখের সামনে থেকে সরে গেল। আর কেউ কি নেমেছেন এই স্টেশনে অথবা এখান থেকে ওই ট্রেনে কেউ কি চলে গেল? বোঝা গেল না এই মুহূর্তে, কারণ শূন্য রেল লাইনের পাশে বাঁধানো চত্বর ফাঁকা। সন্ধের অন্ধকারের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিশেল এখানে তেমন জমেনি স্টেশনবাড়ির পিছনে গাছগাছালি থাকায়। অনীক এগিয়ে গেল। স্টেশন বলতে দু'খানা ঘর। তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তাকে দেখছিল এক প্রৌঢ়। বললেন, তিনিই স্টেশন মাস্টার। দ্বিতীয় কর্মচারিটির শরীর খারাপ বলে আসেনি। এরপর আর কোন ট্রেন এই স্টেশনে থামবে না। অতএব ঝাঁপি বন্ধ করে চলে যাবেন তিনি রেলের দেওয়া বাসায়।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়ের গন্তব্য কোথায়?'

অনীক মাথা নাড়ল। তার কি অর্থ তা সে নিজেই জানে না। স্টেশন মাস্টার যেন অদ্ভুত কিছু দেখলেন। অনীক উলটে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে চায়ের দোকান আছে?'

'দোকান? খেপেছেন? কিনবে কে? আমার সংসারের যা কিছু দরকার তা সুরজগঞ্জ থেকে নিয়ে আসি। পাক্কা দশ মাইল। কিন্তু এখানে কি উদ্দেশ্যে আসা বুঝলাম না।'

'উদ্দেশ্যবিহীন। যেতে যেতে ভাল লেগে গেল তাই নেমে পড়লাম। আপনি আপনার কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে যান, আমি একটু চারপাশ ঘুরে ফিরে দেখি।' অনীক এগোতে চাইল।

স্টেশনমাস্টার পাশে এলেন, 'চারপাশে ঘুরবেন মানে? কিস্যু দেখার নেই এখানে। আমরা কি নিঃসঙ্গ, তা আপনি বুঝতে পারবেন না। স্টেশনের পাশে বাসা বলতে আমার দুটো ঘর, রামবিলাস থাকে এখানেই, এই অফিসঘরে। তারপর আর কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবেন না আপনি। এই রাতের বেলায় মানুষজনের মুখ দেখতে পাবেন না।'

'আমি তো সেইরকম আশা করেই ট্রেন থেকে নেমেছি।'

উন্মাদ-দর্শনের সুখ থেকে ভদ্রলোককে বঞ্চিত করে অনীক অফিসঘরের পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ডান হাতেই স্টেশনমাস্টারের দু-ঘরের বাসা। চারপাশে লম্বা লম্বা গাছ থাকায় ফালি ফালি জ্যোৎস্না তার গায়ে নকশা এঁকেছে। এত চুপচাপ চারধার যে দু-কান পরিষ্কার হয়ে যায়। অনীক দেখল একটা না-বাঁধানো পথ চলে গেছে মাঠের মধ্যে দিয়ে। ওই পথেই তাকে যেতে হবে। স্টেশন মাস্টারের বাসায় হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। এই সময় হলুদ শাড়ি-পরা একজনকে বারান্দায় বেরিয়ে আসতে দেখল সে। মুখচোখ দেখা যাচ্ছে না দূরত্বের কারণে যতটা তার চেয়ে ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে।

'চায়ের দোকানের খবর নিচ্ছিলেন, এক কাপ চা না হয় আমার এখানেই খেয়ে যান। কথা বলার লোক তো এ সময় পাই না, একটু গপ্পো করা যাবে।' কথা শেষ করেই সম্মতির অপেক্ষা না করে হাঁকলেন, 'ওগো, এই ভদ্রলোককে চা খাওয়াতে হবে।'

বারান্দা থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, 'কেন?'

একটাই শব্দ কিন্তু অদ্ভুত উচ্চারণে কিরকম অর্থবহ হয়ে উঠল। অনীক কৌতূহলে মহিলাকে দেখতে চাইল। এইরকম একটা প্রশ্ন শুনতে পাবে তা কল্পনায় ছিল না। স্টেশনমাস্টার যে বেশ বিব্রত তা তাঁর গলার স্বরে স্পষ্ট, 'না, মানে, এখানে তো কোন চায়ের দোকান নেই।'

'এখানে তো কোন কিছুই নেই।' চটজলদি কথাগুলো ভেসে এল।

'তুমি অমন করে বলছ কেন? ভদ্রলোক আমাদের এই জায়গা দেখতে ট্রেন থেকে নেমে এসেছেন। এখানে থাকার জায়গা নেই। চায়ের কথা বলছিলেন—তাই—'

'আমাদের জায়গা মানে? তুমি এখানে থাকতে চাও না, আমি চাই, আমার জায়গা।'

'বেশ, তাই হল! আসুন ভাই—।' স্টেশনমাস্টার এগিয়ে গেলেন।

এতক্ষণ অনীক ঠিক করেছিল সে এখানে চা খাবে না। হয়ত স্টেশনমাস্টার প্রায়ই লোক ধরে আনেন চা খাওয়াবার জন্যে আর সেই কারণে ভদ্রমহিলা বিরক্ত। অতএব একজন উটকো মানুষকে তিনি চা না খাওয়াতেই পারেন। কিন্তু ওই যে কথাটা, আমার জায়গা, অনীককে আকর্ষণ করল। একজন প্রৌঢ় স্টেশনমাস্টারের স্ত্রী ওই জ্যোৎস্নাক্রান্ত চরাচরকে নিজের জায়গা বলে মনে করছে শোনার পর তাকে কাছে গিয়ে দেখার লোভ হল ওর।

মহিলা একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলেন। অনীক কাছাকাছি হতেই বুঝল তিনি সুশ্রী আর বয়স কখনই পঁচিশের বেশি নয়। অসমবয়সী স্বামী-স্ত্রী সে অনেক দেখেছে কিন্তু এঁদের স্বামী-স্ত্রী বলে ভাবতে ইচ্ছে করছিল না এই মুহূর্তে। মহিলার গৌরবর্ণের সঙ্গে হলুদ শাড়ি চমৎকার সঙ্গত করছে। প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'এখানে চায়ের দোকান নেই বলে উনি আপনাকে চা খেতে ডেকেছেন। আপনার আর যা যা প্রয়োজন তা এখানে মেটানোর ব্যবস্থা নেই বলে উনি কি আমাকে তার আয়োজন করতে বলবেন?'

স্টেশনমাস্টার চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'ছিঃ, রাণু, এসব কি বলছ?'

অনীক মাথা নাড়ল, 'আপনাকে চা করতে হবে না'

'কেন হবে না?'

'আপনার ইচ্ছে নেই বলে।'

'বাঃ, আপনি খুব ভাল। ভাল লোককে চা খাওয়াতে আমার আপত্তি নেই। বসুন।'

রাণু নামের মহিলা পাখির মতো পা ফেলে ভেতরে চলে গেলেন।

স্টেশনমাস্টার হাসলেন, 'যাক, নরম হয়েছে। এমন সব বেখাপ্পা প্রশ্ন করে যে—।'

ওঁর কথা শেষ হল না, রাণু ফিরে এলেন, 'আপনি মতলববাজও হতে পারেন।'

'কি বলছ তুমি?' স্টেশনমাস্টার প্রতিবাদ করলেন।

'থামো! কতক্ষণ চেনো তুমি ওঁকে? এই যে আমার ইচ্ছে নেই বলে চা করতে নিষেধ করলেন এটাও তো প্ল্যান করে বলতে পারেন। ওটা বললে আমি গলে গিয়ে চা বানিয়ে আনব।' রাণু যেন শিউরে উঠলেন, 'ঠিক ওই ভুলটাই করতে যাচ্ছিলাম।'

'আপনাকে একটুও বিব্রত হতে হবে না। আমার চায়ের দরকার নেই। আচ্ছা, আসি।'

অনীক চলে যাওয়ার জন্যে ফিরতেই রাণু এগিয়ে এলেন, 'দাঁড়ান। আমি বিব্রত হচ্ছি কে আপনাকে বলল? আমি বলেছি আপনাকে?'

'না, আপনার কথা শুনে মনে হল।'

'বাঃ। আপনার দেখছি অন্য কোন বোধ বেশ কাজ করে। চমৎকার।'

অনীক চমকে উঠল। এই লাইনটি যে মেয়ে ওইভাবে উচ্চারণ করতে পারে সে নিপাট সাধারণ নয়। এখন চাঁদের তেজ বেড়েছে। রাণুর মুখচোখ অনেকটা স্পষ্ট।

ওঁর গলা বেশ লম্বা, কাঁধ চওড়া। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় যথেষ্ট দীর্ঘা। প্রচলিত সুন্দরী নয় কিন্তু ভাল লাগা তৈরি হয় কিছুক্ষণ থাকলেই।

'যাক গে! আপনি এখানে এসেছেন কেন?'

'প্ল্যান করে আসিনি। ট্রেনের জানলা থেকে জায়গাটা দেখে ভাল লেগে গেল।'

'লাগবেই। এটা আমার জায়গা। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই ওই ভৈরবীর কথা শুনেছেন?'

'ভৈরবী! কে?'

'অভিনয় করছেন না তো?'

'বিশ্বাস করুন। আমি জ্যোৎস্নায় ডোবা গাছগাছালি আর নির্জনতা দেখে নেমে পড়েছি।'

'তা হলে ভাল। আপনি গাছ চেনেন?'

'কিছু কিছু।'

'আপনার সঙ্গে আমার এর আগে দেখা হয়েছিল।' রাণু এক পা এগিয়ে এলেন।

'আমার সঙ্গে?' অনীক এবার বিব্রত। এমন কথা-বলা মহিলাকে সে কোথাও দেখেছে কি না মনে করতে পারছে না। অথচ ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর সামনেই স্বাভাবিক গলায় ঘোষণা করলেন, দেখা হয়েছিল। স্টেশনমাস্টার সমাধানের চেষ্টায় বললেন, 'উনি কোথায় থাকেন জানলে তুমি বুঝতে পারবে সেখানে কখনও গিয়েছিলে কি না।'

'আমি আগে গিয়েছিলাম কি না, তা উনি কী করে জানবেন? সেটা আমি বলতে পারি। হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে, আপনাকে আমি এর আগে দেখেছি। বসুন।' রাণু চলে গেলেন ভেতরে। স্টেশনমাস্টার বারান্দাতেই বসার ব্যবস্থা করলেন।

অনীক খুব ফাঁপরে পড়েছিল। ভদ্রমহিলাকে সে কিছুতেই মনে করতে পারছে না। মানুষের শরীর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। কিন্তু কতটা পরিবর্তন হলে এত অচেনা মনে হবে?

'বেশ চকমকে জ্যোৎস্না, কি বলেন? স্টেশনমাস্টার যেন উপভোগ করছিলেন।

'হুঁ। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে আমি কিছুতেই—।' কাঁধের ঝোলা নামিয়ে রাখল অনীক।

'আমি জানি।' ভদ্রলোক নিচু গলায় বললেন।

'জানেন?'

'বুঝতেই পারছেন, কথাবার্তায় একটু—, আসলে নির্জনে একা থাকতে থাকতে—।'

স্টেশনমাস্টার কোন কথাই পুরোটা বলেন না।

'আপনি কি অ্যাবনর্মালিটির কথা বলছেন?'

'ঠিক তা নয়, আবার অনেকটাই।'

'তা হলে তো ডাক্তার দেখানো উচিত।'

'কোথায় যাব? ছুটি চাইলে পাওয়া যায় না যে শহরে গিয়ে দেখাব। আবার দিনেরবেলায় ও খুব নর্মাল। কথাবার্তা কম বলে কিন্তু কোন ত্রুটি পাবেন না।'

'বিয়ের পর থেকেই এইরকম?'

'এইরকম মানে এমন সব প্রশ্ন করে যা সাধারণ মানুষ করে না। এই তো, গতকাল আমাকে বলল ওর সঙ্গে যেন রাত্রে কথা না বলি কারণ গাছেরা ওর সঙ্গে আলাপ করবে

সারা রাত ধরে আর আমাকে নাকি ঠাকুর্দা বলে মনে হচ্ছে ওর।' বলেই সামান্য হাসলেন ভদ্রলোক, 'বয়সের ব্যবধান তো আছেই। লেট ম্যারেজ। গরিব ঘরের মেয়ে বলে ওকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছি। নইলে কত ভাল বিয়ে হত ওর।'

'বিয়ে কতদিন হয়েছে?'

'বছর সাতেক। একেবারেই বালিকা ছিল। মামারা রাজি হয়ে গেল। বাপ-মা নেই।

'সন্তান?'

'নো! আর এখন তো নো চান্স!' অদ্ভুত উদাস গলায় বললেন স্টেশনমাস্টার।

'নিন। খেয়ে দেখুন। একেবারে গ্রাম্য চা।' এক কাপ চা হাতে রাণু ফিরে এলেন। কাপটা এগিয়ে ধরলেন অনীকের সামনে।

'এর দরকার ছিল না।'

'সেটা আমি বুঝব। নেবেন না ফেলে দেব?'

অগত্যা নিতে হল অনীককে। স্টেশনমাস্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি?'

স্টেশনমাস্টার হাত জোড় করলেন, 'না না। আমি চা পান করি না।'

অনীক তাকাল। পৃথিবীতে এখনও কিছু মানুষ আছেন যাঁরা চা, কফি, পান, ধূমপান অথবা মদ্যপান করেন না। ডাল ভাত তরকারি খেয়ে বেশ বেঁচে যান যে কদিন পারেন। কোন কিছু হারাচ্ছেন বলে তাঁদের ধারণাও নেই। স্টেশনমাস্টারের মুখে তেমন সারল্য আছে।

চা শেষ করতে হল তাড়াতাড়ি। ওঁরা চুপচাপ দেখছিলেন যেন পতাকা-উত্তোলন করা হচ্ছে। কাপ ফিরিয়ে দিয়ে অনীক বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি চলি।'

শব্দ করে হেসে উঠলেন রাণু, 'কোথায়?'

'একটু ঘুরে বেড়াই।'

'দাঁড়ান, আমরাও যাব। আপনি তো এখানকার কিছুই চেনেন না। নতুন জায়গায় কেউ চিনিয়ে না দিলে অনেক কিছু অজানা থেকে যায়। এক মিনিট।' কাপ হাতে রাণু দ্রুত ভেতরে চলে গেলেন।

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'হয়ে গেল।'

'তার মানে?'

'দূর! রাত-বিরেতে জঙ্গলে মাঠে ঘুরতে আমার একদম ভাল লাগে না।'

'বেশ তো! আপনারা থাকুন, আমি চলি।'

'আপনি আচ্ছা লোক। আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে আপনি বাইরে ঘুরে বেড়াবেন। এখন যদি বলি যাব না তা হলে সাতদিন অশান্তি চলবে। বিয়ে করেছেন?'

'না।'

'তা হলে ব্যাপারটা বুঝবেন না।'

স্টেশনমাস্টারের কথা শেষ হওয়ামাত্র রাণু বেরিয়ে এলেন। স্টেশনমাস্টারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যাবে তো?'

'চল।'

অনীক দেখল এরা দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে পড়ল। অর্থাৎ এটা এমন জায়গা যে চুরি করতেও কেউ আসবে না। সে দেখল যে রাস্তাটা মাঠঘাট পেরিয়ে স্টেশনের গায়ে পৌঁছেছে সেটা না ধরে সরু পায়ে-চলা পথ বেছে নিলেন রাণু। তিনিই আগে হাঁটছেন। চাঁদ এখন বেশ ওপরে উঠে এসেছে। অল্প-সল্প বাতাস বইছে। ছোটবড় গাছগুলোর ফাঁক গলে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে রয়েছে ঘাসে। এইরকম সময়ে সঙ্গে দু'জন মানুষ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু কিভাবে এদের সঙ্গ এড়ানো যায়? এই সময় স্টেশনমাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কত দূরে যাব?'

রাণু বললেন, 'আমরা তো কোথাও যাচ্ছি না। আমরা ঘুরছি।'

অনীক মুখ খুলল, 'আমার জন্যে আপনারা মিছিমিছি পরিশ্রম করছেন।'

রাণু বললেন, 'দূর! আপনার জন্যে কেন, আমি শুক্লপক্ষে রাত্রে ঘুমাই না। সারারাত জ্যোৎস্না দেখি, ভোরবেলায় খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিনভর ঘুমাই।'

অনীক অবাক হয়ে তাকাল। আজ পর্যন্ত কোন নারী এমন কথা বলেছে বলে সে শোনেনি। স্টেশনমাস্টার বললেন, 'একটু বসলে হয় না। ওখানে সুন্দর একটা কালভার্ট আছে।'

'তোমরা বসতে পার। আপনি বসবেন?'

অনীক মাথা নেড়ে না বলতেই রাণু খুশি গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভাল। এতদিনে একজন ভাল সঙ্গী পাওয়া গেল। চলুন।'

অনীক দেখল স্টেশনমাস্টার সোৎসাহে তাঁর কালভার্টের দিকে এগোলেন। এমন নির্জন রাত্রে কোন পুরুষ নিজের স্ত্রীকে একদম অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে ছেড়ে দিতে পারে? কেউ শুনলে বিশ্বাস করবে? সিনেমায় হয়।

'আপনি হিজল গাছ দেখেছেন?'

'দেখেছি।' পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অনীক বলল, 'জলের ধারে হয়।'

'তাই বলুন। এখানে কোথাও জলাভূমি নেই, এমন কি পুকুরও। অথচ আমার হিজল দেখতে খুব ইচ্ছা করে। আচ্ছা, আপনার এখন কি ইচ্ছে করছে?'

অনীক তাকাল। জ্যোৎস্নায় উচ্ছ্বসিত শরীর নিয়ে রাণু হেঁটে যাচ্ছেন। সে বলল, 'যতটা পারি এমন একটা রাতকে বুকে ভরে নিতে।'

'আপনি ভেবেছিলেন যে এই নির্জন জ্যোৎস্নায় আমার মতো একজনকে একা পাবেন?'

'না। ভাবিনি।'

'পেয়ে কেমন লাগছে?'

'আর এক ধরনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।'

'কিরকম?'

'এক উপভোগ করার আনন্দ।' হঠাৎ খেয়াল হল অনীকের ঝোলাটার কথা। চেয়ারে ফেলে এসেছে।

'আপনি দেখছি স্বার্থপর।' রাণু মাথা নাড়লেন, 'আমার ইচ্ছে কবি লিখেছেন, শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভেজা পথ ধরে আমরা চলিতে চাই—।'

হাত তুলে থামিয়ে দিল অনীক, 'এখানেই থামুন। ভাবতে ভাল লাগবে। তার পরের লাইনটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। মরবার কোন বাসনা আমার নেই।'

'বাঃ! আপনি দেখছি বেশ শিক্ষিত।'

'কবিতা পড়া শিক্ষিতের লক্ষণ কিনা জানি না।'

'কিন্তু ওটা কোন্ মরণের কথা কবি লিখেছেন? তারপরে যেতে চাই ম'রে। মরতে চাই না, যেতে চাই ম'রে। বুঝলেন মশাই। আপনি মরণ বুঝবেন না। কখনও কখনও প্রবলভাবে জীবন পাওয়ার উপলব্ধিকে মরণ বলতে সুখ হয়।'

বিস্ময় বাড়ছিল অনীকের। অভাবগ্রস্ত এক পরিবারের বাপ-মা হারা কোন অনাথ কিশোরীকে আত্মীয়স্বজন যখন বয়স্ক কোন পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয় তখন ধরেই নেওয়া যায় একমাত্র শরীর ছাড়া তার বিকাশ অন্যত্র হয় না। অথচ রাণু যে কথা বলছেন তা অশিক্ষিতের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথম আলাপে যে বিভ্রম জাগছিল এখন তা মোটেই নেই।

'আপনি এখানে কবিতার বই পান?'

'মানে?'

'আপনার কথার সূত্রে জিজ্ঞাসা করছি।'

'আমি খুব অশিক্ষিত। ছেলেবেলায় পড়ার বইতে যেসব কবিতা থাকে তার বাইরে কিছু পড়িনি। অনেকদিন আগে, তখন আমরা অন্য স্টেশনে থাকতাম, এক ভদ্রলোক ওয়েটিং রুমে একটা বই-এর প্যাকেট ফেলে গিয়েছিলেন। উনি সেই প্যাকেট আমাকে এনে দেন। তাতে জীবনানন্দ দাশের তিনটে কবিতার বই ছিল। এত বছর ধরে শুধু ওগুলোই পড়ি।'

'পড়ে বুঝেছিলেন?'

'ঠিক বুঝিনি। একটু একটু ভাল লাগছিল। বারংবার পড়তে পড়তে অন্যরকম মানে মনে এল। তারপর এখানে আসার পর মনে হল ও সবই আমার কথা। পৃথিবীতে আরও অনেক কবি অনেক লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ তো বিশ্বকবি। কিন্তু আমার কাছে ওই তিনটে বই এত বড় যে বোধহয় একজীবনে বুঝে উঠতে পারব না। চাঁদটাকে দেখুন।'

অনীক তাকাল। একচিলতে কালচে মেঘ গোল চাঁদের মাথায় জড়িয়ে আছে। মানুষ যতই চাঁদে হেঁটে বেড়াক পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে চাঁদকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। রাণু হাসলেন, 'কলঙ্ক আপনার কেমন লাগে?'

'একটু আধটু থাকলে মন্দ হয় না। কিন্তু সত্য করে বলুন তো, জীবনানন্দের তিনটি বই ছাড়া আপনি এখন পর্যন্ত আর কারও কোন লেখা পড়েননি?' অনীকের বিস্ময় যাচ্ছিল না।

'না। পড়ার সুযোগ তো কখনও হয়নি। তাছাড়া এই তিনটে শেষ না করে অন্যের বই পড়ি কি করে?' রাণু চাঁদের দিকে মুখ তুললেন।

'আপনার এখনও শেষ হয়নি?'

'না। আসলে আমি তো একটা গর্দভ, আজ যে মানে ঠিক করি কাল সেটা বদলে যায়। যেমন ধরুন একটা লাইনের কথা, "হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর বিছানার পর।" প্রথম পড়ার সময় মনে হয়েছিল শেফালীকে হেমন্তের মেয়ে হিসেবে কবি ভেবেছেন। গাছের তলায় শেফালী ঝরে পড়ে আছে, হেমন্ত বিদায় নিচ্ছে। স্টেশনের কাছে কিছু শেফালীর গাছ আছে। পুজোর পর এক ভোরে সেখানে গিয়ে বর্ণনা মিলিয়ে নিতে চমকে উঠলাম। কবি লিখেছেন শাদা মরা শেফালীর বিছানার ওপরে হেমন্তের শেষ সন্তান রয়ে গেছে। অথচ শেফালীর গালচের ওপর আমি কিছুই তা দেখতে পাচ্ছি না। পরের দিন গিয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে ফুলগুলো যেন চোখের আড়ালে চলে গেল। আমি যেন স্পষ্ট ফুলের বিছানার ওপর হিমশীতকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। বাড়িতে এসে ওঁকে বললাম। উনি ভাবলেন আমার মাথা আরও খারাপ হয়েছে। আসলে এসব কাউকে বোঝানো যায় না।' কথা বলতে বলতে রাণু হঠাৎই উদাস হয়ে গেলেন। আর এই সময় ওঁকে খুব একলা বলে মনে হচ্ছিল অনীকের। সে মুখ ফিরিয়ে সামনে তাকাতেই একটা অদ্ভুত গাছ দেখতে পেল। গাছটার শরীর বিশাল কিন্তু কোন পাতা নেই, ফুল ফল তো দূরের কথা। যেন আকাশটাকে জালের মত শুকনো ডাল দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে।

রাণু বললেন, 'কি মনে হচ্ছে, মরা গাছ? মোটেই না। আমি এখানে আসার পর থেকেই গাছটাকে ওই অবস্থায় দেখছি। কোন ডাল দেখিনি কখনও অথচ ডাল মরেনি।'

জ্যোৎস্না ওর সর্বাঙ্গে কিন্তু তবু গাছটাকে অসুন্দর দেখাচ্ছে। রাণু বললেন, 'দেখেছেন?'

অনীক দেখেছিল। একেবারে উঁচু ডালে একটা পাখি বসে আছে। তার গায়ের রঙ বেশ ধূসর। গোল মুখ ঘুরিয়ে তাকানোর ভঙ্গীতে পরিচয় বোঝা গেল। এত কাছ থেকে গাছে প্যাঁচা বসে থাকতে অনীক কোনদিন দেখেনি। আরও একটু হাঁটতে কিছু লম্বা ঘাসের জঙ্গল দেখা গেল। কোমর পর্যন্ত বড় জোর। রাণু বললেন, 'ওখানে কয়েকটা খরগোস আছে। দেখবেন?'

'কিভাবে দেখা যায়?'

'বসে থাকতে হবে চুপচাপ। রাত ফুরিয়ে যাওয়ার আগে দেখা পেলেও পাবেন।'

'আপনি বসে থাকেন নাকি?'

'মাঝে মাঝে। গত সপ্তাহে দেখে গেছি একটা খরগোসের বাচ্চা হবে।'

অনীক রাণুর দিকে তাকাল।

বেশ কিছুটা হাঁটার পর, জ্যোৎস্নায় চুপচাপ মাখামাখি হওয়ার পর রাণু বললেন, 'দাঁড়ান।'

অনীক দেখল গাছটা অতি সাধারণ। কিন্তু তার তলায় একটা পাখির বাসা ভেঙে পড়ে আছে, রাণু উবু হয়ে দেখলেন। বাসায় ডিম ছিল, ভেঙে গেছে। রাণু উঠে দাঁড়িয়ে হাসলেন,

'আমাদের আগে জীবনানন্দ এসব দেখে গেছেন, 'চড়ুয়ের ভাঙা বাসা শিশিরে গিয়েছে ভিজে পথের উপর পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড়কড়্।' উঃ, এই কড়কড় শব্দটা যে কি মারাত্মক শূন্যতা তৈরি করে। হাত দিয়ে দেখুন ডিমে, টের পাবেন।'

'হাত না দিয়েই টের পাচ্ছি।'

'তাই? আপনারা পণ্ডিত লোক তো সব অনুভবে বুঝতে পারেন। আমি এত কম বুঝি যে মিলিয়ে নিয়ে দেখতে হয়।' রাণু হাঁটতে শুরু করলেন আকাশের দিকে মুখ তুলে।

তারপর হঠাৎ আঙুল তুলে বালিকার মতো চিৎকার করে উঠলেন, 'দেখুন, দেখুন।'

অনীক দেখল অনেক দূরে প্রায় অস্পষ্ট একটা কিছু উড়ে যাচ্ছে।

'কি দেখলেন?'

'পাখিটা?'

'উঃ, আজ আকাশে এক তিল ফাঁকাও নেই নক্ষত্রদের জন্যে আর আপনার পাখিটার দিকে নজর গেল? আজ নিশ্চয়ই সব মৃত নক্ষত্র জেগে উঠেছে। আচ্ছা প্রেমিক চিল-পুরুষ দেখেছেন আপনি?' গলায় অদ্ভুত আবেগ এল রাণুর।

'না। চিলদের কে নারী কে পুরুষ আমি আলাদা করতে পারি না।'

'জীবনানন্দ করেছিলেন। প্রেমিক চিল-পুরুষের চোখ শিশিরভেজা হয়। শিশির-ভেজা কিন্তু ঝলমলে। ওই সমস্ত নক্ষত্রের মতো।' একটু চুপ করে রাণু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনি কখনও প্রেম করেছেন?'

'প্রেম?'

'না, না। এই, গাছপালা বা পাখির সঙ্গে নয়। মানুষের সঙ্গে?'

হেসে ফেলল অনীক, 'না!'

'আপনি বিয়ে করেননি?'

'এখনও সুযোগ হয়নি।'

'ও। ধরুন, যদি আপনি কখনও প্রেম করেন তা হলে কেন তা করবেন?'

'প্রেম কেউ কি করে? শুনেছি ওটা আপনাআপনি এসে যায়।'

'আশ্চর্য! একটা মানুষকে দেখে আপনার মনে আপনাআপনি প্রেম এল আর হাজার মানুষকে দেখে তা এল না, তাই তো? তা হলে ওই একজনের কি বিশেষত্ব?'

'বলতে পারব না।'

'আমিও বুঝতে পারি না। এই যে প্রতিদিন যে ট্রেনগুলো আমাদের স্টেশনে এসে দু-মিনিটের জন্য দাঁড়ায়, তার জানলায় কত মানুষের মুখ। আমি রোজ তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখি কিন্তু একবারও কাউকে দেখে মনে প্রেম আসেনি।'

'আপনি তো বিবাহিতা?'

'তাতে কি হল?'

'আপনার স্বামীর জন্যে নিশ্চয়ই—'

'একটুও না। ওকে বিয়ের সময় যখন দেখি তখন আমি কিছুই ভাবিনি। পরে একসঙ্গে থাকতে থাকতেও মনে প্রেম এল না। আমার কাছে ও কখনও বাবা, কখনও ভাই, কখনও বন্ধু। ওর জন্যে আমার মনে প্রেম নেই এটা ও জানে কিন্তু তার জন্যে একটুও দুঃখ পায় না। কারণ আমি যে ওর স্ত্রী এটাই শেষ কথা বলে ভাবে।'

'আপনাকে কেউ প্রেম নিবেদন করেনি?'

'হুঁ, করেছে। আমি বাবা মিথ্যে বলতে পারি না। বিয়ের আগে করেছে, বিয়ের পর দু'জন। আর তার জন্যে আমার সব কেমন গুলিয়ে গেছে।'

'কি রকম?'

'বিয়ের আগে আমাকে যারা প্রেম নিবেদন করেছে তাদের বয়েস কারও চল্লিশ কারও পনেরো। একটু একা পেলেই মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত ওরা। সেটা যে প্রেম নিবেদন করা তা তখন না বুঝলেও ওরা যে কথাগুলো বলে অন্য কিছু চাইছে, তা টের পেতাম।' রাণু হেসে ফেললেন, 'মেয়েরা অবশ্য অনেক কিছু আগাম টের পায় বলে গর্ব করে কিন্তু এ ব্যাপারটায় আমার ভুল হয়নি। বাপ-মা ছিল না, গরিব মামার কাছে মানুষ, তাই একটু ভয়ে ভয়ে থাকতে হত।'

'ওরা নিশ্চয়ই কবিতার লাইন বলত না।'

'মাথা খারাপ। একজন ছিল মুদিওয়ালা। আমরা কাকা বলতাম। সে বলত, এই তোর আঙুল কী সুন্দর, চাঁপার মত। কেউ আমার হাতের প্রশংসা করত, কেউ বলত আমার নাকি হাঁসের মত গলা। আমার বন্ধুর দাদা বলেছিল, তোর পা-দুখানার যা সেপ, খুব প্রভোকেটিভ। মানে বুঝিনি কিন্তু শব্দটা মনে আছে। আর একজন বলেছিল তোমার কোমরটা এত সরু যে মুঠোয় ধরা যায়। এরা সবাই আমার চেয়ে বড় কিন্তু কেউ আমার মুখের প্রশংসা করেনি। তাই ওসব শুনলেই বাড়ি ফিরে এসে এক ফাঁকে আয়নায় নিজের মুখ দেখতাম। মনে হত নিশ্চয়ই আমার মুখ দেখতে খারাপ, না হলে লোকে তো প্রথমে মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু সেই প্রশংসাও জুটলো। পাশের বাড়িতে আমার সমবয়সী কলকাতার একটি ছেলে এসেছিল। সে আড়ালে পেয়ে বলল, তোমার চোখ দুটো কি গভীর, দীঘির মত। আমার খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু আমি সমস্যায় পড়লাম। এতগুলো মানুষ আলাদা আলাদা করে হয় আমার আঙুল, নয় হাত পা, নয় গলা অথবা চোখকে সুন্দর বলছে। এই পুরো আমাকে কেউ সুন্দর বলছে না। একদিন আমার চেয়ে একটু ছোট একজন নিরালায় পেয়ে ফস্ করে বলল, এই তোর বুকে হাত দিতে দিবি? কি সুন্দর বুক তোর। আমার রাগ হয়ে গেল। ছেলেটা বুকের কথা বলেছে বলে যতটা নয় তার চেয়ে ঢের বেশি ও মিথ্যে বলছে। ক্ষেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুই বুঝলি কি করে? আমার গায়ে জামা নেই? ছেলেটা এমন ঘাবড়ে গেল আর কোনদিন বিরক্ত করেনি। ক্রমশ আমি বুঝতে পারলাম আমার চেয়ে যারা বয়স্ক তারা শরীরের

সেইসব অঙ্গের প্রশংসা করে যা দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু যে আঙুলের প্রশংসা করছে তাকে আঙুল ধরতে দিলে তাই নিয়ে সারা জীবন বসে থাকবে না। সে সুযোগ পেলেই ঢাকা-শরীরের দিকে এগোবে। এটা বোঝবার পর মনে হল সবাই আমার সঙ্গে ভান করছে। আর তাই কাউকেই আমার ভাল লাগল না।'

চুপচাপ কথাগুলো শুনতে শুনতে হাঁটছিল অনীক। এত স্পষ্ট গলায় কোন মেয়ে যে তার উপলব্ধির কথা বলতে পারে তা ধারণা করতে পারেনি। এখন চাঁদ মাথার ওপর চলে এসেছে। চমৎকার সাদা এক নাম-না-জানা পাখি উড়ে গেল জ্যোৎস্না মেখে। অনীক গল্পের রেশ ধরে রাখতে চাইল, 'বিয়ের পরে?'

'আপনার এসব শুনে কি লাভ?' আচমকা প্রশ্ন করলেন রাণু।

'আপনাকে জানতে ইচ্ছে করছে, তাই।

'কখন থেকে?'

'মানে?'

'এই জানার ইচ্ছেটা কখন থেকে হয়েছে? আপনি তো আমাদের কোয়ার্টার্সে বসতেই চাইছিলেন না। ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ ঠিক। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ হবার পর—। ঠিক আছে।'

'না ঠিক নেই। বিয়ের পর যারা প্রেম নিবেদন করেছে তাদের বক্তব্য একইরকম। আমার সঙ্গে আমার স্বামীকে মানায় না, আমাকে অনেক অনেক সুখী করতে পারে তারা যদি স্বামীকে ছেড়ে চলে যাই তাদের সঙ্গে। অথবা স্বামীর কাছেই থাকি আর তারা লুকিয়ে চুরিয়ে আমাকে সঙ্গ দেবে।' হাসলেন রাণু। 'আসলে আমরা খুব বোকা। আমরা কেউ বুঝিনা সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে যেতে হয় কি কাজ করেছি আর কি কথা ভেবেছি। আমরা কেউ ভাবতে চাই না আমার বুকে প্রেম এল যার জন্যে, তার অনুভূতি কি রকম? সে কি আমাকে চাইছে? শুধু মানুষের বেলায় নয়, এই যাকে আমরা প্রকৃতি বলি, এই জ্যোৎস্না, গাছপালা, ফুল অথবা আকাশ—এরাও কি আমাকে চায়? আমি চাইলেই কি ওদের সঙ্গে প্রেম হয়ে গেল? ওদেরও তো চাওয়া দরকার। আমার স্বামী বলেন, ওদের প্রাণ নেই, থাকলেও বোঝার এবং বোঝানোর ক্ষমতা নেই। কি বোকা-বোকা কথা বলুন তো! আপনি একটা গাছের কাছে রোজ আসুন, তাকে ভালবাসুন, তার শরীর থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করে দিন, দেখবেন যেই তার আপনাকে ভাল লাগবে, অমনি সে কেমন চনমনিয়ে উঠবে, যা অন্য কেউ এলে হবে না।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন রাণু। তাঁর চোখ সামনের দিকে। অনীক দেখল মাঠের গায়ে গাছপালার মধ্যে মন্দিরের আদল দেখা যাচ্ছে।

রাণু বললেন, 'ওপাশে যাব না।'

'কেন?'

'ওখানে একজন মহিলা থাকেন। লোকে বলে ভৈরবী।'

'ও, ওঁর কথাই তখন বলছিলেন?'

'ভদ্রমহিলা দিনের বেলায় বের হন না। জ্যোৎস্না রাত্রেও নয়। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে ঘুরে বেড়ান মাঠে মাঠে। শুনেছি রাত্রে দেখতে পান।'

'অদ্ভুত!'

'আপনার কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে কিন্তু আমি সহ্য করতে পারি না। উনি সেই থুরথুরে অন্ধ পেঁচার মত যে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধঝাঁকে জোনাকির মাখামাখি কোনদিন দেখতে পাবে না, উল্টে বলবে, 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে, চমৎকার। ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার।'

অনীক হেসে ফেলল শব্দ করে। রাণু মুখ ফেরালেন, 'হাসলেন কেন?'

'আমি লাইনটার অন্য অর্থ জানি।'

'যেমন?

'পরের লাইনে তিনটে শব্দ আছে, তুমুল গাঢ় সমাচার। একটা অন্ধ জরাগ্রস্ত পেঁচার কাছে দু-একটা ইঁদুর ধরতে পারা মানে বেঁচে থাকা। বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করা। পৃথিবীর সমস্ত অশক্ত মানুষ যে সংগ্রাম করছে, এ তারই প্রতিচ্ছবি। জীবনের এই স্বাদ আপনার অসহ্য বোধ হলো?'

'এ আপনার ব্যাখ্যা। আপনাদের। আমি এ মানি না।'

'কিন্তু কবিতা শুধু ব্যবহারে নয়, শব্দ থেকে উঠে আসা দ্বিতীয়, কখনও তৃতীয় মানেতে তার বিচরণ।'

'হয়তো। কিন্তু যে পেঁচা সারারাত জ্যোৎস্নার ফিনিক দেখে মুখ গুঁজে রইল সে চাঁদ ডুবে গেলে ছটফটিয়ে ইঁদুর ধরতে বেরিয়ে আসবে, এ কোন অসুন্দর। তাছাড়া, মশাই, মনে রাখবেন, ওই পেঁচাটি অন্ধ ছিল। অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত। সে কি করে বুঝবে কখন আলো জ্বলছে অথবা নিবে গেছে?'

অনীক হোঁচট খেল। সত্যি তো। অন্ধ শব্দটি নিয়ে সে কখনও ভাবেনি।

রাণু হাসলেন, 'অন্ধত্ব তাহলে অভ্যেসের কাছে হার মানে। তাই না?'

অনীক আপত্তি জানাল, 'সব পেঁচাই অন্ধ হয়ে যায় আলো জ্বললে। জ্যোৎস্নাও তো আলো, এই যেমন চারপাশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু পেঁচার কথা থাক, ওই ভৈরবী নিশ্চয়ই অন্ধ এবং থুরথুরে নন?'

'চেহারায় নয়, মনে। নইলে দিনের বেলায় দেখা দেয় না কেন? কোন্ জ্যোৎস্না রাত্রে ওকে দেখতে পাই না কেন?'

'হয়তো নিজেকে আড়ালে রাখতে চান।'

'আপনি ওর কাছে যেতে চান?'

'আগ্রহ যে হচ্ছে না তাই বা বলি কি করে?'

'তাহলে এখন ফিরে যান স্টেশনে। অমাবস্যায় আসুন। যখন এইসব চরাচর অন্ধকারে ডুবে যাবে, ডুবে গিয়ে চরিত্র হারাবে, তখন নিজেকে হারান।'

'আপনি অন্ধকারকে খুব ভয় পান, না?'

'আপনি পান না?'

'হ্যাঁ, পাই।'

দু-চোখ বন্ধ করে আকাশের দিকে মুখ তুললেন রাণু, 'আচ্ছা, আপনি কি রকম লোক? আমার কি কিছুই আপনার ভাল লাগছে না?'

'নিশ্চয়ই লাগছে।'

'সেটা আমার আঙুল, হাত পা গলা মুখ অথবা বুক নয়, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'সব মিলিয়ে এই আমি, আমাকেই, কি না?'

'আমাকে নিয়ে কোথাও হারিয়ে যেতে, অথবা আমার সঙ্গে গোপনে আনন্দ করতে নিশ্চয়ই আপনার ইচ্ছে করছে না?' রাণু চোখ খুলছিলেন না।

অনীক একটু ভাবল, তারপর মাথা নাড়ল, 'না।'

'তাহলে?'

'তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই—তবু, গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি আজও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছো।' মন্ত্রমুগ্ধের মত লাইনগুলো আবৃত্তি করল অনীক। এ যেন তার কথা, তারই কথা।

চোখ খুললেন রাণু। যেন নক্ষত্রের উজ্জ্বল জলে তার চোখ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার। খানিক আগে যে ধবল পাখি জ্যোৎস্নায় মিশে গিয়েছিল সে যেন কোন নাম-না-জানা ফুলের ফুটে ওঠার খবর নিয়ে এল। এই তিরতিরে রাত্তিরে, নির্জনতা যখন বড় ভয়াবহ, হাওয়ায় এক অতীন্দ্রিয় কাঁপন টের পেয়ে গাছেরা পুলকিত, এই তারা-জ্বলা রাতে রাণু এগিয়ে এলেন অনীকের সামনে। বললেন, 'আমি এক সামান্যা নারী, তুমি আমাকে অসামান্যা কর।'

মুগ্ধ তো ছিলই, লুব্ধ হল অনীক। রক্তে সর্বনাশের ঝড় উঠল, বুকে গোখরোর ফণা। এখনও সে সেই পুরুষ যার কোন যোনীচক্র স্মৃতি নেই। প্রতিটি রোমকূপে এখন দাউদাউ চিতা। তবু সে কথা বলল, 'রাত ফুরুলে কি হবে?'

'আপনি চলে যাবেন।'

'আর তুমি?'

হেসে উঠলেন রাণু, 'আমি এইসব গাছপালা, জ্যোৎস্না আর আকাশের সঙ্গে আপনাকে নিয়ে দারুণভাবে বেঁচে থাকব।'

'আমি যদি না যাই?'

'আপনি রসিকতা করছেন।'

'রসিকতা?'

'এক তিল বেশি রাত্রির মত আপনার জীবন। সেই এক তিল কম আর্ত রাত্রি আমি। অতএব আপনার জীবনের কাছে আমি মূল্যহীনা।'

'আমি মানি না। যখই জ্যোৎস্না ফুটবে, চরাচর এমন স্বপ্নিল হয়ে উঠবে তখনই আমি দু-হাত বাড়িয়ে তোমাকে চাইব।'

'কিন্তু যেই চাঁদ ডুবে যাবে, যখনই অন্ধকার নামবে অথবা ভোরের শিশির শুকিয়ে সূর্য উঠবে তখন আমি ছায়ার মতনও থাকব না আপনার মনে। আর তার জন্যে আমার কোন আক্ষেপ নেই। এই এক রাত্রি যত দিতে পারে তাই জীবনভরে নিতে চাই।' স্পষ্ট আহ্বান খোদিত হল রাণুর চোখে মুখে শরীরে।

কালো মেঘ যা এতক্ষণ ইতিউতি ছড়িয়ে ছিল, যেন এই কথা শুনে গড়িয়ে এল চাঁদের বুকে, চটজলদি জ্যোৎস্না উধাও। স্লেট রঙের আলো ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীতে। চক্ষুষ্মান হয়ে পেঁচা খুঁজে ফিরতে শুরু করল তার রাতের আহার। রাণুর আক্ষেপ শোনা গেল, 'আহ, এ কেন হল?'

আর তখনই অনীক দেখল। দেখল না বলে দর্শন করল বলা ঢের ভাল। জঙ্গল ঘেরা মন্দির থেকে একটি মূর্তি চকিতে বেরিয়ে এল মাঠের মধ্যে। দু-হাত আকাশে তুলে যেন সে মেঘগুলোকে ঠেলে দিচ্ছে চাঁদের বুকে অথবা তাদের আটকে রাখতে চাইল যেমন করে বেয়াড়া সূর্যকে বগলে দাবিয়ে রেখেছিল পবনপুত্র।

অথবা এ সবই অনীকের মনে হওয়া। মহিলা মাথার ওপর হাত তুলে আরাম করলেন। তারপর দ্রুত মিলিয়ে গেলেন ঝোপের আড়ালে। মিলিয়ে যাওয়ার আগে মনে হল তিনি বসে পড়লেন। ওই কালচে আলোয় চারপাশ বেশ অস্পষ্ট। অনীক রাণুর দিকে তাকাল। মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ভৈরবীর উপস্থিতি তিনি জানেন বুঝতে অসুবিধে হল না। সেই মুহূর্তেই দূরের ঝোপের আড়ালে মূর্তিটিকে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল। মাথা এবং কাঁধ প্রথমে দৃশ্যমান হবার পর শরীরটা বেরিয়ে এল। অনীকের মনে হল ভৈরবীর কোন রহস্য নেই। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তাকেও ঝোপের আড়ালে আসতে হয়। হয়তো মন্দিরে কোন টয়লেট নেই। এসব অঞ্চলে সেটা স্বাভাবিক।

'চলুন, মহিলার সঙ্গে আলাপ করি।'

'না।

'কেন?'

'ও আপনাকে একটা ছাগল কিংবা ভেড়া করে দেবে।'

'দূর। এসব কখনও হয় নাকি?'

'আপনি বুঝতে পারবেন না। ছাগল ভেড়ারা বুঝতে পারে না, তারা কি।'

অনীক হাসল, 'হ্যাঁ। মানুষের মধ্যে অনেক ছাগল ভেড়া আছে, অন্তত বিশেষ বিশেষ মহিলাদের সঙ্গে তাঁরা সেইরকম আচরণ করে।'

'তবে?'

'আমার তো সেই ভয় নেই। রক্ষাকবচ আছে, আপনি।'

রাণু কেঁপে উঠলেন, 'সত্যি বলছেন?'

'সত্যি।'

ওরা এবার এগোল। রাণুর পায়ে এখনও জড়তা। মাঠের মাঝখানে সেই নারী যাকে ভৈরবী বলা হয়, একা। দুটি মানুষের পায়ের চাপে ঘাসেরাও শব্দহীন। অনীক দেখল একেবারে কাছাকাছি পৌঁছেও মহিলা তাদের যেন ঠিকঠাক লক্ষ্য করছেন না। গেরুয়া শাড়ী জড়ানো শীর্ণ শরীরটি কি কখনও সুন্দরী ছিল?

ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ এবং মুখের অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না এই রমণী প্রায় অন্ধ। আপ্রাণ চেষ্টায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে? কেউ কি ওখানে?'

অনীক কথা বলল, 'হ্যাঁ। আমরা।'

'এত রাত্রে এখানে কেন?'

'এমনি। চাঁদের আলোয় পৃথিবী দেখতে বেরিয়েছিলাম।'

'বাঃ। দেখা হলো?'

'না। মানে এখনও মন ভরেনি।'

'ওইটাই মুশকিল। কোনদিন মনে ভরে না। তোমাদের সন্তান নেই?'

হকচকিয়ে গেল অনীক। রাণু ঠোঁট কামড়ালেন।

'ও। হয়নি বুঝি? মাকে ডাকো, হবে। সন্তানই তো সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখে।' আচমকা পায়ে মেপে মেপে রাস্তা করে ভৈরবী চলে গেলেন মন্দিরের দিকে। একটা পোড়ো ছোট মন্দির যার চারপাশে জঙ্গল। সাধারণত গ্রামের মানুষেরা নিজেদের প্রয়োজনে এইসব মন্দিরে আসে আর তাই বেঁচে আছেন ভৈরবী।

এখন এই মাঠে ওরা দু-জন। অনীক হাসল, 'দেখলেন তো, আপনার কল্পনার সঙ্গে ওর কোন মিল নেই। একজন স্বাভাবিক বয়স্কা মানুষ, চোখে হয়ত ছানি পড়েছে। কোন কিছু বানাতে উনি পারেন না।'

'কে বলল?'

'মানে?'

'ওই যে কথাটা বলে গেল, সন্তান, সন্তান হয়নি, তাহলে আমার সঙ্গে কারো তো সম্পর্ক হবে না। আমি যাকে ভালবাসব, সে আমাকে ভালবাসবে, আমাদের কোন সম্পর্ক তৈরী হবে না যতদিন না সন্তান আসবে। মনের মধ্যে এই যন্ত্রণা ঢুকিয়ে দিয়ে গেল ও, এও তো বশীকরণ।' গোঙানি ফুটল রাণুর গলায়।

'এ বশীকরণ নয়, এ আনন্দের উৎসাহ। আপনি উৎসাহিত হচ্ছেন না কেন?'

'কি করে হব? আমি যাদের ভালবাসি, এই মাটি, গাছ, চাঁদ, আকাশ এরা আমার বৃদ্ধ, স্থবির প্রেমিক। আমি যাকে ভালবাসি না, যিনি আমার স্বামী, তিনি অক্ষম। আমার সন্তানের জন্য আঁতুরঘর আর শ্মশানের চিতা একাকার।' রাণুর আক্ষেপ শেষ হওয়া মাত্র মেঘ সরে

গেল চাঁদের মুখ থেকে। চাঁদ হেলে গেছে অনেকটা। দু-হাত বাড়িয়ে রাণু বললেন, 'আপনি কি রকম পুরুষ?'

এখন চারপাশ দিনের আলোর মত আলোকিত। অনীক বলল, 'আপনাকে জননীর সম্মান দিতে গিয়ে আমি পিতৃত্বের অধিকার হারাবো। আমি যে পিতা হতে চাই।'

অদ্ভুত চোখে তাকালেন রাণু, 'সেটা কিভাবে সম্ভব?'

'আমি জানি না।'

'যদি ও রাজি হয় আমাকে মুক্ত করে দিতে—।'

'আমি প্রস্তুত।'

'তাহলে চলুন, এখনই, এই রাত্রে ওর কাছে ফিরে যাই, গিয়ে কথা বলি।'

ওরা দুজনে দ্রুত জ্যোৎস্না মাড়িয়ে ফিরে এল সেইখানে যেখানে স্টেশনমাস্টারকে রেখে গিয়েছিল। গিয়ে দেখল মানুষটা নেই। অনেক ডাকাডাকিতেও তার সাড়া পাওয়া গেল না। উদ্বিগ্ন রাণু বললেন, 'বড্ড ঘুমকাতুরে। নিশ্চয়ই ফিরে গেছে বাসায়। চলুন।'

যেতে যেতে চাঁদ দিগন্তে চলে যাচ্ছিল। অদ্ভুত প্রাচীন এক ছায়া নেমে আসছিল পৃথিবীতে। স্টেশনের কাছে পৌঁছে ওরা থমকে দাঁড়াল। স্টেশনমাস্টার তাঁর পোশাক পরে তৈরি, এমন কি তার পোর্টারও উর্দি এঁটে লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে। দেখামাত্র ভদ্রলোক বললেন, 'আজ ভোরে এখান দিয়ে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন যাওয়ার কথা ছিল। কি মনে হতে মাঝরাতে ফিরে এলাম। এসে বেঁচে গেলাম।'

রাণু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রকম?'

'তার এসেছে। ট্রেনটা এখানে, আমার এই স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্যে থামবে। খুব বড় বড় ভি আই পি থাকবে গাড়িতে। তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে গেলে চাকরি চলে যেত।'

ব্যস্ততা বাড়ল। দূরে ইঞ্জিনের আলো দেখা যাচ্ছে।

রাণু বললেন, 'এই সময় ওঁকে অন্যরকম দেখায়।'

'হ্যাঁ। বেশ দায়িত্বশীল মানুষ।'

'ইস্, চাঁদ ডুবে গেল।'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ঘুম পাচ্ছে না?'

'তেমন নয়।'

'চা খাবেন? আমি খুব ভাল চা করতে পারি।'

'তা তো জানি।'

'না। সন্ধ্যেবেলার মত নয়, ভোরের চা অনেক ভাল হবে।'

'থাক। ভাবছি ট্রেনে যদি চলে যাই কি রকম হবে?'

'ভি আই পি-দের সঙ্গে?'

'তা কেন? একটু জায়গা পেলেই হবে। ওঁকে বলব?'

'আপনার কোন চিন্তা নেই। উনি বললে কেউ না বলতে পারবে না।'

ট্রেনটা এল। ঝাঁকে ঝাঁকে আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। বড় বড় ভি আই পি-রা ঘুমাতে ব্যস্ত। গার্ড এলেন হনহনিয়ে। স্টেশনমাস্টার তাঁর সঙ্গে ব্যস্ত। অনীক তাকাল রাণুর দিকে। কী দারুণ গর্বিতা রমণীর মত চেয়ে আছে ট্রেনটার দিকে। যে কারণে ফিরে আসা, তা এখন এই মুহূর্তে মনে করিয়ে দেওয়ায় মন সায় দিল না।

ফাঁক পেয়ে স্টেশনমাস্টার এগিয়ে আসতেই অনীক তাঁকে ইচ্ছে জানাল। ভদ্রলোক বললেন, 'চলে যাবেন? ও। আচ্ছা আসুন। একেবারে প্রথম কামরা খালি আছে।'

অনীক বলল, 'এলাম।'

'ভাল থাকবেন।' রাণু বললেন।

'আর কিছু বলবেন না?'

'না।' মাথা নাড়লেন রাণু।

জীবনে অনেকবারই এমন হয়েছে। ঠিক সময়ে নিজেকে মেলতে পারেনি বলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। আজ ওই জ্যোৎস্নায় মাঠে কেন সক্রিয় হয়নি বলে আজ যে আফসোস এই বুকে, তা আজীবন বহন করতে হবে। ট্রেনের কামরা থেকে মুখ বাড়িয়ে সে কাউকে দেখতে পেল না। অনেক পেছনের প্ল্যাটফর্মে ওরা দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেন ছাড়তেই খেয়াল হল। ঝোলাটা পড়ে আছে স্টেশনমাস্টারের বারান্দায় পাতা চেয়ারে। সেই ঝোলায় ডায়েরী, টাকা পয়সা। ডায়েরিটা বড় জরুরি। চটজলদি নেমে পড়ল অনীক। নামতে নামতে অনেকটা দূরে। শব্দ তুলে ট্রেনটা চলে গেল ভোর ভোর পৃথিবীতে।

একটু দাঁড়াল সে। এই যে ফিরে যাওয়া এ বড় অস্বস্তির। রাণু কি একে বাহানা ভাববে। ভাবলেও উপায় নেই। ডায়েরিটা তার দরকার। শ্লথ পায়ে যে যখন স্টেশনের সামনে ফিরে এল তখন জায়গাটা ফাঁকা। রামবিলাস না কি যেন নাম পোর্টারের, দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ওর পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। কোয়ার্টার্সে কোন আলো জ্বলছে না। ওরা কি এর মধ্যে ঘরে ফিরে গেছে? সে ধীরে ধীরে বারান্দায় এল। ঝোলাটা পড়ে রয়েছে চেয়ারে। সেটা তুলে নিতেই কান্নার আওয়াজ কানে এল। ডুকরে ডুকরে কান্না। তারপর স্টেশনমাস্টারের গলা বাজল, 'শান্ত হও। শক্ত হও রাণু।'

'আমি আর পারছি না।' কান্না ছিটকে উঠল।

'কিছুই হল না?' অদ্ভুত অসহায় গলা স্টেশনমাস্টারের।

'কিচ্ছু না। এত কথা বলেছি, এত কথা—!' রাণু ককিয়ে উঠলেন, 'আমাদের কি হবে?'

'আমরা অপেক্ষা করব।' শান্ত গলায় জবাব দিলেন স্টেশনমাস্টার। থরথরিয়ে কেঁপে উঠল অনীক। এই ভোর ভোর অন্ধকারে তার দিকে তাকিয়ে যেন সেই অন্ধ থুরথুরে পেঁচা বলে উঠেছে, 'ধরা যাক্ দু-একটা ইঁদুর এবার।'

আত্মানুসন্ধান

মনীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে দেবার পর আবিষ্কার করলেন বেঁচে থাকার আর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর দুটি মেয়ে, বড়র বিয়ে হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে। সেটি খুব শান্তশিষ্ট, পড়াশুনায় ভাল, গলার স্বর নিচু, বাড়িতে থাকলে বোঝাই যেত না। তার বিয়ের পর ছোট মেয়েকে নিয়ে ভুলে ছিলেন মনীন্দ্রনাথের স্ত্রী আরতি। বাপের প্রশ্রয়ে তিন পা মেলে ধরাকে সরা দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ করতেন। সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল যেই অমনি বাড়িটা শ্মশান। যাকে শাসন করতে দিন যেত তার অনুপস্থিতি যেন মরুভূমির মত করে দিল জীবনটাকে। এখন বেঁচে থাকা মানে রোজ সকালে বাজার করা, কাগজ পড়া, চা-ভাত খাওয়া, বিকেলে পার্কে বেড়াতে যাওয়া আর সন্ধ্যের পর টি ভি দেখা।

আরতি কোন কালেই সুন্দরী ছিলেন না। মেয়েদের পনের বছর পার হবার আগেই যৌবন সম্পর্কে সব আগ্রহ হারিয়েছিলেন। স্বামীর সঙ্গে প্রেম করেননি অনেককাল। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। মন টানে ঠাকুরঘর, টি ভি আর রান্নাঘব। স্বামী বস্তুটিকে চোখে চোখে রেখে ভাল খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখলে বেশ কিছুদিন আরামে থাকা যাবে, মুখে না বললেও এমন ধারণা তাঁর মনে আছে বলে মনীন্দ্রনাথের বিশ্বাস।

ভারী শরীর, বাত এবং অম্বল সবসময়ের সঙ্গী, প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করেন না যে স্ত্রী, তাঁর প্রতি প্রেমের চোখে তিনি কিভাবে তাকাবেন! ওঁকে দেখলেই তাঁর ক্ষ্যান্তমাসীর কথা মনে পড়ে যায়। ছেলেবেলায় তাঁদের পাড়ার ওই চেহারার এক মহিলা ছিলেন। পূর্ণিমা-অমাবস্যা আর একাদশীতে তিনি এমন চিৎকার করতেন যে পাড়ার লোকে বলত, ওরে ক্ষ্যান্ত ক্ষ্যামা দে। বাত বলে বাত, রাম বাত। মাঝেমাঝে আরতির সঙ্গে ক্ষ্যান্তমাসীকে গুলিয়ে ফেলেন তিনি। অথচ এ জীবনে অন্য কোন নারীর আঙুল ছোঁয়া হয়নি, প্রেম করা তো দূরের কথা। এই এক এবং অদ্বিতীয়াকে নিয়েই রইলেন।

এখন এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেবলই মনে হচ্ছে তিনি কি পেলেন? অল্প বয়সে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। বাবা বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে নিয়ে এলেন। দুটি মেয়ে হল। মা গিয়েছিলেন আগেই, বাবাও চলে গেলেন। এক সময় তাঁকে ডাক নাম ধরে ডাকার কেউ রইল না। এবার দুই মেয়ে স্বামীর সঙ্গে বাস করতে তাঁকে চিরকালের জন্য ছেড়ে গেল। নিজের জন্যে কোন আমোদ প্রমোদ ফুর্তি করার অবকাশই পাননি কোনদিন। দুই মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর হাজার পঞ্চাশেক ব্যাঙ্কে পড়ে আছে। বাড়ি ভাড়া বাবদ পান দু'হাজার। সুদ আর এই টাকায় দুজনের বেশ চলে যাওয়া উচিত।

কিন্তু ওই চলার কি কোন মানে আছে? সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজের মেয়ের হাতের তৈরি চা খেয়ে বাজারে যাওয়া। সেখান থেকে ফিরে কাগজ নিয়ে বসা। তখনও শ্রীমতী ঠাকুরঘরে। কোন কোনদিন রেশন, কোনদিন কেরোসিনের লাইন, ইলেকট্রিক বা টেলিফোনের বিল দিতে দুপুরের আগে ছুটোছুটি করো। তারপর স্নান খাওয়া সেরে যখন বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতে যাও তখন গিন্নির ফিরিস্তি কল বাজবে। অমুক মেয়ের বাড়িতে এই পাঠাতে হবে, ওকে তাই। বাতের ব্যথাটা বড্ড চনমন করছে। বড় জামাই বড়বাজার থেকে এক কৌটো জর্দা এনে দিয়েছিল মাস ছয়েক আগে মুখে লেগে আছে। বারবার তো বলা যায় না জামাইকে, তা ঘরের মানুষ কোন কাজে যদি লাগে। এসব উপেক্ষা করে যদি তিনি শ্রীমতীকে বলেন, 'এসোনা, একটু পাশে শোবে', সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় হবে তাঁর, 'তিনকাল গিয়েও চৈতন্য হল না। বাড়িতে কাজের মেয়ে ঘুরঘুর করছে তবু লজ্জা হয় না।'

অতএব বিকেলে পার্ক, সন্ধ্যেয় টি ভি আর রাত্রে অনিদ্রা। তখন মরীয়া হয়ে বন্ধ দরজা দেখিয়ে মনীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে কাছে ডাকলেন। শ্রীমতী যেন ভূত দেখলেন, 'তোমার ভীমরতি হয়েছে, আমি মরছি শরীরের জ্বালায় আর উনি চাইছেন সোহাগ। আমাকে জ্বালিও না।'

এই হল মনীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। এবং তিনি বেঁচে থাকার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। এইভাবে উদ্দেশ্যহীন হয়ে কেউ বাঁচে? সারাটা সকাল তিনি এসব নিয়ে ভাবলেন। তারপর বড় মেয়েকে টেলিফোন করলেন। বড়মেয়ে ধরল। 'ও বাবা। কি খবর কেমন আছ?'

'ভাল না। তুই আজ আসতে পারবি একবার?'

'আমি ? নাগো। আজ পারব না। তোমার নাতনিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। এই রবিবারে যদি ওর কোন কাজ না থাকে তাহলে ফোন করে যাব।'

টেলিফোন রেখে দ্বিতীয়বার ডায়াল করলেন। ছোট মেয়ে ধরল, 'কে ? ও বাবা, আমি এখনই তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। ও আর আমি আজ হলদিয়ায় বেড়াতে যাচ্ছি। সামনের রবিবারে ফিরব। হঠাৎই ঠিক হয়ে গেল।'

স্ত্রীর কাছে গেলেন মনীন্দ্রনাথ, 'শোন, কলকাতায় আর ভাল লাগছে না। চল কোথায় গিয়ে কিছুদিন থেকে আসি। যাবে?'

স্ত্রী গল্পের বই পড়ছিলেন, মুখ না তুলে বললেন, 'সারাজীবনে তো অনেক বেড়াতে নিয়ে গিয়েছ আর বুড়ো বয়সে ঢং করতে হবে না। লোকে বলবে কি?'

'বাঃ, বুড়োবুড়ি তীর্থে যায় না?'

'এখান থেকে গেলে সংসার সামলাবে কে?'

'সংসারে তুমি আমি ছাড়া আর কে আছে যে সামলাতে হবে?'

'আমি কোথাও যেতে পারব না। সামনের সপ্তাহে গুরুদেব আসছেন।'

মন তেতো হয়ে গেল। এখন তাঁর যে বয়স তাতে ঠিক বুড়োদের মত চালচলনে অভ্যস্ত হননি। কপালে ঈষৎ টাক হয়েছে, পেট বেড়েছে কিন্তু এখনও ট্রাম বাসে স্বচ্ছন্দে ওঠা নামা করতে পারেন।

মনীন্দ্রনাথ হঠাৎ ঠিক করলেন আত্মহত্যা করবেন। না, আত্মহত্যা করার কোন মানে হয় না। মরে গেলেই তো সব গেল। যা যা কর্তব্য করার ছিল তা করা হয়ে গিয়েছে। এখন এই সংসারে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। অতএব এখন যদি নিজের মত চলেন তাহলে কার কি বলার আছে?

বেলা বারটায় যখন শ্রীমতী বাথরুমে তখন ছোট একটা স্যুটকেসে বেশ কিছু জামা কাপড় ভরে মনীন্দ্রনাথ চেকবই-এর একটা পাতা নিয়ে বাড়ি থেকে চুপচাপ বেরিয়ে এলেন। সোজা ব্যাঙ্কে গিয়ে তিনি দশ হাজার টাকা তুলে কিছুটা ট্রাভেলার্স চেকে, বাকিটা নগদে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন এখনও স্টেশনে এসে রিজার্ভেশন চাইলেই তা পাওয়া যায়। দিল্লির ট্রেনে উঠে বসলেন তিনি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত চেয়ারকারে বসে মনে হলে এরই নাম শান্তি। কেউ জানবে না তিনি কোথায় যাচ্ছেন। গিন্নি কান্নাকাটি করবেন এবং ভুলে যাবেন। মেয়েরা একটু হৈ চৈ করবে তারপর হিসাব করবে কি ফেলে গেছেন। দুতিনমাস পরে তিনি শুধু নিরুদ্দিষ্টের তালিকায় থাকবেন। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুতে পারে। বাংলা কাগজে। ব্যস।

প্যান্ট শার্ট পরে জানলার ধারে বসছেন মনীন্দ্রনাথ। যদিও বন্ধ কাঁচ বাইরের জগতটাকে আড়াল করে রেখেছে। ট্রেন ছাড়ার একটু আগে তিনজন যাত্রী উঠল। একটি অল্পবয়সী মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কোন সিটটা?'

মনীন্দ্রনাথ বললেন, 'যেখানে আমি বসে আছি।'

মেয়েটি ঘুরে বলল, 'আন্টি, তোমাকে প্যাসেজের ধারে বসতে হবে, জানলা পেলে না।'

বলতে বলতেই ট্রেন হুইসল দিল। আর আন্টিকে রেখে দুজন দৌড়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে বাই বাই বলতে বলতে। মনীন্দ্রনাথ আন্টিকে দেখলেন। বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে। চর্বি জমলেও কি করে সেটাকে কায়দা করতে হয় তা ইনি জানেন। জিনিসপত্র রেখে বললেন, 'এক্সকিউজ মি, প্যাসেজের ধারে বসলে আপনার কি খুব কষ্ট হয়?'

'মোটেই না।' মনীন্দ্র উঠে দাঁড়লেন। মহিলা পাশ কাটিয়ে ভেতরের সিটে বসতে গেলে নাকে সুবাস এল। নিশ্চয়ই বিদেশী পারফিউম। প্যাসেজের পাশে বসলেন তিনি। আড় চোখে মহিলাকে দেখলেন। মুখে পুরু মেকাপ, জামাটি বেশ সংক্ষিপ্ত, ফলে বুকের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে হাত গুটিয়ে বসলেন তিনি। ট্রেন চলছে। মনীন্দ্রনাথের মনে হল শীতাতপনিয়ন্ত্রিত চেয়ার কারে টিকিট না কাটলেই ভাল হত। চোখ ভরে গাছপালা মাঠ আর আকাশ দেখা যেত। ঘড়ি বলছে সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

'আপনি দিল্লিতে থাকেন?'

পঞ্চাশে পৌঁছে কি করে অত সুন্দর গলার স্বর থাকে? মনীন্দ্রনাথ মাথা নাড়লেন, 'না।'

'কাজে যাচ্ছেন?'

'না। বেড়াতে।'

'এই গরমে দিল্লিতে বেড়াবেন?'

'না, না, দিল্লি নয়। মুসৌরি। দিল্লি হয়ে মুসৌরিতে যাব।'

'কি আশ্চর্য। আমিও তো মুসৌরি যাচ্ছি। ওখানে আমার বাড়ি। আমার কর্তা মিলিটারিতে ছিলেন। বছর পাঁচেক আগে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে—।' নিঃশ্বাস ফেললেন মহিলা। তারপর বললেন, 'প্রতিবছর একবার কলকাতায় আমি বোনের বাড়িতে আসি। সাধারণত শীতকালে আসা হয়। এবার গরমে আসতে হল বিয়ে ছিল বলে। আমার নাম দ্রৌপদী মিত্র।'

'দ্রৌপদী?' মহাভারতের বাইরে কোন মেয়ের নাম মনীন্দ্র শোনেননি। 'বাবা রেখেছিলেন। যাজ্ঞসেনী প্রথমে তারপর দ্রৌপদী। আপনি?'

'আমি মনীন্দ্রনাথ। বড় সেকেলে নাম।'

'তাহোক। বেশ ভারী, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিল আছে।'

মনীন্দ্রনাথ খুশী হলেন। তাঁর নাম নিয়ে মেয়েরা এবং তাঁদের মা কম বাজে কথা বলেছে।

'ছেলেমেয়ে নেই?'

তৎক্ষণাৎ দুটি মেয়ের মুখ মনে পড়ল। ওরা কেউ সময় দিতে পারে না তাঁকে। এখন যদি বলেন আছে তাহলে ইনি আরও জানতে চাইবেন। হয়তো চিঠিও লিখে দেবেন বাড়িতে। মনীন্দ্রনাথ ধীরে মাথা নেড়ে চোখ কান বুঁজে বলে দিলেন, 'আমি বিয়ে করিনি।'

'ওমা কেন? ও বুঝতে পেরেছি।' মহিলা হাসলেন।

'কি?'

'অল্প বয়সে প্রেমে পড়ে আঘাত খেয়েছেন?'

'না, না। প্রেম আমি কখনও করিনি।'

'তাহলে?'

'করা হয়নি এই আর কি।'

'আপসোস হয় না?'

'হয়। তারপর ভাবি কি হতো বিয়ে করে। শুধু অশান্তি বাড়ানো।'

'ও, বিয়ে মানে বুঝি অশান্তি?'

'তাই তো দেখি। ছেলেমেয়ে বড় হলে স্ত্রী অন্য মানুষ হয়ে যায়।'

'তা অবশ্য বলতে পারব না। কারণ ঈশ্বর আমাকে ছেলেমেয়ে দেননি।'

মনীন্দ্রনাথের মহিলার জন্য কষ্ট হল। সন্তানহীনা বিধবার নিশ্চয়ই অনেক দুঃখ।

'চাকরি করেন?'

'করতাম। এখন বিশ্রাম।'

'একাই থাকেন।'

'ঠিক একা নয়। দুঃসম্পর্কের আত্মীয়রা আছে।'

'বিয়ে করলে অন্তত বউ থাকত পাশে।'

'মনের মত বউ না হলে সর্বনাশ হত।'

মনীন্দ্রনাথের কথা শুনে বেশ হাসলেন মহিলা। তারপর বললেন, 'ইউরোপ আমেরিকায় বয়স হলে বিজ্ঞাপন দিয়ে পার্টনার যোগাড় করে অনেকে লিভ টুগেদার করে। না চললে ছাড়াছাড়ি। তাই করতে পারেন।'

'ও বাবা। বাংলাদেশে অমন বিজ্ঞাপন দিলে লোকে মারবে।'

'তা অবশ্য ঠিক কথা।'

'মুসৌরিতে আপনার সঙ্গে কে থাকে?'

'একটি পাহাড়ি মেয়ে আছে। সেই সব করে। ওর ভরসায় মুসৌরি ছাড়ি।'

'আপনি একা থাকতে ভালবাসেন?'

'মোটেই না। সারাজীবন হৈ চৈ করেছি। উনি খুব আড্ডাবাজ ছিলেন। বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে পার্টি হত। ওঃ, কি দারুণ দিন ছিল সেসব।' ফস করে নিশ্বাস ফেললেন দ্রৌপদী।

গল্পে গল্পে সময় কাটল। দ্রৌপদীর ছোট কুকুর যাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রতি রাত্রে ঘুমোন তার নাম 'জনি'। কাজের মেয়েটা এর মধ্যে তিনবার স্বামী চেঞ্জ করেছে। এসব খবর তিনি পেয়ে গেলেন। দ্রৌপদীর তিনখানা ঘর, সামনে লন। লনে বসলে সূর্যাস্ত দেখা যায়। কিন্তু ওঁর বাসনা সূর্যোদয় দেখা। এরকম অনেক কিছু জানলেন তিনি।

রাত্রের খাবার এল। তৃপ্তি নিয়ে খেলেন তিনি। খাওয়ার পর মহিলা ব্যাগ থেকে দুটো ট্যাবলেট বের করে একটা খুলে ফেলে অন্যটা এগিয়ে দিলেন, 'নিন, চুষে খেয়ে নিন। অম্বল হবে না।'

মুখে দিয়ে খুব খুশি হলেন মনীন্দ্রনাথ, 'আপনার অম্বল আছে বুঝি?'

'না, না। আমার শরীরে কোন রোগ নেই। তবে ট্রেনের খাওয়া বলে একটু সাবধান হওয়া ভাল। প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর।'

রাত্রে ঘুম হল ভালো। মনীন্দ্রনাথের কবিতা মনে হল, 'এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি।' মহিলা ঘুমাচ্ছেন। তাঁর মাথা মনীন্দ্রনাথের কাঁধের ওপর এসে পড়েছে। তিনি একটা চাদর গায়ের ওপর মেলে দিয়েছেন যার প্রান্ত মনীন্দ্রনাথের কোলে। ঘুমের আগে মনীন্দ্রনাথ মনে করতে পারলেন না। ঘুম ঘুম শান্তির ঘুম।

মুসৌরিতে বাস থেকে নেমে মনীন্দ্রনাথ দ্রৌপদীকে বললেন, 'মাঝে মাঝে যদি আপনার বাড়িতে বেড়াতে যাই আপত্তি নেই তো?'

দ্রৌপদী বললেন, 'না না। কিন্তু আপনি কোথায় উঠবেন?

'একটা হোটেলে। তারপর ঘর ভাড়া করব।'

'ঘর ভাড়া? আপনি কি অনেকদিন এখানে থাকবেন?'

'সেই রকম ইচ্ছে আছে।'

'বাঃ, তাহলে হোটেলে কেন? আমি ভাবছিলাম আমার বাড়ির একটা ঘর ভাড়া দেব কাউকে। আপনি আমার ওখানে থাকতে পারেন।'

'সে তো ঘুব ভাল, কিন্তু খাওয়া দাওয়া?'

'কিচেন তো একটাই। আচ্ছা, আপনি পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকুন। মাসে পাঁচশ টাকা দেবেন। আপত্তি আছে?'

'বিন্দুমাত্র নয়।'

কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে হুইস্পারিং উইণ্ডোরে সামলে দিয়ে ওঁরা চলে এলেন অপেক্ষাকৃত নির্জন এলাকায়, যেখানে দ্রৌপদীর কটেজ। পাহাড়ি মেয়েটি ছুটে এল। জিনিসপত্র রেখে দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, তোর বরের খবর কি?'

'ওকে ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'ও খুব মদ খায়।'

'ওমা, তাতেই ছাড়লি?'

'হ্যাঁ। রাত্রে আমাকে জেগে থাকতে হয় আর ও নেশায় ঘুমোয়।'

'হুঁ। এখন তুই কি করবি?'

'আর একটা বিয়ে করব। ও মদ খায় না। খুব শক্ত পুরুষ।'

মনীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে কথাগুলো শুনে মেয়েটিকে দেখলেন। বেশ সাধারণ চেহারার পাহাড়ি মেয়ে। একটার পর একটা স্বামী খুঁজছে সুখের জন্য।

মনীন্দ্রনাথের ঘরটি ভাল। কাঁচের জানলা আছে। সুন্দর বিছানা। তাতে কিছুক্ষণ শুয়ে মনীন্দ্রনাথ হিসাব করছিলেন। ষোল মাসতো খুব স্বচ্ছন্দে কাটবে তাঁর। ষোল মাসে আট হাজার টাকা। বাকিটা হাত খরচ। তারপর দেখা যাবে ।

দিন সাতেক চমৎকার কাটল। সকালে ব্রেকফাস্ট করে মনীন্দ্রনাথ যখন বেড়াতে বের হন তখন দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা এবং কথা হয়। দুপুরের লাঞ্চ তাঁর ঘরে আসে। এখন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তিনি লিখছেন। আর এই পৃথিবী, আকাশ আর সূর্যের সঙ্গে শীতের সহাবস্থান উপভোগ করছেন চুটিয়ে। সারাদিন ঘুড়ে বেড়ান মুসৌরির পথে পথে। সংসার ছেড়ে আসার জন্যে তাঁর কোন অনুশোচনা নেই। মনে হচ্ছে মুক্ত জীবন পেয়েছেন তিনি। দ্রৌপদী তাঁকে একদম বিরক্ত করেন না। অপ্রয়োজনে কাছে আসেন না। শুধু ব্রেক ফাস্ট-

এ টেবিলে দেখা হয়, কথা হয়, এবং ওই পর্যন্ত। মনীন্দ্রনাথ ভাবেন কলকাতার কথা। স্ত্রী এবং মেয়েরা কি এর মধ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়েছে? হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ?

সাতদিনের মাথায় ঘটনাটা ঘটল। কাজের মেয়েটি রান্নাবান্না করে তার নতুন স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে ছুটি নিয়ে চলে গেল। রাতের খাবার ঘরে এল না। খিদে পেয়েছিল খুব। মনীন্দ্রনাথ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ডাইনিং রুমে এলেন। কেউ নেই। কি করবেন বুঝতে না পেরে দ্রৌপদীর ঘরে নক্ করলেন। দরজা খোলাই ছিল। দ্রৌপদী ঘরে আসতে বললেন।

মনীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকে দেখলেন দ্রৌপদী টিভি দেখতে দেখতে মদ্যপান করছেন। আজ পর্যন্ত কোন নারীকে তিনি মদ্যপান করতে দেখেননি। দ্রৌপদী তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। জীবনে কখনও মদ্যপান করেননি মনীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেরেফ কৌতূহলের বশে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে মুখোমুখী বসলেন।

খেয়াল হল যখন তখন মধ্যরাত। তিনি দ্রৌপদীর দুই হাতের বাঁধনে শুয়ে আছেন। বড় আরাম লাগছিল তাঁর। একটি নারী শরীর তাঁর এত কাছে। শ্রীমতী মনীন্দ্রনাথ তাঁকে এই সুখ দেননি ইদানীং। আর তখনই ঘুম ভেঙ্গে গেল দ্রৌপদীর। তিনি বললেন, 'আর একা থাকতে পারছি না গো। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে? স্টে গেট টুগেদার। আমার আর বাচ্চা হবে না।' ঘুম জড়ানো কথাগুলো শুনে চুপ করে রইলেন মনীন্দ্রনাথ। তাঁর শরীর এই মুহূর্তে পাঁচ বছরের শিশুর মতন। কোন সাড়, কোন উত্তেজনা নেই। হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন, দৈনিক কলহ, নিত্য অশান্তিতে যে সুখ আছে তার অতিরিক্ত কোন শারীরিক সুখ পাওয়ার অধিকারী তিনি নন। চুপচাপ জেগে রাতটা কাটিয়ে দিলেন তিনি। পরদিন প্রত্যুষে দ্রৌপদীর ঘুম ভাঙ্গার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রেন ধরলেন মনীন্দ্রনাথ। কলকাতার।

আ দ্য শ্রা দ্ধ

প্রথম এসেছিল অমল।

দিল্লী থেকে প্লেনেই উড়ে আসবে ভেবেছিল, কিন্তু রত্না বলেছিল, 'খামোকা অত টাকা কেন নষ্ট করবে, ট্রেনেই যাও, কোম্পানির পয়সায় তো ট্যুরে যাচ্ছ না!'

কথাগুলো মনে ধরেছিল। অবশ্য টেলিগ্রাম পাওয়ার পর থেকেই মন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। যেন দশমণি একটা পাথর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে মনের আংটায়। নড়তে-চড়তে বুকের মধ্যে যন্ত্রণা। নিঃশ্বাস ভারী। সড়সড় করে সমস্ত ছেলেবেলা, কিশোর এমন কি যৌবনের প্রারম্ভকাল শেকড়-উপড়ানোর মত চলে এল সামনে। তৎক্ষণাৎ অফিসে গিয়ে ছুটির দরখাস্ত করেছিল সে। মা মৃত্যুশয্যায়, ছুটি তো মঞ্জুর হবেই।

অফিসে বসেই প্লেনের জন্যে চেষ্টা করবে ভেবেছিল অমল। তার আগে বাড়িতে রত্নাকে খবরটা দিল। বৃন্দাবনদা টেলিগ্রাম করেছেন। সব শুনে রত্না ওই কথাগুলো বলেছিল। আর তারপরেই মনে হয়েছিল, খুব একটা দেরি হবে না। রাতের প্লেন ধরে কলকাতায় পৌঁছাতে সাড়ে দশটা। মাঝে মাঝে এত লেট হয় দুটো বাজলেও অবাক হবার কিছু নেই। তার চেয়ে বিকেলের রাজধানী ধরে সকালেই পৌঁছে যাওয়া যায়। চটপট কিছু টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে ও নতুন-দিল্লী স্টেশনের সামনে থেকে টিকিটের ব্যবস্থা করে বাড়িতে এসে শুয়েছিল খানিক। তিন বছরের বাপ্পা কাছে ঘেঁষতেই রত্না নিষেধ করেছিল, 'বাপ্পা, বাপীর কাছে যেও না, ঠাকুমার শরীর ভাল নেই। সী ইস লিভিং আস।'

ইংরেজি চারটে শব্দ কানে খট্ করে বাজলেও চুপ করে থাকল অমল। তার সত্যিই কান্না পাচ্ছিল। কেউ রইল না তার। বাবার সঙ্গে কোনদিনই সম্পর্ক ভাল নয়। মা-ই তাকে সবসময় আড়াল দিয়েছে। এমন কি রত্নাকে বিয়ের ব্যাপারটায় বাবার আপত্তি মায়ের জেদে নরম হয়েছিল। সেই মা চলে যাচ্ছে, হয়তো কলকাতায় গিয়ে দেখবে চলেই গিয়েছেন। বুকের আংটা ওজনের ভারে যেন খসে পড়ছিল।

প্রচণ্ড উদ্বেগ নিয়ে হাওড়া স্টেশনে নেমে সে আর ট্যাক্সির লাইনের জন্যে দাঁড়ায়নি। বাড়তি টাকা দিয়ে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে ছুটে এসেছিল সল্টলেকে। এখানেই সুইমিং পুলের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শতদল দত্ত বাড়ি করেছেন। আধুনিক সেই বাড়িতে মোট পাঁচটি ঘর। দোতলায় দুটি, একতলায় তিনটি। বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে অমল নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওপরের দিকে তাকিয়েছিল। কোন সাড়াশব্দ নেই। ভাড়া মিটিয়ে

ব্যাগটা বাঁ হাতে নিয়ে গেটের দিকে পা বাড়াতেই দোতলার বারান্দা থেকে বৃন্দাবনদার গলা পাওয়া গেল, 'ওই যে, ছোট দাদা এসে গিয়েছে।' বলার ধরনে এক ধরনের আহ্লাদ ছিল, সিঁড়িতে পা দিতে দিতে তেমনই মনে হল অমলের। কেউ মরে গেলে এমন গলায় কথা বলা যায় না। অন্তত বৃন্দাবনদার মত মানুষ তো পারবেই না।

বৃন্দাবনদা দরজা খুলেই বলল, 'যাক, তুমি এসে গিয়েছ! খুব ভাল হল।'

'মা কেমন আছে?' প্রশ্নটা যেন ছিটকে বের হল।

মাথা নাড়ল বৃন্দাবনদা, না, তারপরেই কেঁদে ফেলল, 'ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছে।'

'কোথায় আছে? কোন নার্সিং হোমে?'

'না, না, বাড়িতেই আছে।'

'বাড়িতে? বাড়িতে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল বৃন্দাবনদা, 'বয়েস হয়েছে। পনের দিন ধরে ভুগছেন, একটু একটু করে, শেষে বুকের ব্যথা বাড়ল। বাবু নার্স আনালেন, অক্সিজেন, স্যালাইন—সব বাড়িতেই দেওয়া হচ্ছে, কোন ত্রুটি হয়নি।'

'দাদাদের খবর দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। একসঙ্গেই টেলিগ্রাম করেছি। চল।'

'বাবা কোথায়?'

'তিনি তো মায়ের সামনে দিনরাত বসে আছেন। ওখানেই খান, ওখানেই ঘুমান। শুধু বাথরুমের সময় ওঠেন। আরও জড়ভরত হয়ে গেল মানুষটা।'

এই সময় বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়াল। বৃন্দাবনদা বলল, 'ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

অমল দেখল একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসছেন। তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবন আলাপ করিয়ে দিতে ভদ্রলোক বললেন, 'ভাল করেছেন এসে। ইটস এ লস্ট কেস। শরীর আর রেসপন্স করছে না। আমরা ভেবেছিলাম রাত কাটবে না। এখন যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণই লাভ।'

'আপনি ওঁকে নার্সিং হোমে ট্রান্সফার করছেন না কেন?'

'কোন লাভ নেই। এটা বয়সের ব্যাধি। নিজের জায়গায় শেষ নিঃশ্বাস ফেললে উনি বেশী আরাম পাবেন। তাছাড়া মিস্টার দত্ত চিকিৎসার ত্রুটি রাখেননি।'

ডাক্তারের পেছন অমল ওপরে উঠে এল। ঘরে ঢুকেই অমল শতদল দত্তকে দেখতে পেল। জানলার ধারে একটা ইজি চেয়ারে বসেছিলেন বৃদ্ধ। পায়ের শব্দে মুখ ফেরাতেই অমলের সঙ্গে চোখাচোখি হল। অজান্তেই কেঁপে উঠল অমল। বৃদ্ধের চোখে কোন অভিব্যক্তি নেই। এগিয়ে এসে প্রণাম করতে যেতেই শতদল বললেন, 'থাক। অসুস্থ মানুষকে প্রণাম করতে নেই।'

অমল হকচকিয়ে গেল। শতদলও কি অসুস্থ? সে মুখ ফিরিয়ে দেখল ডাক্তার মায়ের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সে মাথা নিচু করে এগিয়ে গেল মায়ের কাছে।

চারুশীলা শুয়ে আছেন। প্রায় অস্থিসার চেহারা। না, স্যালাইন বা অক্সিজেনের কোন চিহ্ন দেখল না অমল। ডাক্তার ওঁর নাড়ি দেখছেন। স্টেথোস্কোপটা বুকে চাপলেন। তারপর মৃদুস্বরে ডাকলেন, 'মিসেস দত্ত, আপনার ছেলে এসেছেন, মিসেস দত্ত?'

মায়ের মুখে কোন অভিব্যক্তি এল না। তাঁর চৈতন্য এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যেখানে জাগতিক কোন শব্দ পৌঁছায় না। ডাক্তার বৃন্দাবনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নার্স কোথায়?'

'এই মাত্র বাথরুমে গিয়েছে।' বৃন্দাবনদা জবাব দিল।

ডাক্তার চলে গেলেন শতদল দত্তের কাছে, 'আপনি কিন্তু সারাক্ষণ এখানে এভাবে বসে থেকে অন্যায় করছেন। আপনাকে তো ওঁর কথা বলেছি।'

'ও কখন যাবে ডাক্তার?'

'সেটা বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি চিকিৎসাশাস্ত্রে এক্ষেত্রে কোন কিছু করণীয় নেই।'

'তাহলে আমার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিলেই ভাল হয়।' শতদল দত্ত মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর সেই সময় নার্স ঢুকল। মায়ের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বেশ অবাক হয়ে গেল অমল। ভদ্রমহিলা সাদা শাড়ি, মানে যাকে বলে নার্সের ইউনিফর্ম পরেছেন বটে কিন্তু এমন লাস্যময়ী নার্স সে কখনও দ্যাখেনি। ডাক্তার ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওষুধ নিয়ে কথা বললেন। অমল মায়ের দিকে তাকাল। তার বুক কেঁপে উঠল। পাথরের মত মুখ। মাথায় হাত বোলালো সে। তারপর নিচু গালায় ডাকল, 'মা!'

চারুশীলার মুখে সামান্য কুঞ্চনও এল না। অমল কপাল, গাল, চিবুকে আঙুল বোলালো। তারপর গাঢ় গলায় আবার ডাকল, 'মা! মা গো!'

চারুশীলার কোন পরিবর্তন হল না। নার্স এগিয়ে এলেন, 'এক্সকিউস মি, উনি রেসপন্স করতে পারবেন না। ডেকে কোন লাভ নেই।'

মেজাজ খুব বিগড়ে ছিল কমলের। সুজাতা টিভি সিরিয়ালের সুটিং করতে গিয়ে ভোর রাতে বাড়ি ফিরেছে। সে পইপই করে বলেছিল টিভিতে অভিনয় করছ কর কিন্তু বাড়ির শান্তি যেন বজায় থাকে। সুজাতা সুন্দরী। যদিও তেত্রিশ বছর বয়েস কিন্তু রাখতে পেরেছে বলে পঁচিশের বেশি মনে হয় না। ফিল্মেও সুযোগ পেয়েছিল সুঁজাতা কিন্তু রাজি হয়নি কমল। টিভি যেন ঘরোয়া শিল্প, সুজাতারও খুব আগ্রহ ছিল, রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। সুটিং-এর জন্যে বাইরে রাত কাটানো এর আগে কখনও হয়নি। ইতিমধ্যে সুজাতার একটা সিরিয়াল নেটওয়ার্কে দেখিয়েছে। অফিসে এই কারণে কমলেরও গ্ল্যামার বেড়েছে। সুজাতার সঙ্গে বাইরে বেরুলে কেউ না কেউ তাকাবেই। গর্ব যে হয় না তা নয়। তাই বলে রাত কাটিয়ে

ফিরবে? মেজাজ তাই ভাল ছিল না। এমন সময় টেলিগ্রামটা এল। মা মৃত্যুশয্যায়, তাড়াতাড়ি চলে এসো। বৃন্দাবনদা।

খপ্ করে বুকের বাঁ দিকটায় যেন খিচ লাগল কমলের। মায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি অন্তত পাঁচ বছর। পাঁচ বছর কলকাতায় যাওয়া হয় না। বাবা সল্টলেকে বাড়ি করেছেন তা পাঁচ বছর আগে দেখে এসেছে সে। জন অ্যাণ্ড মিল কোম্পানির পাবলিক রিলেশন অফিসার কমল দত্ত এখন এত ব্যস্ত মানুষ যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ আত্মীয়দের সঙ্গে রাখতে পারে না। কিন্তু মা অসুস্থ, মৃত্যুশয্যায়, জানতে পারা মাত্র ওর মনে হল এক্ষুনি কলকাতায় যাওয়া উচিত। ভোর রাতে ফেরা সুজাতাকে ঘুম থেকে তুলে ঘটনাটা বলল সে। সুজাতা বলল, 'অসম্ভব। আমার আগামী চারদিন সুটিং আছে। যাওয়ার ইচ্ছে হলে তুমি যাও।'

প্রচণ্ড রেগে গেল কমল, 'কি আশ্চর্য, আমার মা তোমার শাশুড়ি!'

চোখ ছোট করে সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আজ হঠাৎ খেপে গেলে কেন?'

'মানে?'

'এতগুলো বছর একবারও বুঝতে পারিনি মায়ের ওপর তোমার এমন টান আছে। উনি চিঠি দিলেও তো উত্তর লেখার সময় পেতে না। তাছাড়া ভদ্রমহিলা অসুস্থ, আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু তুমি তো জানতে ওঁর বিরুদ্ধে আমার কিছু অভিযোগ আছে।'

কমল জানে। জানে বলেই সেইসময় মায়ের ওপর বেশ রেগে গিয়েছিল। কলকাতায় গিয়ে দুদিন থাকতে না থাকতেই সুজাতা হয় দার্জিলিং নয় দীঘায় বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করত। মা বলেছিলেন, 'তাহলে লোক দেখিয়ে এখানে ওঠা কেন বাপু, হোটেলে থেকে ওসব করলেই পার।' কথাগুলো না বললেই পারতেন মহিলা। জ্ঞান হওয়া ইস্তক দেখে এসেছে কমল, উনি সোজা কথা মুখের ওপর বলে দেন। বাবার সঙ্গে যে কতবার ঝগড়া এবং কথা বন্ধ হল তার ইয়ত্তা নেই।

অতএব আর কথা বাড়াল না কমল। যতই হোক মা ইজ মা, সে মনে মনে বলল। অতএব বোম্বে থেকে সকালেই প্লেনে দমদমে পৌঁছে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অবস্থা প্রায় ট্রেনের মতন।। এয়ারপোর্টে নেমে ট্যাক্সি ধরতে বেলা বারোটা বাজল। সেখান থেকে সোজা সল্টলেক।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সিগারেট ধরালো কমল। মা যদি চলে গিয়ে থাকে, হঠাৎ বুকের ভেতর মেঘ জমতে শুরু করল, ঠোঁট কামড়াল সে। পা ভারী হয়ে উঠল। সে ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে বেল বাজাল। মিনিট খানেকের অপেক্ষা। কমলের মনে হচ্ছিল সে অন্য কারো বাড়িতে এসেছে। বয়স এবং দূরত্ব কিভাবে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়! দরজা খুলল। কমল অবাক হল, অমল দাঁড়িয়ে, পরনে পাঞ্জাবি এবং পাজামা। অর্থাৎ অমল তার আগেই এসে গিয়েছে। অমল বলল, 'ওঃ দাদা, এসো।'

কমল ঘুরে ঢুকল। অমলকে সে কত বছর পরে দেখছে তা মুহূর্তে মনে করতে পারল না। ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে আরও অস্বস্তি বাড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'মা!'

'অবস্থা ভাল নয়। ডাক্তার এসেছিলেন একটু আগে। বললেন কোন চান্স নেই।'

'ঠিক কি হয়েছে?'

'বললেন বয়স হলে যা হয়। কথাও বলতে পারছেন না, কোন হুঁশ নেই।'

কমল ঠোঁট কামড়াল। হঠাৎ তার কান্না পেল। মুখ চোখ দুমড়ে গেল। চোখ ঝাপসা। ব্যাপারটা অমলকেও আচমকা স্পর্শ করল, 'দাদা, শক্ত হও। শী ইজ স্টিল উইথ আস।'

'মেজ আসেনি?'

'না। আমাদের তিনজনকেই একসঙ্গে টেলিগ্রাম করেছিল বৃন্দাবনদা।'

'আমরা বোম্বে দিল্লী থেকে আসতে পারলাম, আর ও গৌহাটি থেকে—! যাক, বাবা কেমন আছে? শক্ত আছে তো?'

'মনে হয় না। মায়ের ঘর থেকে বের হচ্ছেন না।'

'সেকি? মা কি বাড়িতে আছে?'

'হ্যাঁ, ডাক্তারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বললেন নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে কোন লাভ হবে না। মায়ের কাছে গিয়ে আমারও তাই মনে হল!'

কমল সোফায় বসে পড়ল। দুহাতে মুখ ঢাকার চেষ্টা করে আঙুলের ডগায় চোখ মুছল। অমল উল্টো দিকে বসল। মুখ গম্ভীর। সে দাদাকে একবার দেখল। বউদি টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করছে অথচ দাদার চেহারায় বয়স এসে গিয়েছে বেশ। জুলপি পাকা, সামনের দিকের চুল অনেকটা উঠে গিয়েছে। ভারী হয়েছে শরীর। ছেলেবেলায় দাদাকে সবাই বলত গুডি বয়। লালুভুলু। দাদার চেহারায় সেই মোলায়েম ব্যাপারটা আর নেই। ভাল চাকরি করে, পয়সাও বানিয়েছে কিন্তু অমলের মনে হল সুখে নেই দাদা। রত্না তো বউদিকে সহ্য করতে পারে না। নেট ওয়ার্কের সিরিয়ালে অভিনয় দেখে প্রচুর খুঁত বের করেছিল। কিন্তু আজ অমলের মনে হল দাদার মধ্যে আগেকার ভাল মানুষ ব্যাপারটা এখনও রয়ে গেছে।

সে জিজ্ঞাসা করল,'ওপরে যাবে না দাদা?'

কমল মুখ তুলল, 'আমি মাকে ওভাবে দেখতে চাইনি অমল!'

এইসময় বাইরের দরজায় শব্দ হল। অমল নিঃশব্দে উঠে গিয়ে দরজা খুলল। তারপরেই গলা তুলে বলল, 'মেজদা এসেছে।'

কমল শরীরটাকে তোলার চেষ্টা করেও আবার বসে পড়ল। সে শুনল, শ্যামল বলছে, 'মা কেমন আছে?'

অমল তাকে দরজাতে দাঁড়িয়ে একই ঘটনা বলে গেলে সে ভেতরে ঢুকল। শ্যামল জিজ্ঞাসা করল, 'ও দাদা, কখন এলে?'

কমল কাঁধ নাচাল। শ্যামল সোফায় বসে বলল, 'বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'আমি ওপরে যাইনি এখনও। যাওয়ার সাহস পাচ্ছি না।' কমল জবাব দিল।

শ্যামল বলল, 'আমি তো টেলিগ্রাম পেয়ে অবাক। গতবছর একবেলার জন্যে কলকাতায় এসেছিলাম, মানে রাত্রে এসে পরদিনই চলে গিয়েছিলাম, তবু সময় বের করে এখানে এসে দেখা করে গিয়েছি। মা তখন অ্যাবসলিউটলি নর্মাল। আমার সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হল। তেমন কিছু নয়। কোন অসুখ তো দেখিনি।'

কমল জানতে চাইল, 'কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল?'

'সিলি ব্যাপার! আসলে কলকাতায় এলে বড়শালার কাছে না উঠলে এমন ঝামেলা হয় যে কি বলব। মা তাই নিয়ে—ছেড়ে দাও। আমাকে যে বউ-এর সঙ্গে সারাজীবন বাস করতে হবে তা মায়ের মাথায় ঢোকে না। অথচ বাবা তো চিরকাল বউ-এর বাদি মেনে চললেন। সেটা তো আমরা দেখেছি। সত্যি মারা যাবে?'

কমল বলল, 'অমল তো বলল ডাক্তার তাই বলেছে।'

'উঃ, আমি ভাবতেই পারছি না।' চোখ বন্ধ করল শ্যামল।

অমল বলল, 'তোমরা ওপর থেকে ঘুরে এসো। কখন যে ঘটনাটা ঘটে যাবে কে জানে!'

এই সময় বৃন্দাবনটা নেমে এল একটা ট্রে হাতে নিয়ে। এদিকে তাকাতেই লোকটার মুখে হাসি ফুটল, 'আমি জানতাম খবর পাওয়া মাত্র তিনজনেই চলে আসবে। হাজার হোক পেটের ছেলে।'

কমল তাকে ইশারায় ডাকল, 'মা কি করছেন?'

'যাও না, দেখে এসো। এতদূর ছুটে এসে এখানে বসে আছ কেন?'

কমলের বারো বছর বয়সে বৃন্দাবন এ বাড়িতে কাজে লেগেছিল। এখন ওই কথা বলার ধরনে তার রাগ হলেও সে চুপ করে গেল। বৃন্দাবন বলল, 'দেখা করে এসে হাতমুখ ধুয়ে নাও সবাই, আমি চা বানাচ্ছি। জলখাবার না একেবারে ভাত দেব?'

শ্যামল বলল, 'হোল নাইট ট্রেনে জেগে এসেছি, আমি শুধু চা খাব।'

বাকি দুজন কিছু বলল না। শ্যামল বলল, 'অমল, তুইও চল সঙ্গে।'

শতদল দত্ত চেয়াব ছেড়ে উঠে এসে চারুশীলার মাথায় হাত রাখলেন। বেশ উত্তাপ আছে। কপালে এসে পড়া চুল সরিয়ে দিলেন। বাঁ হাত বুকের ওপর ভাঁজ করা আছে, সরিয়ে রাখলেন। প্রথম প্রথম নার্সের সামনে এসব করতে সঙ্কোচ হত, আজকাল হয় না। কিছু করার না থাকলে মেয়েটা পাশের চেয়ারে বসে সিনেমার ম্যাগাজিন পড়ে। চেয়েও দ্যাখে না তিনি কি করছেন। শতদল ঝুঁকে পড়লেন, 'চারু! শুনতে পাচ্ছ? ও চারু। ইউ কাণ্ট্ গো লাইক দিস। আমি তোমার থেকে পাঁচ বছরের বড়, যাওয়ার কথা আগে আমারই। চারু।'

এইসময় দরজার কাছে শব্দ হল। চমকে সোজা হতে হতে পেছন ফিরলেন শতদল। তিন পুত্র একই সঙ্গে দরজায়। হঠাৎ তিনি তিনজনের ভাল নাম মনে করতে পারলেন না। তবে বোম্বে গৌহাটি দিল্লীর কথা মনে পড়ল। তাঁর তিন প্রবাসী পুত্র।

তিনি কোন কথা না বলে চুপচাপ জানালার পাশের ইজিচেয়ারে ফিরে গেলেন। ওরা ধীরে ধীরে চারুশীলার পাশে এসে দাঁড়াল। কমল ডাকল, 'মা, মা'!

নার্স বলল, 'উনি শুনতে পাচ্ছেন না।'

কমল থমকে যেতেই হঠাৎ একটা শব্দ, যা কান্নারই বহিঃপ্রকাশ, ছিটকে এল গলা থেকে। শতদল কথা বললেন, 'এখনও সময় হয়নি। অসময়ে কান্নাকাটি এই ঘরে হোক আমি চাই না!'

তিন পুত্র একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল শতদল কথাগুলো বলেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছেন। শ্যামল এগিয়ে গেল তাঁর কাছে।

'বাবা!'

'বলতে পার।'

'বাবা, আপনি এখন আর আমাদের ওপর রাগ করবেন না।'

'আমি রাগ করেছি এই খবর কোত্থেকে পেলে?'

'না মানে, আচ্ছা, মায়ের চিকিৎসা আর একটু ভালভাবে করা যায় না?'

'খারাপভাবে হচ্ছে তা তোমাকে কে বলল?'

'আমি বলেছিলাম যদি ওঁকে নার্সিং হোমে, মানে আমার শালা তো নামকরা ডাক্তার, ওর নার্সিং হোম আছে, আপনি তো জানেন—, আর একটু চেষ্টা করা যেত!'

'তোমার আর কোন কথা বলার আছে?' শতদল সরাসরি তাকালেন।

এবার কমল এগিয়ে গেল, 'বাবা, আপনার কি মনে হচ্ছে চিকিৎসার কোন ত্রুটি হচ্ছে না? আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

'আমি ভেবে পাচ্ছি না, তোমরা কয়েক মিনিট আগে এসে কি করে বুঝে গেলে ট্রিটমেন্ট ঠিক হচ্ছে না! অবশ্য তোমরা ওর ছেলে, তোমরা বলতেই পারো।'

'আপনি যখন বলছেন তখন আমাদের আর কি বলার থাকতে পারে। কিন্তু আপনার এবার বিশ্রামের প্রয়োজন। এভাবে বসে থাকাটা ঠিক নয়।'

শতদল কমলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'তোমরা সবাই একাই এসেছে?'

কমল ঠোঁট কামড়াতে গিয়েও সামলে নিল, 'হ্যাঁ।'

'বেশ তো। তাহলে নিচে যাও, খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নাও। অনেকদিন বাদে তিনভাই পরস্পরের দেখা পেলে। অন্তত খবর পাওয়া মাত্র এসেছ বলে আমি খুশী।'

বৃন্দাবনদার রান্না খারাপ নয়। যদিও আর একটি কাজের মেয়ে রয়েছে। ওরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাইরের ঘরে এসে বসল। আগে অমল দাদাদের সামনে সিগারেট খেত না, আজ ধরাল। কমল জিজ্ঞেস করল, 'তোর খবর কি?'

'চলছে। বউদির সিরিয়াল দেখলাম।'

'ওই, হবি আর কি! আমি বাধা দিই না। রত্না কেমন?'

'আছে। আসতে চেয়েছিল, আমি সঙ্গে আনিনি।'

'ভালই করেছিস। এখানে এত টেনশন—।'

শ্যামল চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ বলল, 'বাবাও কেমন বদলে গিয়েছে।'

কমল হাসল, 'বাবার সঙ্গে চিরকালই আমাদের দূরত্ব ছিল।'

অমল বলল, 'বাবা কিন্তু মাকে খুব ভালবাসেন।'

কমল বলল, 'আগে বুঝিনি। আজ মনে হল। মানুষের বোধহয় বয়স বাড়লে প্রেমও বাড়ে। তোর মনে আছে শ্যামল, একবার স্কুল থেকে কার রবার চুরি করেছিলি বলে বাবার কাছে জোর মার খেয়েছিলি।'

'এই যাঃ। আমি চুরি করিনি। ভুল করে নিয়ে এসেছিলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে কমল এবং অমল হেসে উঠল। হঠাৎই ওরা অতীতে ফিরে গেল। তিনজনেই স্মৃতিতে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট চোট্ট ঘটনা তুলে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা শুরু করল! বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সবাই ঘটনাটার বিশ্লেষণে একমত হচ্ছিল না। তবু এই জাবর কাটায় খুব মজা পাচ্ছিল। অনেক অনেক কাল এই ধরনের কথাবার্তা বলা হয় না। এইসব কথা বলার মানুষও চারপাশে থাকে না। কবে কখন কমল অমলকে চাঁটি মেরেছিল চটি পরার জন্যে, কবে শ্যামল কমলের একটা টাকা চুরি করেছিল, তখনকার রাগ আজ নেহাতই সুখকর স্মৃতি। তিন ভাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। এইসময় বৃন্দাবন এল, 'অনেক কষ্টে বাবুকে শুতে পাঠিয়েছি। তোমরা একজন ওপরে যাবে?'

অমল তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। বাকি দুজনের মনে ওই মুহূর্তে ইচ্ছে এলেও অমলকে উঠতে দেখে তারা আর উদ্যোগ নিল না। অমল চলে গেল শ্যামল বলল, 'অমলটা সেই ছেলেবেলার মত রয়েছে। সব কিছু আগে না পেলে কি রকম কান্নাকাটি না করত!'

কমল বলল, 'বুঝলি, অনেক ভেবে দেখলাম, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হল ছেলেবেলা। কি ভালই না ছিলাম তখন। টেনশন ছিল না, নিজের কথা ভাবতে হত না।'

'সত্যি কথা। এখন টাকা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, স্ত্রী, বাচ্চাকাচ্চা—।'

'আমাকে তো ভগবান ও ব্যাপারে দয়া করলেন না।'

'ডাক্তাররা কি বলছে!' শ্যামল জানতে চাইল।

মেজভাই-এর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল তবু কমল বলল, 'হবে না।'

শ্যামল নিঃশ্বাস ফেলল, 'খুব টায়ার্ড লাগছে। রাত্রে ট্রেনে ঘুমাতে পারিনি।'

'ঘুমিয়ে নে!'

'নাঃ। একবার শ্যালকের বাড়ি যেতে হবে। কখন মায়ের কি হয়ে যায়, তখন আর সময় পাবনা। আমি বরং ঘুরেই আসি।' শ্যামল উঠল।

অমল মায়ের পাশে বসে দেখল মাঝে মাঝে গালের চামড়ায় কুঞ্চন হচ্ছে। সে ঝুঁকে ফিসফিস করল, 'মা!'

'উনি শুনতে পাবেন না।' নার্সটি বলে উঠল।

'আপনি এরকম কেস আগে দেখেছেন?' অমল মুখ তুলে মহিলাকে দেখল। চেহারা দেখে নার্স বলে মনে হয় না। বউদির বদলে ইনি টিভি সিরিয়ালে নামলে বেশী নাম করতে পারতেন।

মহিলা ঠোঁট টিপে হেসে নিয়ে বললেন, 'অ-নে-ক। আপনারা মন তৈরী করে নিয়েছেন। শুধু আপনার বাবা বিশ্বাস করতে চাইছেন না।'

অমল মায়ের পাশ থেকে উঠে বাবার খালি চেয়ারটায় গিয়ে বসল।

নার্সটি সিনেমার পত্রিকায় নজর রাখল। অমল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সবসময় এইভাবে বসে থাকেন? ডিউটি কতক্ষণ?'

'চব্বিশ ঘণ্টার। ইচ্ছে করেই নিয়েছি। টাকার খুব দরকার।' আবার হাসি।

'কত টাকা দেওয়া হচ্ছে?'

'দেড়শ।' পত্রিকাটি পাশে রাখল সে, 'আপনি দিল্লীতে থাকেন?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'দিল্লীতে আমার স্বামী থাকেন।'

'ও। আপনারা আলাদা আছেন?'

'অনেক দিন। বছরে একবার দেখা হয়। বাপের বাড়ির খরচ চালাই বলে টাকার দরকার। আমার অবশ্য এই চাকরি করার কথা নয়।'

'আপনাকে দেখে তাই মনে হয়।'

দুচোখে অদ্ভুত কাজ দেখাল মহিলা, 'কি মনে হয়?'

'আপনি অন্যরকম।'

মহিলা মুখ নামালেন। অনেকক্ষণ কোন কথা হল না। হঠাৎ মহিলা বললেন, 'আমি তো আছি। আপনি বিশ্রাম নিন। অতদূর থেকে এসেছেন।'

'আমি এখানে থাকলে আপনার অসুবিধে হবে?'

'না, না।' প্রতিবাদ করলেন মহিলা।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। মাঝে মাঝে চোখাচোখি হচ্ছে। আর হঠাৎই সেইসময় শিহরণ বোধ করলো অমল। ভদ্রমহিলার চোখে অদ্ভুত আকর্ষণী ক্ষমতা রয়েছে। এই সময় বৃন্দাবনদা এলো, 'যাও, গিয়ে একটু শোও, আমি বসছি।' বসে থাকতে খুব আরাম পাচ্ছিলো অমল কিন্তু না উঠে পারলো না। ওঠার সময় আর এক দফা চোখাচোখি। অনেক কথা যেন বলা হয়ে গেল।

বিকেলে ডাক্তার এলেন। চারুশীলাকে দেখে নেমে এসে বললেন, 'অবস্থা আরও খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে কয়েক ঘন্টা। কিছু হলে আমায় খবর দেবেন।'

ডাক্তার চলে গেলে কমল বললো, 'অন্যান্য আত্মীয়দের খবর দেওয়া উচিত।'

শ্যামল প্রতিবাদ করলো, 'আত্মীয়? এঁরা, এখানে রয়েছেন কেউ তো দেখতে আসেনি। ছেড়ে দাও ওসব। কিন্তু সন্ধ্যের পর কিছু হলে কি করবে?'

অমল কেঁদে ফেললো। শ্যামল ধমকালো, ' বোকার মত কাঁদিস না। ওইভাবে পড়ে থাকার চেয়ে মায়ের যাওয়াই ভালো।'

কমল নিঃশ্বাস ফেললো, 'খুব যন্ত্রণা পাচ্ছেন?'

অমল ভাঙা গলায় বললো, 'বাবার কি হবে?'

শ্যামল বললো, 'সেটাই ভাবছিলাম। বাবা তো আমাদের কারো কাছে গিয়ে থাকতে পারবেন না। অবশ্য বৃন্দাবনদা আছে এখানে।'

কমল বললো, 'মিছিমিছি খরচ করলেন বাড়িটার পেছনে।'

শ্যামল বললো, 'কথা শুনবেন না। আমি তো বলেছি এ বাড়ির ওপর আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আমি তো এসে থাকবো না কোনদিন।'

অমল বললো, 'ইন্টারেস্ট আমারও নেই।'

'বাবা না থাকলে বিক্রি করে দিতে হবে।' কমল বললো।

শ্যামল একটু চুপ করে থেকে বললো, 'কিভাবে নিয়ে যাবে?'

তিন ভাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। অমল বললো, 'এসব কথা এখনই বলা কি ঠিক? অবশ্য ডাক্তার বলে গেলেন—!'

কমল বললো, 'তখন মাথা ঠিক থাকবে না। কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া খুব প্রিমিটিভ আইডিয়া।'

শ্যামল বললো, 'গাড়ি পাওয়া যায়। শালাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও একটা ফোন নম্বর দিয়েছে। ফোন করলেই চলে আসবে গাড়ি।'

অমল বললো, 'গুড। কাঁচের গাড়ি নিশ্চয়ই।'

'তাই তো।'

'আর ইলেকট্রিক চুল্লিতে কাজ করবো। চিতা-ফিতা সহ্য করতে পারবো না। তবে কাছাকাছি ইলেকট্রিক চুল্লি আছে কিনা জানি না।'

শ্যামল বললো, কাগজে পড়েছি নিমতলাতে আছে। ওটাই কাছে।'

'ফুলটুল—?' কমল জিজ্ঞাসা করলো।

'ওই গাড়ির জন্যে ফোন করেই বৃন্দাবনদাকে পাঠাবো।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটা ভারি আবহাওয়া তৈরী হয়ে গেল। হঠাৎ অমল বললো, 'উঃ। ছেলেবেলায় মা আমাকে ভাত খাইয়ে দিতো।'

কমল বললো, 'সবাইকে মা দিয়েছে। যাই বলিস, মায়ের বিকল্প অন্য কোনো মেয়ে হয় না। সুজাতার মধ্যে টেন পার্সেন্ট গুণ নেই।'

'রত্নার মধ্যে আছে ভেবেছ? ওই ম্যাক্সিমাম টেন পার্সেন্ট।'

অমল ফোঁস করে উঠলো। শ্যামল কোনো মন্তব্য করলো না।

কমল বললো, 'কাল সকালের বোম্বে ফ্লাইট কখন রে?'

'কালই চলে যাবে?' অমল জানতে চাইলো।

'আর থেকে কি করবো। খাঁ খাঁ করবে বাড়ি।'

'তা ঠিক। আমিও ভাবছি দিল্লীর ফ্লাইট ধরবো। এক্সট্রা কিছু খরচ হবে, রত্না চটবে, বাট নাথিং ডুয়িং।' অমল বললো।

'তোদের টাকা আছে, প্লেনে যা। আমি ভাই ট্রেনে। সকালে শালার বাড়িতে চলে যাবো। সন্ধেবেলায় কামরূপ এক্সপ্রেস।' শ্যামল বললো।

অমল বললো. 'ভালোই হলো। কাল অফিসে যাওয়া খুব জরুরী ছিল।'

কমল হাত নাড়লো, 'তুই জানিস না, এইভাবে হুট করে চলে এসে কি ক্ষতি করলাম নিজের! ভার্মা এই চান্সকে কাজে লাগাবেই। পেছনে পড়ে আছে আমার! কাল ব্যাটাকে চমকে দেবো।'

ছোট বলেই অমলের ওপর দায়িত্ব পড়লো মাঝে মাঝে মায়ের ঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসা। এখন শতদল দত্ত চারুশীলার মাথার পাশে বসে আছেন। বারংবার ঢুকতে লজ্জা হলো। অমল ইশারায় নার্সকে বাইরে ডাকলো,'যদি মাঝে মাঝে বাইরে এসে আমাকে বলে যান মা কেমন আছে, বুঝতেই পারছেন বাবা মাকে এখন একা পেতে চাইছেন—।'

হাসলো মেয়েটি, 'ওঁদের মধ্যে খুব গভীর প্রেম ছিল, না?'

বাপ-মায়ের প্রেম নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছে হলো না অমলের, সে হাসলো।

নার্স বললো 'ঠিক আছে। আমি নিচে যাবো, না আপনি ওপরে আসবেন?'

'আমিই আসবো। এতো পরিশ্রম করেও আপনি হাসেন কি করে বলুন তো?'

'আমার হাসি আপনার খারাপ লাগে?' চোখে জল এলো।

'না, না। দারুণ!'

'আহা।' শরীর ঘুরিয়ে মেয়েটি চলে গেল।

মিনিট পনের বাদে বৃন্দাবন ছুটে এলো ওপর থেকে। টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগলো। তিন ভাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। ডাক্তারকে ফোন করে বৃন্দাবন বললো। 'মা কেমন করছে!'

ডাক্তার এলেন। রাত দশটা পর্যন্ত তিন ভাই প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করলো। মাঝে মাঝে সবাই ওপরে যাচ্ছে। আর তখন চারুশীলার গলা থেকে বের হওয়া যন্ত্রণার শব্দ শুনতে পেলো ওরা। চারুশীলা বলছেন, 'উঃ আঃ।'

এগারোটার সময় ডাক্তার নিচে নেমে বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার। আমার জীবনে এমন কেস কখনও দেখিনি।'

'কি অবস্থা?' শ্যামল জিজ্ঞাসা করলো।

ডাক্তার বললেন, 'নার্সিংহোমে ফোন করতে হবে।'

'নার্সিংহোমে? কি ব্যাপার?' কমল চমকে উঠলো।

ডাক্তার বললেন, 'হঠাৎ জীবনের লক্ষণ ফিরে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে ওঁকে নার্সিংহোমে ট্রান্সফার করা দরকার। এখনই।'

ডাক্তার ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনতে বললেন। অমল জিজ্ঞাসা করলো, 'তাহলে আজ রাত্রে কোনো সম্ভাবনা নেই?'

'কেউ বলতে পারে না। অনেক সময় প্রদীপ নেবার আগে বেশী আলো দেয়। তবে মনে হচ্ছে এবার ফাইট করার সুযোগ পাওয়া যাবে। আসলে আপনার বাবার মনের জোরেই উনি বোধহয়—!'

অ্যাম্বুলেন্স এলো। স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হলো চারুশীলাকে। তিন ভাই এবং শতদল দত্ত সঙ্গে গেলেন। শতদল দত্তকে নিষেধ করা হয়েছিল কিন্তু তিনি শোনেননি। ভর্তি হবার পর শতদল অসুস্থ বোধ করলেন। নার্সকে বাড়িতেই রেখে আসা হয়েছিল। অতো রাত্রে বেচারা কোথায় যাবে! নার্সিংহোমে চারুশীলার পাশে থাকতে দেওয়া হবে না শতদলকে। তাঁর শরীর খারাপ লাগছিল। অতএব অমল তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলো। আসার পথে শতদল বললেন, 'জীবনে কখনও প্রার্থনা করিনি হে। তোমার মা অসুস্থ হবার পর থেকে করে যাচ্ছিলাম। আমি এখন নিশ্চিন্ত যে সে ফিরে আসবে।'

অমল বললো, 'এ নিয়ে ভাববেন না।'

নার্সকে ঘুম থেকে তোলা হলো। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়ে সে শতদলকে ঘুম পাড়িয়ে দিলো। অমল ফিরে এলো নিজের ঘরে। দাদারা নার্সিংহোমে। বৃন্দাবন তার বাবুর ঘরে বিছানা করে মাটিতে শুয়েছে।

হঠাৎ দরজায় শব্দ হলো। অমল দেখলো নার্স দুটো সন্দেশ আর জল নিয়ে তার ঘরে ঢুকছে, 'এগুলো খেয়ে নিন। আজ তো কিছুই পেটে পড়েনি।'

'অনেক ধন্যবাদ।' হাসলো অমল।

'আমার চাকরি গেল!'

'না। বাবাকে দেখাশোনা করবেন আপনি।'

'সত্যি? আপনি কি ভালো!'

অমলের অনেক কিছু ইচ্ছে হচ্ছিল। বিয়ের পর সে রত্না ছাড়া কোনো মেয়েকে কামনা করেনি। আজ সেই ইচ্ছেটা হলো। নার্স বললো, 'আপনার মা ভালো হয়ে যাবেন। আমার মন বলছে ভালো হবেনই।'

'তবু আপনি ওঁদের দেখাশোনা করবেন।'

'কিন্তু আপনি তো এখানে থাকবেন না।'

'হুঁ, মাঝে মাঝে আসবো।'

'অদ্ভুত!' ভদ্রমহিলা বললেন, 'মিথ্যে কথা কেন বলেন? আপনাদের স্ত্রীরা এখানে আসতেই দেবে না মাঝে মাঝে।'

'একথা আপনাকে কে বললো?'

'আপনার মা। যখন প্রথম এলাম তখন বলেছিলেন।' নার্স ফিরে গেল। অমলের মনে হলো সে যেন প্রচণ্ড এক চড় খেয়েছে।

ভোরবেলায় দুই ভাই ফিরে এলো। চারুশীলার মধ্যে জীবনের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। এখন শুধু লড়াই করার সময়। এই লড়াই কদিন ধরে চলবে কেউ বলতে পারে না। ডাক্তার বৃন্দাবনদা এবং নার্স আছে। অতএব ছুটি নিয়ে অনন্তকাল কেউ বসে থাকতে পারবে না।

তিনভাই একসঙ্গে শতদলের ঘরে গেল। তিনি তখন বিছানায় বসে। চুপচাপ চারুশীলার খবর শুনলেন। শুনে বললেন, 'হ্যাঁ লড়াই করার সুযোগ পেলে সে কখনও হারবে না। আমার জন্যেই তাকে ফিরে আসতে হবে। দায় তার, দায় আমার। তা তোমরা এখানে থেকে কি করবে?'

'আমরাও তাই ভাবছিলাম।' কমল বললো।

'ঠিকই ভেবেছো।'

'যদি মায়ের শরীর, মানে কিছু হয়, সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন।'

'কেন?'

'আমরা চটপট চলে আসবো।'

'না, না,' মাথা নাড়লেন শতদল। 'হিন্দুদের শাস্ত্র আমি ভালো জানি না। তবে মাতৃদায় তো একেবারেই মিটে যায়। তোমাদের মিটে গিয়েছে, এই এলে, এসে চুকিয়ে দিলে, দ্বিতীয়বারের কি প্রয়োজন?'

আ র এ ক জ নে র ম ত আ মি

বিকেলে খবর এল আমাকে আজই দার্জিলিং যেতে হবে। কাজটা অত্যন্ত জরুরি, আগামীকাল দুপুরে মিটিং। ইদানীং ট্রেনে যাতায়াত করি না। দার্জিলিং মেলের টিকিট চাইলেই পাওয়া যায় না। তাছাড়া চোদ্দ ঘণ্টা একা ট্রেনে বসে থাকতে একদম ভালো লাগে না। টেলিফোন করে জানলাম, আজকের ফ্লাইট চলে গেছে। কাল বাগডোগরায় কোনো প্লেন যাবে না। অতএব অস্বস্তি হলেও কোনো উপায় নেই। বেয়ারাকে পাঠালাম স্টেশনে। সে টিকিট কেটে রাখবে। শুনেছি টি.টি.-কে অনুরোধ করলে বার্থ পাওয়া যায়।

আমার বেয়ারা যে এত তৎপর জানতাম না। সে মাত্র তিরিশ টাকা অতিরিক্ত দিয়ে একটি সেকেণ্ড ক্লাস থ্রি-টায়ার বার্থ জোগাড় করে ফেলেছে। এককালে জলপাইগুড়ি থেকে প্রতি বছরে বার-দুয়েক যাওয়া-আসা করতাম জেনারেল কম্পার্টমেন্টে, রিজার্ভেশন ছাড়াই। সে বড় আনন্দের দিন ছিল। কলেজের বন্ধুদের নিয়ে সেসব যাত্রায় দারুণ মজা হত। তারপর সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভেশন, পরে ফার্স্ট ক্লাস অথবা এসি ছাড়া যাওয়ার কথা ভাবতেই পারিনা। সেকেণ্ড ক্লাসের টয়লেটে যাওয়া যায় না, অবিরত কিচির মিচির, জোর করে সিট দখল করা, ভোরে মুখ ধোওয়ার জল পাওয়া যায় না। বেয়ারার হাত থেকে টিকিট নিয়ে অসহায় চোখে তাকালাম। ও ভেবেছিল এখন আনন্দিত হয়ে বাহবা দেব।

ট্রেনটা দাঁড়িয়ে ছিল। ভিড় উপচে পড়ছে। যত লোক যাবে তত লোক তুলতে এসেছে। নির্দিষ্ট কামরায় উঠে সিট খুঁজে খুঁজে আমি হতভম্ব। একেবারে টয়লেটের সামনে আমাকে চোদ্দ ঘণ্টা কাটাতে হবে। এখনই দুর্গন্ধ ছুটে আসছে। এভাবে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভাবলাম নিচে নেমে টি. টি.-কে বলে বার্থটা পাল্টে নিই।

সেকেণ্ড ক্লাসের টি.টি.-র সামনে যাওয়ার উপায় নেই। চাক-ঘিরে-থাকা মৌমাছিদের মতো বার্থবিহীন যাত্রীরা তাঁকে অনুরোধ করে যাচ্ছেন সমানে। ট্রেন ছাড়ার আগেই লোকটা নিশ্চয়ই খালি বার্থগুলোর দখল দিয়ে দেবে। কি করা যায়?

দূর থেকেই দেখতে পেলাম এক মোটাসোটা গোলগাল টিকিট চেকার আসছেন। বিনা বার্থের যাত্রীরা তাঁকে দেখে ছুটে যাচ্ছে কাছে আবার তৎক্ষণাৎ উত্তর শুনে ছিটকে যাচ্ছে যেন। বোঝা যাচ্ছে বার্থ দেবার ক্ষমতা এর নেই। আমার সামনে এসে যেন থমকে উঠেই দাঁড়িয়ে পড়ে হাত জোড় করলেন, 'আরে আপনি স্যার? কেমন আছেন? কোথায় যাচ্ছেন?'

গোলমাল, মাংসল মুখ, মাথায় বিস্তর টাক, কালো কোট-পরা মানুষটিকে আমি আগে কখনো দেখিনি। কিন্তু ইদানীং প্রায়ই ধরা পড়ছে আমার স্মৃতি মধ্যে মধ্যে বেইমানি করে।

কি লজ্জাজনক অবস্থা হয় তখন। হয়তো এঁর সঙ্গে কখনও আলাপ হয়েছিল–, হেসে বললাম, 'যাব তো শিলিগুড়ি কিন্তু এত বিচ্ছিরি বার্থ পেয়েছি...।'

আমি কথা শেষ করলাম না। ভঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করলাম আমার একটা ভালো বার্থ চাই।

'দিন, ব্যাগটা আমাকে দিন। আরে দিন না। আসুন আমার সঙ্গে।'

আমি ব্যাগ হাতছাড়া না করে ওঁর সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। উনি হনহনিয়ে হাঁটছেন। দুপাশ থেকে অনুরোধ আসছে আর উনি নিঃশব্দে হাসিমুখে মাথা নেড়ে হেঁটে চলেছেন। এই হাসি মহাপুরুষ ছবিতে চারুপ্রকাশ ঘোষ হাসতে পেরেছিলেন।

সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট ছাড়িয়ে ফার্স্টক্লাস এল। ভদ্রলোক যদি ফার্স্টক্লাসের চেকার হন তাহলে আমার টিকিটটা এ্যাডজাস্ট করে নেব। কিন্তু উনি ফার্স্টক্লাসও পেরিয়ে গেলেন। দার্জিলিং মেল যে এত লম্বা হয় আমার জানা ছিল না। এসি ফার্স্টক্লাসের সামনে পৌঁছে উনি হাত বাড়ালেন, 'এবার ব্যাগটা আমাকে দিন স্যার।'

আমি একটু দ্বিধায় পড়লাম। জীবনে কখনো এসি ফার্স্টক্লাসে উঠিনি। শুনেছি এখানকার ভাড়া প্লেন ভাড়ার সমান। প্লেনে চড়তে যার আপত্তি নেই তার কেন এসি ফার্স্টক্লাসে আপত্তি? আসলে প্রথমে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে, পরে দার্জিলিং মেলে গত তিরিশ বছর ধরে দ্বিতীয় অথবা প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করতে করতে একটা মানসিক স্থিতি এসে গিয়েছে, তা এতক্ষণে টের পাচ্ছি। চব্বিশ ডলার দিয়ে বিদেশি পারফিউম নিতে অসুবিধে হয় না কিন্তু হাজার টাকার আতর মরে গেলেও কিনব না। অনেকটা এই রকম।

ভদ্রলোক তাহলে এসি ফার্স্টক্লাসের টিকিট চেকার অথবা কণ্ডাকটর। আমাকে যত্ন করে যে কুপেতে বসালেন সেখানে আর কোন যাত্রী নেই। পায়ের তলায় কার্পেট। বাইরের গরম, হল্লা কিছুই এখানে ঢুকছে না। ব্যাগ সিটের নিচে চালান করে হাত ঝেড়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাবেন স্যার, বলুন!'

আমি দ্রুত মাথা নাড়লাম, 'না না, কিছুর দরকার নেই।'

'তা কি হয়! এতদিন পরে আপনাকে পেয়েছি।' পরদা টেনে নিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমি হতভম্ব। এতদিন পর মানে? কোথায় দেখা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে? এখন এই অবস্থায় সেকথা জিজ্ঞাসা করি কি করে? অস্বস্তি বাড়ছিল। এরকম উপছে-পড়া ভিড়ের ট্রেনে আমি একটু আগে যে অবস্থায় ছিলাম আর এখন যেভাবে আছি, তা কল্পনাও করা যায় না। সবে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুখটান দিচ্ছি এইসময় দরজায় শব্দ হল। ভদ্রলোক উঁকি মারলেন, 'স্যার, একজন মহিলা, মানে লেডি যদি এখানে ঢোকেন, তাহলে কি আপনার খুব অসুবিধে হবে?' প্রশ্ন করেই নিজেই উত্তর দিলেন, 'হবে না মনে হয়। এই বার্থগুলো তো খালি রয়েছে। এ্যাই কোলি, সমান নামাও।'

হুকুম দেওয়া মাত্র কুলি দুটো ভারি স্যুটকেস ঢোকাল। তাদের চেহারা এত বড় যে সিটের নিচে ঢুকছিল না। একপাশে সরিয়ে রাখতে হল। করিডোরে মহিলার মিহি গলা শুনতে পেলাম, কত দিতে হবে ভাই?

কুলি বলল, 'পঞ্চাশ।'

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক ধমকালেন, 'মারব গালে থাপ্পড়। পঞ্চাশ! চল্লিশ নে হতভাগা। মেয়েছেলে পেয়ে ঠকিয়ে নেবার চেষ্টা? ম্যাডাম চল্লিশ দিন।'

'আমি মেয়েছেলে না ম্যাডাম?' গলার স্বর তীক্ষ্ণ হল। বুঝলাম যিনি আসছেন তিনি লবঙ্গলতিকা নন।

ভদ্রলোক বললেন, 'হেঁ হেঁ। ঘরের মানুষকে বলতে বলতে মুখ ফসকে এখানে বলে ফেলেছি ম্যাডাম।'

কথাবার্তায় বুঝলাম মহিলা তিরিশ টাকায় কুলিকে বিদায় করলেন, 'আপনাকে কত দিতে হবে বলুন?'

'ফাইভ হাণ্ড্রেড ফিফটি।'

'গতবার তো পঞ্চাশ কম নিয়েছিলেন।'

'জিনিসপত্রের দাম যেভাবে হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, আচ্ছা পঞ্চাশ কম দিন। আপনি হলেন যাকে বলে পুরনো কাস্টমার।' আমার দিকে পেছন ফিরে ভদ্রলোক টাকা পকেটে নিয়ে চলে গেলেন দ্রুত। এতক্ষণ তাঁর শরীর আড়াল করে ছিল, আড়াল সরে যেতে মহিলাকে দেখতে পেলাম। অন্তত পাঁচ-ছয় লম্বায়, গায়ের রঙ পাকা ধানের মতো, ঈষৎ মেদবতী, এই মহিলা একদা অনেক পুরুষের মাথা ঘুরিয়েছেন, কিন্তু সেই স্মৃতি ভুলতে পারেননি বলে এখনও মুখের ওপর শিল্পকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। কুপের ভেতরে ঢুকে আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উল্টো দিকের গদিতে ধপাস করে বসলেন। তারপর হাতের ব্যাগ থেকে একটা ইংরেজি সিনেমার পত্রিকা বের করে পড়তে লাগলেন।

মেয়েদের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকার অভ্যেস আমার কখনো ছিল না। কিন্তু এরকম অতিনাটকীয়ভাবে পত্রিকা পড়তে তো কাউকে দেখিনি। এইসময় একটা উর্দি-পরা লোক ট্রে নিয়ে ঢুকল, 'সাব, আপনার চা।'

আমি কিছু বলার আগেই লোকটা ট্রে রেখে গেল। দেখলাম সুন্দর চায়ের পট, কাপ ডিস চিনি দুধ এবং কয়েকখানা বিস্কুট রয়েছে। ট্রেনে এত পরিষ্কার কাপ ডিস এই প্রথম দেখতে পেলাম। বুঝলাম চেকার ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন। গম্ভীর মুখে কাপে চা ঢালছি, এইসময় প্রশ্ন ভেসে এল, 'এসব কি ইনক্লুসিভ?'

তাকিয়ে দেখলাম নতুন কেউ কুপে ঢোকেনি অতএব প্রশ্নটির উত্তর দিতে প্রশ্ন করতে হল, 'তার মানে?'

উনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার পড়া শুরু করলেন। আমি চা শেষ করলাম। এবার সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরাতে যেতেই মহিলা বললেন,'এক্সকিউজ মি, আমি কড়া সিগারেটের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারি না।'

অতএব বেরিয়ে করিডোরে চলে এলাম। ট্রেন ছাড়ল। এসি ফার্স্টক্লাস বলে খালি নেই কোনো কুপে। দার্জিলিং মেলের ভিড় এখানেও পৌঁছেছে। চেকার ভদ্রলোককে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। সিগারেট শেষ করে ভেতরে ফিরে এলাম। মহিলা বই পড়ে যাচ্ছেন। মনে হল কথা বলা দরকার। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এন জি পি-তে যাচ্ছেন?'

বই সরিয়ে রেখে মাথা নাড়লেন, 'আপনি?'

'আমিও।'

'বাঃ, কী ভালো। বেশ কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে। এর আগের বার একটা ভুল করে ফেলে খুব বোর হয়েছিলাম।'

'কিরকম?'

'এই আপনার মতো, না, আপনার চেয়ে ফর্সা, এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি একা যাচ্ছেন? শুনে মাথা জ্বলে গেল। দেখছে একা যাচ্ছি, তবু প্রশ্ন করছে। ন্যাকামো। বলে দিলাম, 'এরপর জিজ্ঞাসা করবেন তো, স্বামী নেই কিনা, বাচ্চা আছে কিনা, বাড়ির ফোন নম্বর কি? আমি কিভাবে যাচ্ছি, তা নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কেন?' বলতেই লোকটার মুখ চুপসে গেল। সারাটা পথ আমার সঙ্গে কথা বলেননি। আমি আবার কথা না বলে থাকতে পারি না, তবে হঠাৎ হঠাৎ রাগ হয়ে যায়। এই যে একটু আগে আপনি আমায় অফার না করে চা খাচ্ছিলেন তখন আমার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল।'

মাথা নাড়লাম, 'সরি। তখনও তো আপনার সঙ্গে আলাপ হয়নি।'

'আলাপ কি এখনও হয়েছে? আমার নাম সুহাসিনী ভট্টাচার্য।' আমি নিজের নামটুকুই বললাম। উনি আবার পত্রিকায় মন দিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে চলন্ত ট্রেনে চেকার দুলতে দুলতে এলেন, 'কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো স্যার?'

'না, ঠিক আছে।'

'একটু আসবেন?'

'কোথায়?'

'এই, একটু বাইরে।'

আমি বের হতেই উনি হাঁটা শুরু করলেন। কামরার এক প্রান্তে দেওয়ালের ভেতর কণ্ডাক্টর গার্ডদের জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা আছে। সেখানে পৌঁছে চেকার খুব বিনীত ভঙ্গিতে আগেই ঢেলে রাখা এক গ্লাস হুইস্কি এগিয়ে দিলেন, 'আপনার জিনিস স্যার। ভাগ্যিস এই বোতলটা আমার কাছে ছিল, নইলে বর্ধমান থেকে নিতে হত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হবে, এই যা।

আপনার কুপেতে ভদ্রমহিলা আছেন, খুব রগচটা মহিলা।' যেন আমাকে সেবা করছেন ভদ্রলোকের এমন মুখের ভাব।

মাঝে মধ্যে পান আমি করি। কিন্তু নেশায় পড়িনি। দিনের পর দিন না খেলেও চলে যায়, খেলেও তুরীয় আনন্দ অনুভব করি না। কিন্তু এভাবে চলন্ত রাতের ট্রেনে বন্ধ দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে মদ খাব কেন? ভদ্রলোক এমন ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে আছেন যে আমি না খেলে তাঁর আত্মা তৃপ্তি পাচ্ছে না। অর্থাৎ উনি আমাকে যা ভাবছেন সেই মানুষটি যে এই মদ খেতেন, তা ওঁর জানা। কিন্তু আমাকে দেখে এত ভুল করছেন কেন? লোকটি কি আমার ডুপ্লিকেট? শুনেছি এই বিশাল পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও একটি মানুষের চেহারায় দুজন ঘুরে বেড়ায়। তুমি কলকাতায় আর সে হয়তো লাসভেগাসে। এত কাছাকাছি আমার মতো কেউ থাকলে তো বেশ মুশকিলের কথা। আমি চুমুক দিতেই ভদ্রলোক জিভ কাটলেন, 'যা, একদম ভুলে গেছি, আপনি তো আবার বাদাম ছাড়া খেতে পারেন না।' আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি ছুটলেন।

মদ খেতে এত খারাপ কখনো লাগেনি। দু-একজন করিডোর দিয়ে হাঁটার সময় আমায় দেখে গেল। আমি যতই গ্লাস আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকি না কেন, ওরা ঠিক বুঝতে পারছে আমি কুকর্ম করছি। এই হুইস্কি, ওই চা, ওসবের জন্যে কত পড়বে কে জানে! লোকটার হাত থেকে এবার বাঁচা দরকার।

শেষ চুমুক দেবার আগে ভদ্রলোক ফিরে এলেন, 'টাইমে এসে গেছি স্যার। বাদাম পেলাম না, কাজু নিয়ে এলাম। বর্ধমানে প্রচুর বাদাম পাওয়া যাবে। রানিং ট্রেন তো। দিন গ্লাসটা।'

'আর ঢালবেন না।' প্রতিবাদ করলাম।

'কি বলছেন স্যার। সেবার, মনে আছে, আপনি একটা পাঁইট একাই খেলেন।'

'এখন শরীর ভালো নেই।'

'তাহলে জোর করব না। আপনার এত ব্যবসা, কলকাতা শিলিগুড়িতে অতবড় ফ্যাক্টরি, এসব তো বাঁচাতে হবে। তা ডিনার কি করবেন?'

'আমার সঙ্গে আছে।'

'সেকি! না স্যার, আপনি বোধহয় আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।'

'না না। একথা কেন বলছেন?'

'তাহলে ডিনার আনতে গেলেন কেন? আমি বর্ধমানে ব্যবস্থা করতাম সেবারের মতো। আর হ্যাঁ, মহিলার জন্যে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না। এনাফ।'

ফিরে আসার সময় হুইস্কির কথা মনে এল। ভদ্রমহিলা গন্ধ টের পাবেন নাকি! ভেতরে ঢুকে গম্ভীর মুখে ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে বসলাম। উনি শুয়ে পড়ছিলেন। উঠে বসলেন, 'আপনি ড্রিঙ্ক করেছেন?'

চমকে উঠলাম, 'না মানে?' কি বলি?

'আমি একজন ভদ্রমহিলা, আমাকে না বলে চোরের মতো ড্রিঙ্ক করে এলেন?' ওঁর গলার স্বর চড়ছিল। রাগ হয়ে গেল। বললাম, 'আমি কোনো অন্যায় করিনি।'

'একশো বার করেছেন।'

'আমার কি করা উচিত ছিল?'

'আমার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল, আমাকে অফার করা উচিত ছিল, আমি আপত্তি জানালে যেটা করেছেন করে আসতে পারতেন।'

'একজন মহিলাকে ওটা অফার করা যায়?'

'কেন যায়না? পৃথিবীর কোথাও কি মহিলারা ড্রিঙ্ক করে না?'

'এটা যে ভারতবর্ষ।'

'ছাই। ভারতীয় নারী ভারতীয় নারী বলে তো আপনারা মেয়েদের বারোটা বাজাতে চাইছেন। কবে কোন ভারতীয় নারী একা আপনার মতো এক উটকো পুরুষের সঙ্গে এমন কুপেতে ট্র্যাভেল করেছে? করেছে?'

'না, করেনি।'

'তবে? আপনি নিশ্চয়ই চাকরি করেন?'

দ্রুত মাথা নাড়লাম। সদ্য শোনা পরিচয়টা উগরে দিলাম, 'ব্যবসা করি। শিলিগুড়ি কলকাতায় ফ্যাক্টরি আছে।'

'ব্যবসায়ীরা এত অভদ্র হয় জানতাম না।' ঠোঁট বেঁকালেন তিনি।

হঠাৎ ঠাট্টা করার বাসনা জাগল, 'আপনি খেলে আনিয়ে দিতে পারি।'

'থাক!' কড়া গলায় বললেন উনি।

খানিক বাদে ওঁর রাতের খাবারের বাক্স বের হল। প্যাস্ট্রি, প্যাটিস, স্যাণ্ডউইচ থরে থরে, বললেন, 'নিজের ব্যবস্থা আছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'দেখুন, আপনাকে বলে তবে খাচ্ছি।'

চোখের সামনে বাক্স খালি হল। জলের বোতল থেকে জল খেয়ে বেরিয়ে গেলেন, সম্ভবত টয়লেটে। খুব মেজাজ খারাপ হল। সাধারণত রাত্রের দিকে আমি কম খাই। আজ তাড়াহুড়োয় সেইটুকু খাবার আনতেও ভুলে গেছি। তখন চেকারকে না বলে ভুল করেছিলাম, এখানে তারই পুনরাবৃত্তি করলাম।

ভদ্রমহিলা ফিরে এলে বললেন, 'এই যে মশাই, গা তুলুন, বাইরে যান।'

'কেন?'

'আমি চেঞ্জ করব। টয়লেটে চেঞ্জ করতে আমার ঘেন্না লাগে।'

দ্রুত বেরিয়ে এলাম। করিডোরে পায়চারি করতে করতে চেকারের সঙ্গে দেখা। বর্ধমান এসে গেছে। খুব ব্যস্ত। স্টেশনে ট্রেন থামতেই একটু দূরে হেঁটে গেলাম। গরম পুরী তরকারি বিক্রি হচ্ছে। তাই খেয়ে নিলাম।

ট্রেন ছাড়ার আগে কামরায় ফিরে আসতেই চেকার বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলেন স্যার? দরকার পড়লে আমাদেরই বলতে পারতেন।'

'একটু হাঁটলাম।' হাসলাম আমি।

'আপনি আজ সেবা করলেন না, খুব খারাপ লাগছে।'

'তাই নাকি? তাহলে দিন।'

'সত্যি? শরীর টরীর?'

'ঠিক আছে।'

আবার খোপ থেকে বোতল বের হল। জল এবং গ্লাস। বললেন, 'বাদাম আনি?'

'দরকার নেই।' আমি গ্লাসে চুমুক দিলাম।

দেখলাম, আমি খাওয়ার পর একটু কমে গেছে বোতল থেকে। তিন গ্লাস পেটে ঢালতেই তলানিতে চলে এল হুইস্কি। চেকার বলল, 'স্যার লুচি আর মাংস আছে, দেব?' মাথা নেড়ে না বললাম।

চেকার যাওয়া-আসা করছিলেন। বললেন, 'আপনার বিছানা রেডি। কিন্তু না খেয়ে শোবেন কেন?'

'আমি ঠিক আছি।'

সবসমেত চার পেগ পেটে পড়েছে কিন্তু ছুটন্ত ট্রেনে পা ফেলতে গিয়ে বুঝলাম নেশা হয়েছে। শরীর একটু বেটাল হচ্ছে। কুপের দরজা বন্ধ। টোকা দিতে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেললাম। ভদ্রমহিলার চিৎকার শোনা গেল, 'কে?'

'আমি। ফিরে এসেছি।'

'দরজা খোলাই আছে।'

টানতেই খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে দেখলাম আমার বার্থে চমৎকার বিছানা করা আছে। কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা শুয়ে পড়লাম দেওয়ালের দিকে মুখ করে। ভদ্রমহিলার প্রতিবাদ কানে এল, 'একি! দরজা বন্ধ করলেন না?'

উত্তর দিলাম না।

'অসভ্য লোক তো।' দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ, চাকার আওয়াজে এবং দুলুনিতে ঘুম এসে যাচ্ছে। হঠাৎ প্রশ্ন কানে এল, 'কত দিলেন? আমি অবশ্য পাঁচশোর বেশি দিইনা। ওদের তো বাঁধা রেট আছে। সেকেণ্ডক্লাসে একশো, ফার্স্টক্লাসে তিনশো আর এখানে পাঁচশো। প্রচুর টাকা বেঁচে যায় এবং টিকিট কাটার ঝামেলা থাকে না।'

সর্বনাশ! ঘুম চটকে গেল। তার মানে সকাল হলেই লোকটা আমার কাছে টাকা চাইবে। পাঁচশো প্লাস মদের দাম প্লাস চায়ের বিল। আমার সেকেণ্ডক্লাসের টিকিটটা কোনো কাজে লাগবে না।

'আপনার নাক ডাকে?'

কুঁকড়ে গেলাম। সেটা যে একটু-আধটু হাঁকাহাঁকি করে না, তাই বা বলি কি করে? ঘুমিয়ে পড়লে আমি অবশ্য টের পাইনা।

উত্তর দিলাম না।

'তাজ্জব মানুষ। ড্রিঙ্ক করেন কেন যদি স্ট্যাণ্ড না করতে পারেন।'

সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন ট্রেনটা মাঝরাত্রের নির্জন কোনো মাঠে দাঁড়িয়ে আছে সিগন্যালের অপেক্ষায়। উঠে বসলাম।

আহা, একি দৃশ্য। ভদ্রমহিলা ঘুমিয়ে আছেন রাজেন্দ্রাণীর মতো। ওঁর নীল রাতপোশাক কি সুন্দর। পা সরে যাওয়ায় পোশাকেয় কিছুটা উঠে গেছে। ফলে নিটোল চামড়া দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মদের গন্ধ পেলাম, মদ খেলে কেউ মদের গন্ধ পায় না। অথচ এই কুপেতে সেরকম একটা গন্ধ ভাসছে। তাকিয়ে কোনো কিছু দেখতে পেলাম না। ভদ্রমহিলার মাথার পাশে ছোট্ট টেবিলে একটা কাঁচের গ্লাস রয়েছে। সেটা তুলে শুঁকতেই অ্যালকোহলের গন্ধ নাকে এল। অর্থাৎ আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর তিনি পান করেছেন। সঙ্গে ছিল অবশ্যই।

এখন উনি সুন্দরভাবে ঘুমাচ্ছেন। মহিলা একদা সুন্দরী ছিলেন, এখন ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী। ওঁর স্বামী নিশ্চয়ই আদর টাদর করেন। অবশ্য ইনি বিবাহিতা কিনা বুঝতে পারছি না। তবে এখনও যৌবন আছে। এমন মহিলা নির্জন ট্রেনের কুপেতে অচেনা পুরুষকে পাশে রেখে এভাবে ঘুমাতে পারে কি করে, তা নিয়ে তর্ক উঠলেও যা সত্য তা চিরকালই সত্য।

ঘুমানোর ফলে আমার নেশা চলে গিয়েছিল। আমি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঘুমন্ত সুন্দরীকে দেখতে লাগলাম। আমি যদি ওঁকে জড়িয়ে ধরি উনি চিৎকার করবেন। লোকজন ছুটে আসবে। পরের স্টেশনে পুলিশে দেওয়া হবে এবং কালকের কাগজে আমার নাম ছাপা হবে। একটা বাইশ বছরের মেয়ে লজ্জায় যা মেনে নেবে, তা একজন চল্লিশের মহিলা মেনে নেবেন না। তাছাড়া আমি জড়াতে যাবই বা কেন? আমার তো এতক্ষণ টয়লেটের নোংরা গন্ধ নাকে নিয়ে বসে থাকার কথা ছিল। কে জানত মদ খেয়ে ভালো বিছানায় শুয়ে ঘুমন্ত সুন্দরী দেখতে পাব।

হঠাৎ ভদ্রমহিলা চিৎ হয়ে শুলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর নাক ডাকতে লাগল। আস্তে আস্তে আওয়াজটা বাড়তে লাগল। কী বীভৎস শব্দাবলী। মনে হচ্ছিল ওঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে হার্টফেল করতে পারেন। এখন ওঁর সমস্ত সৌন্দর্য উধাও হয়ে গিয়েছে। এমন কি বুকের রহস্যটাও ফ্যাকাসে।

শেষপর্যন্ত আমি ডাকতে বাধ্য হলাম। ডাকামাত্র হুড়মড়িয়ে উঠে বসে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

'আপনার কষ্ট হচ্ছে?'

'কেন?'

'নাক ডাকছিল অমন করে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি জেগে জেগে কি করছিলেন?'

'নাক ডাকার শব্দে জেগে গিয়েছিলাম।'

'মিথ্যে কথা। আমি গান গেয়েছি কিন্তু আপনি জাগেননি আর নাক ডাকার আওয়াজে জাগবেন? এই ট্রেনের আওয়াজ ছাপিয়ে শব্দ পেলেন?'

'পেয়েছি। বীভৎস আওয়াজ। আপনার যে-কোনদিন হার্ট অ্যাটাক হবে।'

'হোক। আপনার কি!' ভদ্রমহিলা চোখ ঘোরালেন, 'আপনার খারাপ লাগবে?'

'তা লাগতে পারে।'

'লাগতে পারে। লাগবে বললেন না।'

'লাগবে।' বললাম। 'পাশ ফিরে শোন, ঠিক থাকবে সব।'

'কি করে জানলেন?'

'পাশ ফিরে শুলে আপনার নাক ডাকে না।'

'তার মানে আপনি অনেকক্ষণ থেকে দেখছেন। নাক ডাকার শব্দে আপনার ঘুম ভাঙেনি। আপনি আমাকে দেখছিলেন।' চিৎকার করলেন তিনি।

আমি হাতজোড় করলাম। 'প্লিজ, চেঁচাবেন না।'

'আলবৎ চেঁচাব।'

'চেঁচানি শুনে লোক এলে তারা আপনার মুখে মদের গন্ধ পাবে।'

'ও' তার মানে আপনি একটুও ঘুমোননি! ঘাপটি মেরে সব দেখেছেন?'

'যা ইচ্ছে ভাবুন!'

আমি আবার শুয়ে পড়লাম।

ইসলামপুর আসছে। আলো ফুটে গেছে অনেকক্ষণ। টয়লেট থেকে ফিরে এসে ভদ্রমহিলা বললেন, 'নিজের নামটা মিথ্যে বলার কি দরকার ছিল?'

'তার মানে?'

'চেকারের কাছে সব শুনলাম। আট বছর আগে স্ত্রী গত হয়েছেন?'

'কে বলল?'

'কে আবার। চেকার। তারপর থেকেই মদ গিলছেন! আমিও!'

'মানে?'

'ও চলে গেছে বছর চারেক। ও খেত, আমি খেতাম না। এক-আধ দিন শখ করে একটু-আধটু মাঝে-সাঝে। এখন খাই। রাত্রে নিজের ঘরে বসে।'

'ও।'

'কবে ফেরা হবে?'

'পরশু।'

'আর একদিন বাড়ানো যায় না?'

'কেন?'

'একসঙ্গে ফিরতাম। কেউ আপনার মতো আমাকে পাশ ফিরে শুতে বলেনি জানেন? কাল এত ভালো লাগছিল।'

'দেখি।'

'না। কথা দিতে হবে। স্টেশনে আমার দেওর নিতে আসবে, ওদের সামনে এসব বলব না। তরশু দার্জিলিং মেলের এসি ফার্স্টক্লাসে দেখা হবে। আমি চেকারকে বলে রাখব আপনার বার্থের জন্যে। ও. কে.?'

মাথা নাড়লাম।

এন জি পি এসে গেল। সঙ্গে কুলির ঝাঁক। উনি আমার গায়ের কাছে চলে এলেন, 'আপনার একা লাগে না?'

'তা লাগে।'

'আমি শিলিগুড়িতে দেওরের কাছে আসি আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে। ভুল বুঝবেন না।'

উনি কুলিকে নিয়ে ব্যস্ত হলেন। আমি ব্যাগ নিয়ে বের হলাম। চেকার ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, 'কোনো অসুবিধে হয়নি তো স্যার?'

'না না।' আমি দাঁড়ালাম, 'কত দিতে হবে।'

'একটা কথা বলব স্যার?'

'বলুন।'

'আমার ওয়াইফ লাইফ হেল করে দিচ্ছে।'

'কেন?'

'আর বলবেন না। আমার শালাটা বেকার। কাঁধে বসে আছে। চাকরি পাচ্ছে না। আপনি যদি ওকে শিলিগুড়ির ফ্যাক্টরীতে ঢুকিয়ে দেন।'

'কদ্দূর পড়েছে?'

'বি কম। অ্যাকাউন্টস জানে। আমি কাল পাঠাই? ওর নাম বলরাম ঘোষ। ও গিয়ে আমার কথা বললেই বুঝতে পারবেন।'

'ঠিক আছে।' মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

চেকার হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন আমার সঙ্গে।

'আপনাকে কত দিতে হবে?'

'ছি ছি ছি। একি বলছেন? আপনার সেবা করে আমি ধন্য। 'অ্যাই শ্যামল!' চিৎকার করে পাশের কাগজের স্টলওয়ালাকে ডাকলেন তিনি, 'সাহেবকে চিনে রাখ, যখনই আসবেন এসি ফার্স্টে তুলে দিবি।'

'ও কে, বস!' শ্যামল জানাল!

'আপনি কোনো চিন্তা না করে চলে আসবেন। আমি না থাকি, শ্যামলকে বলবেন। অন্য কেউ থাকলে পাঁচশোর বেশি দেবেন না।'

'ঠিক আছে।' আমি পা বাড়াচ্ছিলাম।

'আর একটা কথা স্যার।'

'বলুন।'

'ভদ্রমহিলা আপনাকে খুব জ্বালাননি তো?'

'আপনি ওঁকে চেনেন?'

'এই ট্রেনে যাতায়াত করতে করতে আলাপ। আপনার সম্পর্কে খুব কৌতূহল। একটু রাগী কিন্তু পয়সাওয়ালা ঘরের বউ। বউ মানে এখন বিধবা। আমি ইচ্ছে করেই আপনার কুপেতে ওঁকে দিলাম। সেবার বলেছিলেন স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আপনার কিছু ভালো লাগে না, মনে ছিল, স্যার।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

ওভারব্রিজে হাঁটতে হাঁটতে নীচে তাকালাম। ভদ্রমহিলা লটবহর নিয়ে আসছেন। তাঁর মাথায় আঁচল ঘোমটার মতো তোলা। পাশে একটি প্রৌঢ় গম্ভীর মুখে হাঁটছেন। পারিবারিক ছবি।

অন্যের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে মনে হল, তরশু আবার দেখা হবে। কিন্তু তরশু কি আমি আসব? আমার কি আসা উচিত? অবশ্য এ নিয়ে ভাবার সময় হাতে অনেক আছে।

ই চ্ছে বা ড়ি

পঞ্চাশে পা দেওয়ার আগে অন্তত পঁচিশবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছে অরবিন্দ কিন্তু কখনও দু'রাতের বেশি থাকেনি। বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি ছড়িয়ে আছে পূর্বপল্লী এবং রতনপল্লীতে। ষাট-সত্তর বছরের বাড়ি সব। বিরাট বাগান, অনেক ঘর। সঞ্চয়িতা এবং গীতবিতান ছেঁকে নামকরণ করা হয়েছিল তাদের। সেই সব বাড়ির মালিকদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে বিখ্যাত হয়েছেন এমন কয়েকজন বন্ধুর পিতাকে সে যৌবনে দেখেছে। অরবিন্দ লক্ষ্য করত ওসব বাড়িতে একটা গম্ভীর-গম্ভীর ভাব ছিল, এমন-কি সন্ধের পর মদ খাওয়ার সময়ও কেউ চপল রসিকতা করত না। এঁরা যে ব্রাহ্ম তা নয়, কিন্তু কেউ বাড়িতে সন্ধ্যা মুখার্জির গান গাইত না। কলকাতার এত কাছে জায়গায়টা চুপচাপ পড়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি নিয়ে। বর্ষায় বৃষ্টি দেখতে অথবা দোল কিংবা পৌষ উৎসবে মানুষ ছুটে যেত ক'দিনের জন্যে। হঠাৎ আশির দশকের মাঝামাঝি কলকাতার বাবুদের মনে হল শান্তিনিকেতনে বাড়ি বানালে চমৎকার হয়। যে জমির দাম ছিল এক হাজার, তা হয়ে গেল ছাব্বিশ। খাল পেরিয়ে যে ধু ধু প্রান্তর সামনে পড়ে থাকত, তাতে গজিয়ে উঠল সুন্দর সুন্দর বাড়ি। এমন কি প্রান্তিকের মাঠের জমিও বারো হাজার কাঠায় উঠে এল, যেখানে সন্ধের পর প্রদীপ জ্বলত না বারো বছর আগে। বন্ধুরা বলল, 'অরবিন্দ, চটপট একটা জায়গা কিনে ফেল, বাড়ি না বানাও এর চেয়ে ভাল ইনভেস্টমেন্ট আর হয় না।'

অরবিন্দকে সবাই সফল মানুষ বলে। কলকাতা শহরে তার একটি চালু ব্যবসা আছে। বছর পনেরো আগে মাত্র দেড় লাখ টাকায় যে ফ্ল্যাট কিনেছিল তার দাম এখন ষোল লাখ। কলকাতার কয়েকটা বড় ক্লাবের মেম্বার সে। নিজে কিছু করে না বটে, কিন্তু সাংস্কৃতিক জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে আড্ডা মারতে কোনও অসুবিধে হয় না। ওর একমাত্র ছেলে সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে পাস করে যাদবপুর থেকে বি ই ডিগ্রি নিয়ে এখন আমেরিকায় পড়ছে। অরবিন্দর স্ত্রী ইতি বড় ভাল মানুষ। খুব হাসেন। দেখলেই বোঝা যায় স্বামী সম্পর্কে কোনও বড় অভিযোগ নেই। ইতি নিজের চেহারাটাকে বুড়িয়ে যেতে দেননি, অত বড় ছেলের মা বলে মনে হয় না। তুলনায় অরবিন্দর মনে একটু দুঃখ থাকা স্বাভাবিক। ইদানীং ঝুপঝুপ করে টাক পড়ছে তার। তা টাক তো সব মানুষকেই মেনে নিতে হয়েছে। ইতি প্রায়ই অনুপম খেরের কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেয়। এমন একজন পঞ্চাশে পা দেওয়া মানুষকে সফল না

বলে উপায় কি। ওকে ধার করতে হয় না, গাড়ি আছে, ব্যবসাটা দুদিন না দেখলে অচল হয় না।

মাস তিনেক আগে ওরা চার বন্ধু শনিবারের শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে চেপেছিল। বিকেল রাত সকাল কাটিয়ে দুপুরে ফিরে আসবে। রতনপল্লীর ববি গুহর বাড়িতে ওরা উঠেছিল। ববিও ওদের সঙ্গে এসেছে। আসা মাত্র দারোয়ান চাকররা চরকির মতো ছুটছে। সন্ধে হল। চাঁদ উঠল। ববি গুহর বাগানঘেরা বারান্দায় চেয়ার পেতে বসা হয়েছে। কলকাতা থেকে আনা হুইস্কির সঙ্গে মাছভাজা চলছে। ঢাউস চাঁদের দিকে তাকিয়ে অরবিন্দের হঠাৎ মনে হল পঞ্চাশ বছর পরে সে আর ওই চাঁদটাকে দেখতে পাবে না। পঞ্চাশ বছর পরে তার বয়স একশো হবে। দূর, অতদিন কি, চল্লিশ বা তিরিশ বছর পরেও যে দেখতে পাবে, তার নিশ্চয়তা কী! সে চুপচাপ বন্ধুদের দিকে তাকাল। ওরা কথা বলছে। পঞ্চাশের গায়ে বয়স সবার। তিরিশ বছর পর এদের অনেকেই থাকবে না। চল্লিশের পর তো নয়ই। কিন্তু হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে দুশো বছর বাদেও এখানে বসে মাল খাবে। রবীন্দ্রনাথ একাশি বছর বয়সে মারা গিয়েছেন এবং তারপর বাঁচা বাঙালির আশা করাই উচিত নয়। অর্থাৎ তিরিশ বছরটাই তা হলে ম্যাক্সিমাম আয়ু। অরবিন্দর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ঠিক তখনই গেট খুলে সে লোকটাকে ঢুকতে দেখল। জ্যোৎস্না মাখতে মাখতে একটা সাদা জামা এবং ধুতি এগিয়ে আসছে। ববি গ্লাসে চুমুক দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'হু ইজ হি?'

ততক্ষণে লোকটা সামনে এসে গিয়েছে। বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, 'আমি বোধহয় এ সময় এসে আপনাদের বিরক্ত করলাম।'

ববি গুহ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার পরিচয়?'

'আজ্ঞে, আমি মদ বিক্রি করি।'

'মাই গড! তা এখানে কি দরকার?'

'আজ্ঞে, আপনারা আমার ওপর অবিচার করছেন। আপনারা প্রায়ই আসেন, কদিন থাকেন, কিন্তু কলকাতা থেকে মদ কিনে এনে খান। আমি স্থানীয় মানুষ, যদি আমাকে সুযোগ দেন, তা হলে কলকাতা থেকে বয়ে আনার কাজটা করতে হয় না।'

'বোলপুরে আপনার মদের দোকান আছে?'

'আজ্ঞে না। তবে যে-কোন মদ আমি এনে দিতে পারি। স্কচ খেতে চাইলে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিস দিতে হবে। আমি একেবারে কলকাতার দামেই দেব।'

'কোত্থেকে দেবেন?'

লোকটি বিনীত গলায় বলল, 'ব্যবসার গোপনীয়তা জানতে চাইবেন না স্যার।'

'আমরা যে মদ খাই, তা আপনি জানলেন কি করে?'

'চেহারা দেখে।'

সৌমেন চুপচাপ শুনছিল। চাপা গলায় বলল, 'আমার বউ সেদিন বলছিল রোজ মদ খেয়ো না। এর পর লোকে চেহারা দেখে বুঝতে পারবে।'

ববি গুহ ধমকালো, 'রসিকতা করছেন? চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছেন?'

'আজ্ঞে, আপনারা চারজন শিক্ষিত সম্পন্ন মানুষ ছেলেমেয়েদের না নিয়ে এখানে এসেছেন। আপনারা শান্তিনিকেতনের দ্রষ্টব্য জিনিস দেখতে যান না, প্রান্তিকের মাঠে হাঁটতেও দেখি না। অবশ্য এখন আর মাঠ কোথায়? মেয়েমানুষের দোষও আপনাদের নেই। চারজন ব্যাটাছেলে সন্ধেবেলায় একসঙ্গে থাকলে যদি একটু মদ খায় তাতে তো কোনও ক্ষতি নেই। এই দেখুন, আজ শনিবার, রতনপল্লীর পাঁচটা বাড়ি আর পূর্বর ছটা, মোট এগারোটা বাড়িতে পঞ্চাশ জন মানুষ অন্তত ষোল-সতেরোটা বোতল আজ শেষ করবে। পরিমাণটা আপনি ভাবুন।'

লোকটি কথা বলছিল খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে। ববি গুহ বন্ধুদের দিকে তাকাল। এবার অরবিন্দ কথা বলল, 'আমরা তো কালই চলে যাচ্ছি। এ যাত্রায়—।'

'আবার তো আসবেন। তা হলে কথা হয়ে গেল—।' লোকটা হাসল, 'আমি প্রতিদিন শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস অ্যাটেণ্ড করি। গেট দিয়ে বের হওয়ার সময় ডান দিকে তাকালেই আমাকে দেখতে পাবেন। তখন অর্ডারটা দিয়ে দিলেই ঠিক পৌঁছে যাবে।'

অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম?'

'মধুসূদন দত্ত।' লোকটি নমস্কার করে গেটের দিকে চলে গেল।

ববি বলল, 'অদ্ভুত! মধুসূদন দত্ত শান্তিনিকেতনে মদ বিক্রি করে বেড়াচ্ছে?'

অরবিন্দ বলল, 'লোকটা খুব সরাসরি কথা বলে। একসময় এরকম সেলসম্যানের কথা শান্তিনিকেতনে কেউ চিন্তাও করতে পারত না।'

সৌমেন বলল, 'রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে ওকে দূর করে দিতেন।'

ববি গুহ বলল, 'রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে এইভাবে বারান্দায় বসে আমরা মাল খেতাম কি না সন্দেহ আছে।'

দেবব্রত চুপচাপ মানুষ। তবু বলল, 'আচ্ছা, সে সময় অত বিখ্যাত মানুষ এখানে আসতেন, থাকতেন, তাঁরা পান করতেন না, এটা বিশ্বাস করতে পারি না।'

আলোচনা অন্য দিকে ঘুরে গেলে অরবিন্দর মনে হল ওই মধুসূদন দত্তর সঙ্গে আর একটু কথা বললে ভাল হত। লোকটা এতদিন কি করত, মদ বিক্রি করা ছাড়া আর কিছু করে কি না, পরিবার আছে কি না অথবা কখনও কবিতা লিখত কি না, এ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারত।

পরদিন ফেরার সময় দেখা গেল হাওড়া থেকে ট্রেন এসে পৌঁছায়নি। রবিবার বলে প্ল্যাটফর্মে ভিড় খুব। অরবিন্দ গেটের কাছে পৌঁছে ডান দিকে তাকাতেই মধুসূদন দত্তকে দেখতে পেল। হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে একাই এগিয়ে গেল, 'চিনতে পারছেন? কালে রাত্রে—।'

'বিলক্ষণ। কলকাতার এক পার্টি আসছে। প্রান্তিকে উঠবে। ওদের জন্যে ভদকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আগের বার অর্ডার করে গিয়েছিল। এখন ট্রেন বেশি লেট করলে দুপুর পেরিয়ে যাবে, সন্ধে নামলে কেউ ভদকা খায় না, চিন্তা হচ্ছে।' কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো মুখ করে বলল মধুসূদন দত্ত।

'আপনি এখানে অনেক বছর আছেন?'

'তা আছি। আপনি এখানে স্থিতু হবেন না?'

'বন্ধুবান্ধবের বাড়ি আছে, দিব্যি আসছি, যাচ্ছি—।'

'দূর! প্রত্যেক মানুষের তো একটাই জীবন। সেই জীবনে কিছু-না-কিছু রেখে যেতে হয় পরের প্রজন্মের জন্যে। যাঁরা প্রতিভাবান তাঁরা সৃষ্টি রেখে যান, যাঁরা সাধারণ এবং সক্ষম তাঁরা অন্তত একটা বাড়ি রেখে যেতে পারেন।'

'কে করবে? আমার পক্ষে তো আর দাঁড়িয়ে থেকে করানো সম্ভব নয়।'

'কোনও দরকার নেই। আমি আছি। ইচ্ছে হলে খবর দেবেন।'

ওই যে কথাটা, কিছু রেখে যাওয়া তা ঢুকে গেল বুকে। লোকে বলবে, এই বাড়িতে অরবিন্দবাবু থাকতেন। বন্ধুরা বলল, লাখ চারেক খরচ করলে মোটামুটি মাথা গোঁজার জায়গা হয়ে যাবে। শুনে ইতি বলল, 'মাঝেমধ্যে বেড়াতে যেতে পারি কিন্তু পাকাপাকি থাকতে পারব না।'

'এখন কে থাকতে বলছে? বুড়ো বয়সে—।' অরবিন্দ বলতে গেল।

'সেই বয়স এলে দেখা যাবে।'

অরবিন্দ চলে যাওয়া ইতিকে দেখল। সাতচল্লিশ প্লাস। আর ম্যাক্সিমাম এগারো বছর। মানে এগারোটা পূজো, এগারোটা পূজাসংখ্যা। অথচ এমন ভাব, বুড়ো হতে প্রচুর দেরি। একটা মানুষ জন্মাল, বড় হল, ছেলেমেয়ে আনল, বুড়ো হল এবং মরে গেল, তা নিয়ে একবারও ভাবল না।

আর এই ভাবনাটাই অরবিন্দকে কদিন বাদে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গেল। গেটের ডান দিকেই পাওয়া গেল মধুসূদন দত্তকে। মধুসূদন হাসল, 'এবার একা? কি দেব?'

'আমি ট্যুরিস্ট লজে উঠছি। বিকেলে দেখা করবেন। আমার নাম অরবিন্দ মিত্র।'

বিকেলে মধুসূদন দত্ত এল। সঙ্গে সেই ব্যাগ। তাকে বলল, 'আমি এখানে একটা ছোটখাটো বাড়ি করতে চাই। আপনি বলেছিলেন—।'

'জমি কিনে বাড়ি বানাবেন, না পুরনো বাড়ি কিনে ঠিকঠাক করে নেবেন?'

'পুরনো বাড়ি কেনা ঠিক হবে? নিজের মনের মতো তো হবে না।'

'তা ঠিক। পূর্বপল্লীর শেষ প্রান্তে জমির দাম এখন চব্বিশ। প্রান্তিকে যেতে যেখানে সুনীলবাবু অর্ঘ্যবাবুদের বাড়ি সেখানে পনেরো ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রান্তিকের কাছে বারোতে পাবেন। তবে আমি সাজেস্ট করব পূর্বপল্লীতেই বাড়ি বানান। একটু কমে পেয়ে যেতে পারি।'

খানিকটা আলোচনার পর ঠিক হল কাল সকালে মধুসূদন দত্ত অরবিন্দকে জমি দেখাতে নিয়ে যাবে। কথা শেষ হয়ে গেলে সে ব্যাগে হাত দিল, 'কি দেব?'

মনে পড়ল। মাথা নাড়ল সে, 'না না। আমি একা-একা মদ খাই না।'

'ও!' লোকটাকে খুব হতাশ দেখাল। ধীরে ধীরে চলে গেল।

পূর্ব্বপল্লীর জমি দেখা থেকে শুরু করে তার অধিকার আইনসম্মত করে নেওয়ার যে ঝামেলা, মধুসূদন দত্তই সামাল দিল। হ্যাঁ, অরবিন্দকে কয়েকবার আসতে হয়েছে। সঙ্গে কোনও বন্ধু থাকলে লোকটাকে নিরাশ করেনি। কলকাতার দামেই মদ বিক্রি করে এটা প্রমাণিত। কথাটা পরিচিত মহলে ছড়িয়ে পড়ায় লোকটার চাহিদা বেড়ে গেছে। দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দারা বোলপুর স্টেশনের গেট পার হওয়ার সময় ডান দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'মধুবাবু, অমুক বাড়িতে উঠছি। আসছেন তো?'

মধুসূদন দত্ত হাত জোড় করে জবাব দেন, 'সেবার সুযোগ দিচ্ছেন, আমি ধন্য।'

এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু বাড়ির নকশা করে দেওয়ার আগে প্রশ্ন করেছিল, 'কিরকম খরচ করতে চাও। ছেলে তো আর শান্তিনিকেতনে গিয়ে বাস করবে না।'

মাথা নেড়েছিল। আসলে ভেতরে ঢুকে পড়ার পর অরবিন্দর যেন একটা ঘোর লেগে গিয়েছিল। বলেছিল, 'বাড়ি ইজ বাড়ি। কে থাকছে, কদিন থাকছে, তা ভাবার দরকার নেই।'

অতএব যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ হল। ইতি মাঝে একবার দেখতে গিয়েছে। সেটা ভিতপূজোর সময়। দেখে বলেছিল, 'এখানে বাড়ি হলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার। কেউ দেখতে আসবে না।'

ভিত তৈরি হয়ে গেলে মধুসূদন দত্ত বলল, 'প্রথমে দুটো কাজ করতে হবে। এক, পাঁচিল দেওয়া—দুই, গাছ লাগানো।'

'গাছ লাগানো মানে?' অরবিন্দ বুঝতে পারল না।

'বাড়িটাকে ঘিরে এখন গাছ লাগিয়ে দিলে গৃহপ্রবেশের সময় দেখবেন ওগুলো বেশ ডাগর হয়ে গিয়েছে। এখানকার মাটিতে তরতরিয়ে বাড়ে। তবে কি গাছ লাগাবেন, সেটা ভাবুন। ফুলের গাছ, যেমন, টগর লাগাতে পারেন। আবার শিরীষ, দেবদারু, কদম জাতীয় গাছও লাগানো যায়। শেষের গাছগুলো বহু বহু বছর বেঁচে থাকবে।। আর যদি সরকারি গাছ কিনে এনে লাগান তা হলে কয়েক বছর বাদে প্রচুর টাকা পাবেন বিক্রি করে। ব্যবসাও হয়ে যাবে।' মধুসূদন দত্ত মতলব দিল।

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছে কিন্তু জমি থেকে গাছ কাটার কথা ভাবতে তার খুব খারাপ লাগল। মধুসূদনবাবুকে বলল, 'ইউক্যালিপটাস, শিরীষ, দেবদারু গাছ লাগান চারপাশে। দুটো কদমগাছ থাকবে দুপাশে। কাটাকাটির মধ্যে আমি নেই।'

বাড়ি তৈরি হতে লাগল। গাছ পোঁতাও শেষ। প্রতি শনিবার অরবিন্দ চলে আসে শান্তিনিকেতনে। প্রতিটি ইঁট বসছে আর অরবিন্দর মনে হচ্ছে পাঁজরগুলো তার চেনা হয়ে

যাচ্ছে। সিমেন্ট পড়ার আগে বাড়িটার যে আসল খাঁচা, যা বহু বছর খাড়া হয়ে থাকবে তার সঙ্গে পরিচিত হতে যে কি আরাম, তা কাউকে বোঝানো যাবে না। ইঁটের ওপর সিমেন্ট মেশানো বালি ফেলে আর ইঁট চাপিয়ে যখন উচ্চতা বাড়ানো হচ্ছে তখন যেন সিমেন্ট মেশানো বালি কিরকম মায়া-মায়া হয়ে যাচ্ছে। অরবিন্দর মনে হল সে যখন থাকবে না তখন এই বাড়িটা থাকবে। এত টান সে কখনও অনুভব করেনি।

যেসব বন্ধুরা ইতিমধ্যেই ওখানে বাড়ি বানিয়েছে তারা অরবিন্দকে বোঝাল। 'লোকটার হাতে সব ছেড়ে বসে থেকো না। নিজে সিমেন্ট ইঁটের দরাদরি কর। নইলে মেরে ফাঁক করে দেবে। কন্ট্রাক্টর টেন পার্সেন্ট নিয়ে থাকে, তোমার মধুবাবু কত নিচ্ছে কে জানে!'

অরবিন্দ অসহায় বোধ করল। মধুসূদন দত্তের কথা এবং কাজে কোন অসঙ্গতি পায়নি সে। লোকটা তাকে ঠকাচ্ছে কি না খোঁজ করতে গেলে ওকে অপমান করা হয়। তবে দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত লোকটার টিকি দেখা যায় না অরবিন্দ অনুমান করে, তখন মধুসূদন দত্ত মদের ব্যবসা করে বেড়ায়। এ নিয়ে কোনও আপত্তি করার মানে হয় না। কারণ তার বাড়ি তৈরির কাজে কোনও ব্যাঘাত হচ্ছে না। তবে একটা অস্বস্তি কাটাতে পারছে না, তাকে কি দিতে হবে। সেই জমি কেনা, প্ল্যান স্যাংশান করানো থেকে শুরু করে ইলেক্টিকের মিটার আনবার দরখাস্ত করা পর্যন্ত যে লোকটা একটুও গাফিলতি করেনি, তার দক্ষিণা কত এটা জানা দরকার। ট্যুরিস্ট লজের ঘরে বসে একবার প্রশ্নটা করেছিল সে। মধুসূধন দত্ত জিভ বের করে শব্দ করল, 'থাক না ওসব। আমিও মরে যাচ্ছি না, আপনিও থাকছেন। অন্তত দু-এক বছর তো আছি। পরে হবে ওসব কথা। আগে মনের মতো বাড়িটা হোক, দেখে প্রাণ জুড়োক, তারপর কথা বলা যাবে।'

অরবিন্দ বলেছিল, 'কিন্তু আগে থেকে জানলে আমি বাজেট করতে পারব।'

'এই দেখুন, বেফাঁস কথাটা বলে ফেললেন। বাজেট। পৃথিবীতে কেউ কখনও তার বাজেট ঠিক রাখতে পেরেছে! অর্থমন্ত্রীরাই পারে না তো সাধারণ মানুষ! তাছাড়া শখের জিনিস, ভালোবাসার জিনিস অত বাজেট মাথায় রেখে হয় না। শাজাহান কখনওই তাজমহলের জন্য বাজেট করেন নি। ঠিক কি না বলুন!' মদুসূধন দত্ত হাসল।

অরবিন্দ শেষপর্যন্ত প্রশ্নটা করে ফেলল, 'আপনার বাড়ির ঠিকানা কিন্তু আমি জানি না।'

'আপনি স্যার জিজ্ঞাসা করেননি কখনও, তাই বলিনি। আসলে আমার কোনও ঠিকানা নেই। এর কাছে কদিন, ওর কাছে কিছুদিন, এভাবেই চলে যায়। এই যে আপনি বাড়ি বানাচ্ছেন, আপনি তো পাকাপাকি থাকবেন না, হয়তো শনি রবিবারে আসবেন প্রথম প্রথম, তা বাকি পাঁচদিন তালাবন্ধ থাকবে, থাকবে তো? তখন যদি বলেন আমাকে পাহারা দিতে, তা হলে একটা মাথা গোঁজার জায়গা জুটে যাবে, এই রকম।'

'আপনার পরিবার?'

'ছিল, কিন্তু রাখতে পারেনি। সন্তান হয়নি। তখন দুবরাজপুরে থাকতাম। চাকরি করতাম। সে ভাবল, আমি অপদার্থ তাই পছন্দসই পুরুষ পেয়ে ছেড়ে গেল আমাকে। লোকে বলেছিল থানায় যেতে, আমি যাইনি। অনিচ্ছুক ঘোড়াকে চাবুক মেরে কোনও কাজ হয় না।'

'আপনার নামটা নিয়ে কখনও ভেবেছেন?'

এক গাল হাসল লোকটা, 'কবিতা লিখতাম। বাল্যকালে। চতুর্দশপদী। একেবারে তাঁর নকল করে। বন্ধুবান্ধবরা বলত, ভাল হয়েছে। বড় হয়ে বুঝলাম, কিস্যু হয়নি। লেখার চেষ্টা আর করি না। সবার তো সব হয় না।'

'আর একটা কথা', অরবিন্দ বলল, 'রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আপনি ঘুরে ঘুরে মদ বিক্রি করেন, কখনও কোন বাধা আসেনি?'

'আজ্ঞে না! মানুষের প্রয়োজন আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। তিন পেগ মদ খাওয়ার পর টেপে "এ পরবাসে" অথবা "সখী আঁধারে" শুনতে যাদের ভাল লাগে তাদের বঞ্চিত করি না আমি। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে যেভাবে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করত, সেইভাবে চিরকাল কেন করবে? সময়ের সঙ্গে গ্রহণ করার ধরনটা বদলাবে না? তিন পেগ পেটে পড়ার পর "সহে না যাতনা" কেউ যদি সত্যিকারের দরদ দিয়ে গায় তা হলে তাকে কি আপনি রবীন্দ্রবিরোধী বলবেন? তা ছাড়া সে তো পাবলিক ফাংশানে গাইতে যাচ্ছে না, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নির্জনে বাস করছে।'

মধুসূদন দত্ত চলে গেলে অরবিন্দর মনে হল কথাগুলোর যুক্তি আছে। কলকাতায় তো বটেই, এখানে যে-সমস্ত মানুষ সাপ্তাহিক মাসিক অথবা বাৎসরিক ভ্রমণে নিজের বাড়িতে আসে তাদের বয়স এখন পঞ্চাশের সামান্য ওপরে। বৃদ্ধবৃদ্ধারা চলে গেছেন। সন্ধেবেলায় তারা মদ্যপান, কিঞ্চিৎ খিস্তিযোগে রসালাপ যেমন করেন, তেমন কোনও গাইয়ে সঙ্গে থাকলে রবীন্দ্রনাথের গানও শোনেন। এই মিশ্রিত মানুষেরা কেউ রবীন্দ্রবিরোধী নয়। তফাত এই, এঁরা কেউ তাঁকে গুরুদেব গুরুদেব করেন না।

শেষ পর্যন্ত বাড়ি তৈরি হল। গাছগুলো বড় হয়ে গেছে। এক বছরে সব কটা ঋতুর স্পর্শ পেয়ে অনেক অনেক বছরের জন্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে। অরবিন্দ কলকাতা থেকে চমৎকার আসবাব আনিয়ে নিল।। রান্নাঘরে গ্যাস চলে এল। পাখাগুলো ঘুরতে লাগল বনবন করে। তিনটে শোওয়ার ঘর, তিনটে টয়লেট, ডাইনিং কাম বসার ঘর আর বাগানঘেরা একটা বারান্দা। মধুসূধন দত্তর অনুরোধে একটা ছোট জেনারেটারের ব্যবস্থা করেছে সে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে তাকালে মনে হয় স্বপ্নের বাড়ি। কলকাতার ফ্ল্যাট এর কাছে কিছু নয়।

বন্ধুরা বলল, 'গৃহপ্রবেশ কর অরবিন্দ, দল বেঁধে কলকাতা থেকে যাব সবাই।'

ইতি বলল, 'তোমার বন্ধুদের নিয়ে দল বেঁধে গেলে থাকতে দেবে কোথায়? ওই তো কটা ঘর। সবাইকে বল বিশ্বভারতীরতে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধরে ফিরে আসতে।'

এ কথা বলা যায় না। থাকতে দিতেই হবে এমন তো কথা নেই। ববি গুহর বাড়ি আছে, সন্ধি গুহঠাকুরতার বাড়ি আছে, বন্ধুবান্ধবদের বাড়ির তো অভাব নেই। কিন্তু যে দিনটি গৃহপ্রবেশের জন্যে ঠিক করা হল সেদিন দেখা গেল প্রত্যেকের অসুবিধে। কেউ না কেউ কলকাতায় কাজেকর্মে জড়িয়ে থাকবে। ইতি বলল, 'বাড়িটা আমাদের, আমাদের সুবিধেমত গৃহপ্রবেশ করব, যার সুবিধে যাবে, আমরা দিন পালটাব কেন?'

অরবিন্দর সেটা মত ছিল না, তবু মানতে হল। বন্ধুরা জানাল, সপ্তাহের মাঝখানে না গিয়ে সামনের শনিবার হাজির হবে। লেটে গৃহপ্রবেশ সেলিব্রেট করবে সবাই। ইতি বলল 'বাঁচা গেল।'

দুই

বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ঝকঝকে সাদা নতুন ডিজাইনের একতলা বাড়ি। পূর্বপল্লীতে এর কোনও জুড়ি নেই। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। গাছগুলো এক বর্ষাতেই তরতরিয়ে উঠেছে। কি সবুজ ছেয়ে গেছে বাড়িটার চারধার। প্রাসাদ নয় কিন্তু ছোট্ট অথচ মজবুত বাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকবে অনেক অনেক বছর। একটু যত্ন করলে তিন চারশো বছর থেকে যেতে পারে। যখন অরবিন্দ থাকবে না, তার ছেলে অথবা বংশধর বলবে বাড়িটা যে বানিয়েছিল তার কথা। এটাকেই কি রেখে যাওয়া বলে?

'কেমন দেখছেন স্যার?'

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম মধুসূদন দত্ত দাঁড়িয়ে আছেন খানিক দূরে।

জবাব দিলাম, 'ভালই। শুধু সাদা রঙটা যেন বড্ড চোখে লাগছে।'

'ধুয়ে যাবে। বর্ষাটা যেতে দিন। শীত পড়লে আর এক প্রস্থ মোলায়েম রঙ মাখিয়ে দেব। হ্যাঁ, শনিবার অতিথিরা আসছেন, কি কি ব্যবস্থা করতে হবে বলে দিন।'

'চারজন এখানে থাকবে বাকিরা বন্ধুদের বাড়িতে। দুপুর আর রাত্রের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার স্ত্রী অবশ্য তখন থাকতে পারছেন না।'

'না থাকাই ভাল বললে খুশি হতাম।'

'বলতে পারছেন না কেন?'

'দেখুন, বাড়ি যদি নিজের হয় তা হলে তার কোণে কোণে মায়া জড়ানো থাকে। আর এই মায়া স্থায়ী হয় প্রিয় মানুষীর স্পর্শ পেলে। ঘরের সঙ্গে তাই ঘরনীর সম্পর্ক এত নিবিড়। তিনি থাকলে বাড়ি কখনই অশুচি হয় না। যাক গে, কত বোতল দেব? দুপুরে এসেই তো খেতে বসবেন না, ভদকা বা বিয়ারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আবার সন্ধ্যের পর হুইস্কি। পরিমাণটা যদি বলেন।'

হঠাৎ আমার খারাপ লাগা শুরু হল। এত জ্ঞানগর্ভ কথা বলার পরই লোকটা চট করে ওর মদ বিক্রির ব্যবসায় চলে এল। আমি দেখতে পেলাম আমার বাড়ির লম্বা বারান্দায় বসার

ঘরে বন্ধুরা মদ আর চাট নিয়ে বসে আছে। যদি মধুসূদনকে না বলতে পারতাম তা হলে এই মুহূর্তে আমার ভাল লাগত। কিন্তু ওসবের ব্যবস্থা না থাকলে আমার শিক্ষিত ভদ্র রুচিবান বন্ধুরা কি পরিমাণ বিরক্ত হবে, তা আমি জানি। হয়তো বিকেলেই ওরা আসর বসাবে ববি গুহর বাড়িতে। আমার গোঁড়ামি নিয়ে কটূক্তির বন্যা বইয়ে দেবে। মধুসূদনবাবুকে বললাম, 'আপনার তো স্টকের অভাব নেই, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবেন, আমি দাম দিয়ে দেব।' বলেই খেয়াল হল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, এই যে আপনি বাড়ি বাড়ি মদ বিক্রি করেন, এটা তো সম্পূর্ণ বেআইনি, না?

'আজ্ঞে, হ্যাঁ-ও বলা যায় আবার না-ও।'

'না কেন?'

'আমি দোকান থেকে এনে আপনাদের দিচ্ছি। এক্সাইজ ডিউটি তো দোকানদার দিচ্ছে, আমি বাহকমাত্র। হরিদ্বারে মাছমাংস খাওয়া যেমন বেআইনি, শান্তিনিকেতনে মদ বিক্রি করা তো তেমন অর্থে বেআইনি নয়। খোদ কবিগুরু তাঁর কবিতায় হুইস্কির কথা লিখে গিয়েছেন। আর এখন লোকে মদ খায় কিন্তু মাতলামি করে না। যে করে তাকে অসভ্য বলা হয়, পরের বার আর ডাকা হয় না। তার মানে মদ খাওয়াটাও আর বেআইনি নয়। যাক সে কথা, বাড়িটার একটা নাম দেবেন না?'

মাথা নাড়লাম। এই নিয়ে ইতির সঙ্গে কদিন কথা হয়েছে। বাড়ির একটা নামকরণ করা দরকার। শ্বেতপাথরের ফলকে সেটা লিখে গেটের মাঝখানে বসিয়ে দিতে চেয়েছে সে। আমি বলেছি গেটে নয়, ঢুকতেই যে দেওয়াল চোখে পড়ে তার মাঝখানে ওটা বসাবো। বাড়ি রইল ঠিকঠাক অথচ গেট ভেঙে গেল এমন তো হতেই পারে। ইতি রবীন্দ্রনাথ হাতড়েছিল। পূর্বপল্লী রতনপল্লীর বেশির ভাগ বাড়ির নামকরণের পেছনে তিনি রয়েছেন। শান্তিনিকেতনে বাড়ি হয়েছে আর রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে নামকরণ হবে এ কি সম্ভব? ইতি গোটা দশেক নাম ঠিক করেছিল আমার পছন্দ হয়নি। রেগেমেগে সে বলেছিল, 'তা হলে তোমার বাবা-মায়ের নামে নামকরণ কর। মাতৃস্মৃতি পিতৃস্মৃতি গোছের।'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'ভাগ্যিস বলনি বাড়ির নাম দাও, ইতি।'

ও গম্ভীর মুখে সরে গিয়েছিল। আর এ নিয়ে কথা বলেনি। ভাবনাটা তখনই মাথায় এল। বাড়িটার নাম যদি দিই 'অরবিন্দ' তা হলে কেমন হয়? যুগ যুগ ধরে অরবিন্দ বেঁচে থাকল। তার পরেই খেয়াল হল আশি বছর বাদে লোকে দেখে ভাববে ঋষি অরবিন্দের নামে নামকরণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তো ভদ্রলোককে নমস্কার-টমস্কার জানিয়েছেন। তখন কেউ আমার কথা ভাববে না। একই নামে বিখ্যাত কেউ থাকলে এই হয় মুশকিল। এক্ষেত্রে নাম এবং পদবী দুই লিখতে হয়। কিন্তু সেটা কল্পনা করতেই অস্বস্তি হল। লোকে ভাববে, আমি আমার ঢাক নিজেই পেটাচ্ছি। নির্লজ্জ বলতে পারে। বাইরের কেউ মুখের ওপর কিছু না বললেও ইতি ভাবতে পারে সে কথা। কলকাতায় ফ্ল্যাটের দরজার পাশে লেটার বক্সে ওর নাম ওপরে

আমার নাম নীচে লেখা আছে। এখানে একা আমার নাম দেওয়ালে থাকলে দৃষ্টিকটু হবে। অথচ আমি নিজের টাকায় বাড়িটা বানিয়েছি, প্রতিটি স্তর নিজের চোখে দেখেছি, এই বাড়ির সঙ্গে বহু বছর নিজের নামটাকে জড়িয়ে রাখার দাবি আমারই আগে। শালা, চক্ষুলজ্জা করেই বাঙালি শেষ হয়ে গেল।

হঠাৎ খেয়াল হল। মধুসূদন দত্তকে বললাম, 'একটা কাজ করতে হবে।'

'বলুন।'

'ওই যে বাগানের মাঝখানে খোলা জায়গাটা রয়েছে ওখানে অন্তত তিরিশ ফুট গভীর একটা ভিত করতে হবে। ছয় বাই চার ফুট। মাটির তলায় গাথুনি থাকবে তিরিশ ফুট। মাটির ওপরে ফুট পাঁচেক। খুব মজবুত। কদিন লাগবে?'

'ঘর হবে?'

'না না। একদম সলিড। ভেতরে কোনও গর্ত থাকবে না।'

'এরকম একটা থাম্বা করবেন কেন?'

'দরকার আছে। আজই শুরু করে দিন কাজ।'

স্টেশনে যাওয়ার সময় ইতি দাঁড়িয়ে গেল, 'ওরা গর্ত খুঁড়ছে কেন?'

'পিলার হবে।'

'কেন?'

'এমনি। দেখতে ভাল লাগবে।'

'এত বাজে খরচ কর!' সে গেট পেরিয়ে রিকশায় উঠল। তাকে তুলে দিলাম শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে। ট্রেন ছাড়ার আগে বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি। পাশের বাড়ির মুকুদি, ডক্টর মুখার্জির স্ত্রী, মদ খাওয়া একদম পছন্দ করেন না। ওপাশে মিস্টার হাজরা আছেন, রবীন্দ্রনাথের স্নেহ পেয়েছেন, শুদ্ধ মানুষ। বাড়িতে এমন কাণ্ড বন্ধুদের নিয়ে করো না যাতে ওঁরা আঘাত পান। আমাকে এখানে আসতে তা হলে আর বলবে না। মনে রেখ।'

ট্রেন চলে যেতেই দেখলাম মধুসূদন দত্ত আজও দুজন খদ্দের পেয়ে গেছেন। তাদের ঠিকানা টুকে নিচ্ছেন। একটুও ভয়ডর নেই লোকটার। অবশ্য না থাকাই স্বাভাবিক। আই জি-ডি আই জি থেকে আবগারি বিভাগের বড় কর্তারা ট্রেন থেকে নেমে হাত তুলে ওকে বলে যান, 'দত্ত, আমি এসেছি।'

আজ দুপুরের ট্রেনে বন্ধুরা আসবে। মধুসূদন দত্ত ঠাকুরচাকর আনিয়ে রান্নার তদারকি করছিল। বাগানে দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলাম গর্ত খোঁড়ার পর নীচে ইঁট সিমেন্ট বালির গাথুনি চলছে। চারপাশে লোহার রডকে বেঁধে তাকে ঘিরে মোটা পিলার ওপরে উঠে আসবে। মধুসূদন দত্ত চেয়েছিল পুরোটা ইঁট না দিয়ে বালি সিমেন্ট মিশিয়ে ভরাট করতে। আমি রাজি হইনি। খরচ হোক কিন্তু মজবুত করা দরকার। মিস্ত্রিদের তাগাদা দিচ্ছিলাম। ওরা বলল বিকেলের মধ্যেই ভরাট করে ফেলতে পারবে।

দুটো মারুতি ভাড়া করে মধুসূদন দত্ত ওদের নিয়ে এল স্টেশন থেকে। আমি গেটে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাকে দেখে সবাই হই-হই করে উঠল। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই ওরা বাড়িটার প্রশংসা করতে লাগল, 'দারুণ, গ্র্যাণ্ড, সুপার্ব, বিউটিফুল, মিসেস কোথায়?'

কলকাতায় কাজ ছিল বলে চলে গেছে শুনে ববি গুহ বলল, 'বুদ্ধিমতী মহিলা। এতগুলো দামড়াকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ভেবেছেন। ওখানে কি হচ্ছে?'

সবাই গর্তটাকে দেখল। তখনও মিস্ত্রিরা নিচে। ওপর থেকে যোগানদার যোগান দিচ্ছে। পাশ থেকে মধুসূদন দত্ত বলল, 'বসার জায়গা হচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কারও আর আগ্রহ থাকল না। মোট সাতজন এসেছে। এদের একজন এই প্রথম শান্তিনিকেতনে। বাগানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কত খরচ হল অরবিন্দ? টোটাল কত হবে?'

'হিসেব করিনি।

'কম হবে না। কিন্তু ভাই যাই বল ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট। এত দূরে এসে তুমি নিশ্চয়ই পার্মানেন্টলি থাকবে না।' তপন যেন আমার জন্যে আফসোস করল।

সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি প্রতিবাদ করল, 'তোর শালা কোনকালে কিছু হবে না। সারা জীবন কিপ্টের মতো কাটিয়ে দিলি। আরে, টাকা জমিয়ে কি হবে যদি নিজে ভোগ করে না যেতে পারিস! এই বাড়ি গাছপালা আকাশ এসবের মর্ম তুই জীবনে বুঝলি না।'

বললাম, 'তোরা হাতমুখ ধুয়ে নে। খাবার রেডি আছে।

সঙ্গে সঙ্গে হই-হই করে উঠল সবাই, 'আরে এখন সবে একটা বাজে, এখনই লাঞ্চ! মধুবাবু, ভদকা বিয়ার বের করুন।'

যে যার মতো জামাকাপড় পালটে বসে গেল বারান্দায়। মধুসূদন দত্ত সযত্নে মাছভাজার সঙ্গে পানীয় পরিবেশন করছেন। তপন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি? গ্লাস কোথায়?'

মধুসূদন দত্ত মাথা নাড়লেন, 'আমার নামের এক মহাত্মা যা খেয়ে গেছেন তারপর আর কোন্ মুখে খাই। আপনাদের সেবা করতেই আমার আনন্দ।'

ববি গুহ গেয়ে উঠল, 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর।'

সৌমেন ধমক দিল, 'হেঁড়ে গলায় গাইবি না।'

ববি বলল, 'যা ইচ্ছে তাই করব। আজ আমরা বাঁধনহারা।'

তপন বলল, 'সেই রবীন্দ্রনাথ।'

ববি গুহ বলল, 'যাচ্চলে! বাংলাভাষা কি রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক সম্পত্তি?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই। ওই ভদ্রলোক না জন্মালে আমরা এখনও বঙ্কিমী ভাষায় কথা বলতাম।'

ববি গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'রবীন্দ্রনাথ বাঁকা ভাষায় লেখেননি?'

'বাঁকা ভাষায়?'

'ধর, দুটি কিশোরীর বিয়ে হল। খুব বন্ধু। ভোরবেলায় স্বামী একজনকে জিজ্ঞাসা করল কেমন আছ? তোমার চোখে জল কেন? সে জবাব দিল, "কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারই ঘায়ে নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।" ববি গুহ্ চুমুক দিল।

সবাই হই-হই করে উঠল। সন্ধি জিজ্ঞাসা করল, 'দ্বিতীয়জনের কেসটা কি?'

ববি বলল, 'দ্বিতীয়জনকে সকালবেলায় বান্ধবী জিজ্ঞাসা করল, "কিরে কেমন আছিস?" সে বলল, "কাল রজনীতে ঝড় বয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।" আর স্বামী চলে গেল তার কাজের জায়গায়। কয়েক মাস বাদে স্ত্রীর চিঠি গেল প্রবাসে স্বামীর কাছে, "এক রজনীর বরিষণে মোর সরোবর গেছে ভরিয়া।" আবার হাসির ফোয়ারা ছুটল। ববি এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো বাঁকা ভাষায় লেখা নয়?'

তপন বলল, 'তোদের মন বিষাক্ত তাই সর্বত্র বিষ খুঁজে বেড়াস।'

সন্ধি বলল, 'মানুষটাকে গুরুদেব বানিয়ে লোকে কি বিপদে ফেলেছিল ওঁকে। একটু যে প্রাণ খুলে তরল রসিকতা করবেন, তারও উপায় ছিল না। ফলে এইরকম আড়াল আবডাল বেছে নিতে হয়েছে, কি বলেন মধুসূদন দত্ত মশাই!'

মধুসূদন দত্ত চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনাদের কোনও দোষ নেই।'

'তার মানে?' ববি গুহ্ জিজ্ঞাসা করল।

'দেখুন, অচিন্ত্যকুমার অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্র যদি অশ্লীল শব্দ লেখেন আপনাদের আপত্তি নেই। বুদ্ধদেব বসু বা সমরেশ বসু লিখলে সাহিত্যের সম্মান দিতে কার্পণ্য করেন না। আমি অবশ্য তেমন বুঝি না, বিদেশী ক্লাসিক [illegible]হাভারতে তো ওসবের ছড়াছড়ি। এতে কোনও অন্যায় হয় না। যত দোষ রবীন্দ্রনাথের বেলায়? তাঁর প্রেমের কবিতা কামহীন হবে? নীরক্ত মানুষ নিয়ে কবিতা লিখবেন এমন ধারণা নিয়ে এখনও বসে আছেন আপনারা? তিনি অশোভন ভাষায় লিখতে পারেননি কিন্তু চমৎকার প্রতীক ব্যবহার করেছেন। সেটা উপভোগ না করে বক্র কথা বললে যে কি আনন্দ পাওয়া যায় তা বুঝি না।' কথা বলতে বলতে মানুষটার গলা চড়ছিল। শেষ হওয়া মাত্র যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন ভেবে মাথা নিচু করলেন।

আমার বন্ধুরা এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। সন্ধি বলল, 'আপনার দেখছি বেশ পড়াশুনা রয়েছে, তা হলে মদ বিক্রি করেন কেন?'

মধুসূদন দত্ত জিভ বের করলেন, 'ছি ছি! আমি নিতান্তই মূর্খ। অবসর সময়ে ভাল লাগে বলে ওঁর বই-এর পাতা ওলটাই। আর এক প্লেট মাছভাজা দেব?'

আমি বুঝতে পারছিলাম, তাল ভঙ্গ হয়ে গেছে। বন্ধুদের মেজাজ চলে গেছে। তাই বললাম, 'আপনি লাঞ্চের ব্যবস্থা করুন। বেলা তো বেশ হয়ে গেছে।'

মধুসূদন দত্ত চলে গেলে ববি গুহ বলল, 'লোকটা তো বহুৎ খচ্চর। দিল মেজাজের বারোটা বাজিয়ে। একে টাইট দিতে হবে।'

বললাম, 'গরিব মানুষ, ওকে টাইট দিয়ে কি হবে?'

'অনধিকার চর্চা করল। ওর এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে করল। মানছ?'

'মানছি। তবে ভুলে যাও এটা।'

খাওয়া শেষ হলে সবাই গা এলালো। খাটে না কুলোতে মেঝেতে চাদর পেতে শুয়ে পড়ল কেউ কেউ। আমি বাগানে গিয়ে দাঁড়ালাম। মিস্ত্রিরা এখন ওপরে উঠে এসেছে। দ্রুত কাজ করছে ওরা। এবার সোজা মাথা তুলে দাঁড়াবে পিলার। মধুসূদন দত্ত মাথা নিচু করে কাছে এল, 'আমাকে মাপ করবেন স্যার।'

'কেন?'

'ছোট মুখে বড় কথা বলা ঠিক হয়নি।'

'কখনও কখনও অপ্রিয় সত্য বলতে হয়। আপনি কোনও অন্যায় করেননি।'

'কিন্তু ওরা অতিথি। একটু প্রমোদ করতে এখানে এসেছেন। আসলে আমি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্যঙ্গ সহ্য করতে পারি না। যাক গে।' নিশ্বাস ফেলল মধুসূদন দত্ত, 'আচ্ছা, এটা ঠিক কি বানাতে চাইছেন বলুন তো। পাঁচ ফুট লম্বা হবে অথচ সিঁড়ি থাকবে না ওপরে ওঠার। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।'

'শেষ হোক, তারপর বলব। আপনি শুধু একটা কাজ করুন। বোলপুরের খোয়াই স্টোর্সে কাউকে পাঠান। ওরা একটা শ্বেতপাথরের ফলক দেবে, বিকেলের মধ্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। টাকাপয়সা দেওয়া আছে।'

'শ্বেতপাথরের ফলক! তার মানে স্মৃতিসৌধ?'

'এখন নয়। কুড়ি পঁচিশ বছর বাদে হলেও হতে পারে।' আমি হাসলাম, 'দাঁড়াও পথিকবর দেখে তো লোকে এখনও পার্কসার্কাসে দাঁড়িয়ে পড়ে।'

মধুসূদন দত্তের মুখ গম্ভীর হল, 'স্যার, আমি একবার গিয়েছিলাম ওখানে। মন টানছিল বলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে মনে হয়েছিল, না এলেই হত।'

'কেন?'

'মনে হল কবি যেন পথিকের অনুকম্পা ভিক্ষে করছেন। তোমরা যদি বঙ্গদেশে জন্মাও তাহলে দয়া করে একটু দাঁড়াও। বাঙালির মত স্মৃতিমোছা জাত আর কোথায় আছে, তা তো জানা নেই। ছেলেপিলে না থাকলে অথবা ব্যবসা না হলে এদেশে কোনও মহৎ স্রষ্টার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয় না। জন্মদিন পালন তো দূরের কথা। মধুসূদন দত্ত সেটা জানতেন না। তাই এখন ওই লেখার দিকে কেউ অবহেলায় তাকায় না। আচ্ছা চলি, আবার সন্ধেবেলার স্টক আনতে হবে।'

বিকেলে খোয়াই স্টোর্স থেকে প্যাকেট এল। বন্ধুরা তখন চা পান করছে। আমি মোড়ক খুললাম না। মিস্ত্রিদের কাজ শেষ হয়নি। ওরা কথা দিল কাল সকালের মধ্যেই কাজ শেষ করবে।

আজ খুব হাওয়া দিচ্ছে। গাছেরা বেশ দুলছে, যদিও আকাশে মেঘ নেই। স্নানটান সেরে সবাই গুছিয়ে বসেছে বারান্দায়। সন্ধি বলল, 'আজ চাঁদ উঠলে ভাল লাগত।'

তপন বলল, 'আমার একসময় ধারণা ছিল, শান্তিনিকেতনে এলে দারুণ দারুণ বমণীর দেখা পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে মহুয়া আর সারারাত নাচ।'

'ননসেন্স। পঞ্চাশে পৌঁছেও প্রিমিটিভ ভাবনা নিয়ে বসে আছিস। এখন আমাদেব হিম্মত বলে কিছু নেই। ইচ্ছে হলেও কেউ একা সোনাগাছিতে যেতে পারব না। এখন এইসব উল্টোপাল্টা কথা বলে লাভ কি! মহাকবি মধুসূদন কোথায়?' সন্ধি বলল।

ববি গুহ চেঁচালো, 'মধুবাবু! মাল নিয়ে আসুন। সন্ধে যে যায়!'

কোন সাড়া দিল না। আমি উঠলাম। হোস্ট হিসেবে এখনই মদ পরিবেশনের দায়িত্ব আমার। কিন্তু মধুসূদন দত্ত তো এখনও ফিরে আসেনি। তবে কি স্টক যোগাড় করতে পারেনি অথবা সেটা করতে বাইরে গেছে! আমরা আরও আধ ঘণ্টা অপেক্ষা কবলাম।

ববি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছে?'

'না।' মাথা নাড়লাম আমি।

'লোকটা থাকে কোথায়?'

'ঠিকানা জানি না। কখনও কামাই করেনি।'

'এ বাড়ি তৈরির জন্যে তোমার কাছে দক্ষিণা নেয়নি?'

'এখনও না।'

'মুশকিল হয়ে গেল। এরকম সম্পূর্ণ অজানা লোককে দায়িত্ব দেওয়া কি ঠিক?'

'ভদ্রলোক আমার কোন ক্ষতি করেনি আজ পর্যন্ত।'

'এখন মদ না পেলে—! কেউ আমার সঙ্গে চল, বোলপুর থেকে কিনে আনি।'

আমার বাড়িতে এসে ওরা পয়সা দিয়ে মদ কিনে খাবে সেটা হয় না। অতএব আমিই ববি গুহর সঙ্গে চললাম। গাড়ি চালাতে চালাতে ববি যখন মধুসূদনকে গালাগাল দিচ্ছিল তখন তাতে কান দিচ্ছিলাম না। মধুসূদনের ওপর দুপুর থেকেই খেপে আছে সে। কিন্তু লোকটার কি হল? কখনও কথার খেলাপ করেনি আজ পর্যন্ত।

আইনসম্মত মদের দোকানে পৌঁছে দেখলাম সন্ধের পরেও কাউন্টার ফাঁকা। ববি গুহ যে ব্রাণ্ড চাইল পাওয়া গেল না। রুচি নিচে নামাতে হল, দামও বেশি. কারণ জিজ্ঞাসা করাতে দোকানদার বলল, 'আনার খরচ আছে। তাছাড়া এখানে বিক্রিও কম হয়।'

'মধুসূদন দত্তকে চেনেন?' ববি গুহ আচমকা প্রশ্ন করল।

'কোন মধুসূদন?'

'বাড়ি বাড়ি ঘুরে মদ বিক্রি করে।'

'ও হ্যাঁ, শুনেছি। আমাদের বাজার নষ্ট করে দিচ্ছে।'

'ধরেননি কেন?'

'কে ঝামেলা করে বলুন।'

'কোথায় থাকে লোকটা জানেন?'

'না। তবে ও বোলপুরে বিক্রি করে না। শান্তিনিকেতনেই ঘুরে বেড়ায়।'

দোকান থেকে বেরিয়ে রাগত স্বরে ববি বলল, 'একদম জালি লোক। কার পাল্লায় পড়েছিলে ভেবে দ্যাখো। আবার রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমাকে জ্ঞান দেয়।'

সেদিন জমবে না জমবে না করেও শেষ পর্যন্ত জমে গেল। আমার নতুন বাড়ির বারান্দায় প্রায় গোটা তিন বোতল মদ শেষ হয়ে গেল। রাত দশটা নাগাদ প্রত্যেকেরই নেশা জমজমাট। সন্ধি গান গাইছিল। আমাদের যে কোন পার্টিতে ও মেজাজ হলে গায়। ওর ভরাট গলায় আমার সর্বস্ব যেন কেঁপে উঠছিল, 'আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।' হয়তো সুরা কাজ করছিল কিন্তু আমি এই বন্ধুদের একপাশে বসে কী একা হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার বুকের ভেতরে রক্ত ঝরে যাচ্ছিল অসাড়ে। যখন সন্ধি গাইল, 'অন্ধকারে অস্তরবির লিপি লেখা হলে আমারে তার অর্থ শেখা' তখন হঠাৎই কান্না পেয়ে গেল। যতবারই সে আমার হয়ে 'বুঝিয়ে দে' গাইছিল ততবারই মনে হচ্ছিল এক জীবনে বোঝা যাবে না। আমি কাঁদছিলাম কিন্তু আমার চোখে জল ছিল না। আমার সর্বশরীরের সঙ্গে মিশে থাকা একাকীত্ব কেঁদে মরছিল। সন্ধি গান থামাল। তারপর ববি গুহর দিকে মুখ ফিরিয়ে জড়ানো গলায় বলল, 'কিছু ঢুকল মাথায়?'

'ঠিক হ্যায়।' ববি চোখ বন্ধ করে জবাব দিল।

'ঠিক নেই। দুপুরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাজে বকছিলি না? আজকের এই অন্ধকারে একচল্লিশ সালে অস্ত-যাওয়া রবীন্দ্রনাথের লিপি লেখা আছে তার অর্থ শেখা তোর কোনকালে হয়ে উঠবে না।'

'অ্যাই তুই আমাকে ইনসাল্ট করছিস!' উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ববি গুহ।

'সত্যি কথা হজম করার চেষ্টা কর।'

'নো, নেভার। আমি এখানে অপমানিত হতে আসিনি। আমি চলে যাচ্ছি আমার বাড়িতে। এই, কেউ যাবে আমার সঙ্গে?'

আমি ববি গুহকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও সুস্থ ছিল না। তপন এবং সৌমেন ওর সঙ্গে চলল। ওরা যখন গেটের কাছে এবং আমি সঙ্গে থেকে বোঝাতে চেষ্টা করছি ঠিক তখন একটা গাড়ি এগিয়ে এল। তার হেডলাইটে চারপাশ উদ্ভাসিত। একজন পুলিশ অফিসার নেমে এলেন গাড়ি থেকে। ভদ্রলোক আমার নাম জিজ্ঞাসা করতে আমি মাথা নাড়লাম। উনি বললেন, 'আপনি মধুসূদন দত্তকে চেনেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি তাকে কিছু কিনতে পাঠিয়েছিলেন?'

'আমি ঠিক পাঠাইনি, উনি নিজেই আনতে চেয়েছিলেন। কেন? কি হয়েছে?'

'আমি একটা খারাপ খবর দিচ্ছি। উনি একটু আগে মারা গিয়েছেন।'

'মারা গিয়েছেন?' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'হ্যাঁ। ব্যাগ হাতে রাস্তা পার হতে গিয়ে বাসে ধাক্কা খান। ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষপর্যন্ত সেন্স ছিল। মারা যাওয়ার আগে আপনার নাম-ঠিকানা বলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়েও ব্যাগের হাতল ছাড়েননি। ওতে মদের বোতল ছিল কিন্তু ভদ্রলোক নেশা করেননি।' পুলিশ অফিসার একজন সেপাইকে বলতে সে মধুসূদন দত্তের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে দিল। ভদ্রলোক বললেন, 'এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করব না। কাল সকাল দশটা নাগাদ একবার আপনি যাবেন। ওঁর আত্মীয়স্বজনদের খবর দেওয়া দরকার।'

'যতদূর জানি কেউ ছিল না ওঁর।'

'তাই নাকি! তাহলে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। ওর ডায়েরির নাম মধুসূদন দত্ত কিন্তু সেটা যে সত্যি তা আপনাকে অনুগ্রহ করে বলতে হবে। আচ্ছা, নমস্কার।' অফিসার গাড়িতে উঠতেই হেডলাইটের আলো ঘুরে ফিরে গেল। ওই গভীর গহন অন্ধকারে এখন আমরা একা।

বারান্দায় যারা বসেছিল তারাও পুলিশের গাড়ি দেখে বেরিয়ে এসেছিল। আমি পাথরের মত দাঁড়িয়েছিলাম। মধুসূদন দত্ত নেই। বকরূপী ধর্ম প্রশ্ন করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির ঠিকঠাক উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই উত্তর মানুষ কখনও মনে রাখে না।

হঠাৎ ববি গুহ আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল শব্দ করে, 'শালা, নিজেকে খুব ছোট লাগছে রে এখন। লোকটাকে আমি মিছিমিছি সন্দেহ করেছিলাম।'

সন্ধি বলল, 'অবিশ্বাস্য! কী অবিশ্বাস্য!'

ববি গুহ ফিরে এল। আমরা আবার বারান্দায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। মধুসূদন দত্তের ব্যাগটাকে তুলে আনতে হয়েছে। অন্ধকারে ব্যাগের চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। সন্ধি বলল, 'লোকটা আমাদের জন্যে মদ কিনতে গিয়ে মরে গেল। অবিশ্বাস্য।'

অবিশ্বাস্য শব্দটা যেন ওর জিভে আটকে আছে।

তপন বলল, 'আমি আমার ঠাকুরদা, বাবার মৃত্যু দেখেছি। ওঁদের বয়স হয়েছিল।'

'দূর! বাবর আকবর সিরাজ রামকৃষ্ণদেব রবীন্দ্রনাথ একসময় বেঁচে ছিলেন, এখন নেই। তার মানে তাঁদেরও মরতে হয়েছে। সবাইকে মরতে হবে। তুই আমি কেউ শালা বাঁচব না। এই মধুসূদন দত্ত সেটা আবার মনে করিয়ে দিয়ে গেল। এই জন্যে আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। যা ইচ্ছে তাই করি। ওর ব্যাগ থেকে একটা বোতল বের কর।' ববি গুহ বলল।

সন্ধি বলল, 'অবিশ্বাস্য।'

'হোয়াই?' ববি খেপে গেল।

'লোকটা মদ পাঠিয়ে দিল অথচ দাম নিতে আসবে না। এখন সে শুয়ে আছে লাশকাটা ঘরে। আর তুই তার পাঠানো মদ খাবি?' সন্ধি বলল, 'অবিশ্বাস্য!'

'লোকটার আত্মা এতেই শান্তি পাবে।' ববি গুহ বোতল বের করল, 'বাঃ, এই তো আমাদের ব্র্যাণ্ড। ওর কাউকে তুমি চেন যাকে দামটা দিয়ে দিতে পারি?'

'না। কাউকে চিনি না।' অন্ধকারেই মাথা নাড়লাম আমি।

'তোমার কাছেও এই বাড়ি বানাবার জন্যে টাকা পেত তো?'

'পেত।'

'কি করবে?'

'জানি না।'

গত রাত্রে কেউ ডিনার খায়নি। নেশাগ্রস্ত মানুষগুলো দুঃখী-দুঃখী হয়ে শুয়ে পড়েছিল। আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। ক্রমশ খারাপ লাগা অথবা লোকটির জন্যে যে কষ্টবোধ তা অসাড় হয়ে গেল। একসময় কিছুই ভাবছিলাম না আমি। মাথার ওপর অনেক তারা। এরা সব পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত থাকবে। গতকাল মধুসূদন দত্ত ছিলেন, আজ নেই। নিজের জন্যে যে ভাবনা তার কি কোন সুষ্ঠু মীমাংসা নেই?

ঘুম ভেঙেছিল সকাল-সকাল। বন্ধুরা সবাই মড়ার মত ঘুমাচ্ছে। খাটে কুলোয়নি কিন্তু কেউ তার তোয়াক্কা করেনি। বাগানে দাঁড়িয়ে দেখলাম মিস্ত্রিরা এসে গেল। কাজে লেগে গেল তারা। মনে হয়, ওদের নিষেধ করি। কোনও দরকার নই। ওইভাবে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকার কোনও দরকার নেই। কিন্তু পিলারটাকে অসম্পূর্ণ রাখার তো কোন মানে হয় না। শেষ করুক ওরা।

বন্ধুরা উঠল। কয়েকজনের ইতিমধ্যে হ্যাঙওভার হয়ে গেছে। কালো কফি খেল তারা। খাওয়াদাওয়া করে দুপুরের ট্রেনে সবাই ফিরে যাবে কলকাতায়। হঠাৎ ববি গুহ বলল, 'তোমাকে তো আইডেন্টিফাই করতে যেতে হবে!'

'হ্যাঁ। তোমরা শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে চলে যাও, আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা ধরব।'

'না। চল সবাই মিলে যাই। বডি যদি পাওয়া যায় লোকটার শেষ কাজ করে যাই আমরা। আফটার অল শেষসময় পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই তো ছিল।' ববি গুহ বলল। দেখলাম অন্যরাও একমত।

তখনও সদরে শরীর চালান দেয়নি পুলিশ। ববি গুহর তৎপরতায় সেটা বন্ধ করা হল। আমি মধুসূদন দত্তকে আইডেন্টিফাই করলাম। পোস্টমর্টেম ছাড়াই ববি দুপুর নাগাদ দাহ করার অনুমতি জোগাড় করল।

মধুসূদন দত্তকে শ্মশানে নিয়ে আসতে আমাদের কাঁধ দিতে হয়েছিল। আমরা কলকাতাবাসী সুখী মধ্যবয়সী সম্পন্ন মানুষ এতে অনভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও গম্ভীরভাবে কাজটি সম্পন্ন করলাম। সৎকারের ব্যবস্থা হল। হঠাৎ ববি কোত্থেকে এক বালককে ধরে নিয়ে এল। বলল, 'এ মুখাগ্নি করবে'—

'সে কি?' সন্ধি অবাক।

'আমরা শালা হিন্দু, পোড়াচ্ছি যখন তখন মুখাগ্নি করাতে তো হবেই। এই বাচ্চাটার বয়স আট। আরও সত্তর বছর বাঁচবে ধরে নিতে পারি। ওর বাপ মা নেই, চায়ের দোকানটায় কাজ করে। ওই করুক মুখাগ্নি। যতদিন বাঁচবে ততদিন মনে রাখবে লোকটাকে।' ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই নে দশ টাকা। শোন, যাঁর মুখে আগুন ছোঁয়াবি, তাঁর নাম মধুসূদন দত্ত। বল তো নামটা?'

কচি গলায় উচ্চারিত হল, 'মধুসূদন দত্ত।'

'আবার বল।'

'মধুসূদন দত্ত।'

'ভুলবি না?'

বালক মাথা নেড়ে না বলল।

পাটকাঠির আগুন বালক ছোঁয়ালো মধুসূদন দত্তের মুখে। আগুন জ্বলল চারপাশে, ববি চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল।'

সন্ধি ধমকে উঠল, 'অ্যাই! চুপ কর। আমি মন্ত্র পড়ছি। শেষ মন্তর।' বলেই সে গান ধরল, 'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল।'

পূর্বপল্লীতে ফিরে এলাম শেষ দুপুরে। সারাদিন কারও খাওয়া হয়নি। স্নান হয়নি। সবাই খুব ক্লান্ত। আমার কেবলই মনে পড়ছিল সেই মহিলার কথা, যিনি ত্যাগ করেছিলেন মধুসূদন দত্তকে, যিনি এখনও জানেন না প্রচলিত অর্থে তিনি বিধবা। একটা মানুষ ছিল, একটা মানুষ নেই, কি সামান্য তফাৎ।

বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখি মিস্ত্রিরা অপেক্ষা করছে। তাদের কাজ শেষ। তিরিশ ফুট মাটির তলায় ডুবে থাকা পিলার পাঁচ ফুট মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মসৃণভাবে। হেডমিস্ত্রি এগিয়ে এল, 'এখন কি করতে হবে বাবু?'

বোলপুর থেকে মধুসূদন দত্ত যে প্যাকেটটা আনিয়ে দিয়েছিলেন সেটা ঘরেই পড়ে আছে। ওই প্যাকেট থেকে ফলকটা বের করে পিলারের ওপর লাগিয়ে দিতে হবে সিমেন্ট কাঁচা থাকতেই। যতদিন পিলারটা থাকবে ততদিন লোকে ফলক দেখে জানতে পারবে অরবিন্দ মিত্র নামে একজন মানুষ এখানে বাস করতেন। ইতি কি ভাবল, বন্ধুরা কি মনে করল তাতে

কি এসে যায়। এদেশে লোকে যখন নিজের নামে একটা স্টেডিয়াম তৈরি করতে পারে, তখন আমি একটা বাড়ি বানাতে পারি না?

কিন্তু এখন অস্নাত, অভুক্ত এই আমি একদম সময় পাচ্ছিলাম না ভেতর থেকে ওই ফলক বের করতে। আজকের দিনটা যাক, এর পরের বার যখন আসব তখন হয়তো মন এবং শরীর অনেক চাঙ্গা থাকবে, সায়ও পেয়ে যেতে পারি।

'যাদের হ্যাঙওভার হয়েছে তারা একটু পান করে নাও, ফিট হয়ে যাবে।' ববি গুহ বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করল গ্লাস হাতে।

সন্ধি কিন্তু কিন্তু করল, 'খালি পেটে খাব?'

'নার্ভ ঠিক হয়ে যাবে। তারপর স্নান সেরে ভাত ঘুম। সন্ধের ট্রেনে কলকাতা। আরে, এই বাড়িতে এসেছি যা ইচ্ছে তাই করব বলে। নিয়ম মানতে তো কলকাতাই রয়েছে।' ববি চিৎকার করল।

সন্ধি যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল, 'অরু, তোর বাড়ির নাম দে ইচ্ছে বাড়ি।'

ওরা সব ভেতরে চলে গেল। ইচ্ছে বাড়ি। বুকের মধ্যে খলখলিয়ে উঠল শব্দ দুটো। যা ইচ্ছে তাই নয়, আমার ইচ্ছে এইখানে থেকে যাক অনন্ত বছর। আমি মনে মনে একটা ফলক বসিয়ে নিলাম। ওই কাঁচা পিলারের গায়ে, ইচ্ছে বাড়ি। মধুসূদন দত্ত আমাকে বলেছিলেন, 'যাঁরা প্রতিভাবান তাঁরা সৃষ্টি রেখে যান। যাঁরা সাধারণ এবং সক্ষম, তাঁরা অন্তত একটা বাড়ি রেখে যেতে পারেন।' আর সেই বাড়িটার নাম ইচ্ছে বাড়ি ছাড়া আর কি হতে পারে! মিস্ত্রিদের আমি ছুটি দিয়ে দিলাম। সামনের রবিবার সকালে ওদের আবার আসতে হবে নতুন ফলক লাগাবার জন্যে।

আমি বন্ধুদের সঙ্গ পাবার জন্যে পা বাড়ালাম।

গ্রী ষ্ম কা ল এ সে গে ছে

বন্ধ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করলো রবার্ট স্টিভেনসন, 'দেশটা উচ্ছন্নে গেল।'

বাইরে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ওটা শুরু হয়েছে তিনদিন আগে। আকাশ-ভর্তি ভারি মেঘের গম্ভীর চলাফেরা। তাপাঙ্ক নেমে গিয়েছে স্বাভাবিকের খানিকটা নিচে। অথচ এখন এরকমটা হবার কথা নয়। ক্যালেণ্ডারে সামার এসে গিয়েছে। এখন নরম নরম রোদের সামার আর আকাশে অনেকক্ষণ নীল দেখা যায়। রবার্ট কাঁচের আড়ালে রাস্তার যেটুকু দেখতে পেলেন তাতে বিন্দুমাত্র ভরসা পেলেন না। কোন মানুষ নেই, বোস্টন শহরটা যেন আধা অন্ধকারে জবুথবু হয়ে আছে।

জানালা থেকে সরে এলেন রবার্ট। চমৎকার প্রকৃতি তো আর একা সৎ থাকতে পারে না। নব্বইটা বছর বেঁচে থাকতে হচ্ছে এসব দেখার জন্যে। নিজের শরীরের দিকে তাকালেন। হাত গোটালে বাইসেপটা ভাঙা ডিঙার মত দেখায় এখনও। মেদটেদ শুকিয়ে গেছে, গাল বসে গিয়েছে অনেকটা, কিন্তু এখনও তিনি সবল আছেন। মাথাটা যদি সাত তাড়াতাড়ি মরে না যেত জীবনটাকে আরও একটু নেড়েচেড়ে দেখতেন তিনি।

টিভি খুললেন রবার্ট। বি বি সির নিউজ বুলেটিনে ওই এক কথা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া আর মেঘলা আকাশ। এগুলো বলার জন্যে বিদ্যের দরকার হয় না, জানালার বাইরে চোখ মেললেই বোঝা যায়। আগে বি বি সি কি নিখুঁত আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করত! আর এখন? সোফায় বসলেন তিনি। আর তখনই নিচে শব্দ হল। কেউ হাতুড়ি ঠুকছে দেওয়ালে। রবার্টের মনে হল তাঁর বুকেই যেন আওয়াজটা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন তুলে বোতাম টিপলেন। তিনবারের বার গলা পেলেন। কাউড্রেদের মেয়ের গলা। রবার্ট নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে বললেন, 'শোন, যখন তোমার বাবাকে ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিয়েছিলাম তখন কথা হয়েছিল দেওয়াল অক্ষত থাকবে। দেওয়ালে পেরেক ঠোকার মত ভারতীয় অভ্যেস দয়া করে ত্যাগ করো।'

মেয়েটা হি হি করে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'আমি কি একবার ওপরে আসতে পারি?'

'তোমার বাপ-মা কেউ এখন নেই বুঝি?'

'না। খুব একা লাগছিল বলে পেরেক ঠুকছিলাম।'

'ঠিক আছে, মিনিট পাঁচেকের জন্যে আসতে পার!'

রিসিভার নামিয়ে মনে হল কাজটা ভাল না। ভাড়াটের সঙ্গে দহরম করা ঠিক নয়। ইণ্ডিয়া থেকে ফিরে ঘুরতে ঘুরতে এই বোস্টনে এসে মার্থার জন্যেই বাড়ি কিনেছিলেন তিনি। মার্থা

চলে যাওয়ার পর নিচটা ভাড়া দিয়েছেন। কিন্তু তিনি একা একাই বেশ আরামে থাকেন। বেল বাজল।

প্যাণ্টের উপর হাফ স্লিভ শার্টে তাঁকে নেহাৎ খারাপ দেখাচ্ছে না। রবার্ট দরজা খুললেন, 'হ্যালো।'

'হাই।' পনের বছরের মেয়েটা খিলখিলিয়ে হাসল। তিনি কিছু বলার আগেই ঘরে ঢুকে পড়ল সে। রবার্ট প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মেয়েটার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই! অত ছোট প্যাণ্ট পরে চলে এসেছে? অথচ ওপরে গলাবন্ধ পুরো হাত সোয়েটার! রবার্ট দরজা বন্ধ করলেন, 'লুক, আমি চাই না, তোমরা দেয়ালে পেরেক ঠোকো।'

মেয়েটা ধপ করে সোফায় বসে পড়ল। তারপর শুরু করল সুর করে গান, 'উই উইল ফলো নান বাট ভার্জিনিয়া বটমানি।'

রবার্ট খেঁকিয়ে উঠলেন, 'স্টপ ইট।'

মেয়েটা হাসল, 'কেন? আমাদের প্রিয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী উপদেশ দিয়েছেন এখনই যেন যৌন-জীবন নিয়ে চিন্তা না করি। কিন্তু 'দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' কি লিখেছে জানো?'

'কি লিখেছে?'

'আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভার্জিনিয়া বটমানি নিজেই কুমারীমাতা ছিলেন।'

'উঃ, দেশটার কি হলো। মেজর কিছু বলছে না?'

'ছাই। মেজর শেল্টার দিচ্ছে। বলছে ওটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।' মেয়েটা রিমোট টিপে টিভি চালাল। দু'তিনটে চ্যানেল পাল্টেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাই বব্, কাম হিয়ার, আহা দেশটার কি হল! কি মজা!'

রবার্ট ভ্রূ কুঁচকে টিভির দিকে তাকালেন। পর্দায় ফুটে উঠছে, জাতীয় ঐতিহ্যমন্ত্রী ডেভিড মিলার পদত্যাগ করেছেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেটা এখনও গ্রহণ করেননি।

'এটা একটা মজার খবর নাকি?' বিরক্ত হলেন রবার্ট।

'বব! তুমি কোথায় বাস করছ? টিভি দ্যাখোনি, কাগজ পড়োনি?'

'কাগজ আমি পড়ি না, আর ওয়েদার ছাড়া টিভি দেখছি না।'

'মাই গড! তুমি আন্তোনিও দে সাণ্টারের নাম শুনেছ?'

'সে কে?'

'ওঃ, একজন অভিনেত্রী। আমাদের ঐতিহ্যমন্ত্রী, ব্রিটেনের ঐতিহ্য মন্ত্রী মিস্টার মিলার অভিনেত্রী সাণ্টারের সঙ্গে যৌনকাজে এত ক্লান্ত হয়ে পড়তেন যে সরকারি কাজে সময় দিতে পারতেন না। এবং তিনি বিবাহিত, ছেলেমেয়ে আছে।'

'মাই গড! টিভিতে কি বলছে দেখেছ?' বিশ্বাস করতে পারছিলেন না রবার্ট।

ভাষ্যকার তখন জানাচ্ছেন, 'প্রধানমন্ত্রী জন মেজর পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে বলেছেন এটা মিলারের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জীবন তা নিয়ে প্রেস যাতে নাক গলাতে না পারে তার জন্য

মেজর একটি নতুন আইনকে সমর্থন করেছেন। এই আইন প্রণয়ণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল স্যার ডেভিড ক্যালকটকে। এদিকে সংবাদেপত্রের মুখ বন্ধ করার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে।'

রিমোট টিপে টিভি বন্ধ করে মেয়েটা বলল, 'তোমার বয়স কত বব্?'

আচমকা এইরকম প্রশ্ন কেন বুঝতে না পেরেও তিনি জবাব দিলেন, 'নব্বুই।'

'মাই গড! আর ওই লোকটা মাত্র তেতাল্লিশ। তোমার চেয়ে সাতচল্লিশ বছরের ছোট। অথচ সাণ্টারের সঙ্গে সেক্স করে এমন ক্লান্ত হয়ে যায় যে সরকারি কাজ করতে পারে না। আমি এই কথাটাই বুঝতে পারছি না। তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো বব্। কত বছর বয়স থেকে পুরুষরা ওসব করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।'

'লুক বেবি, এসব আলোচনা আমার সঙ্গে করা তোমার উচিত হচ্ছে না।'

'মাই গড! 'দ্য পিপল' প্রকাশ্যে লিখছে ওই জন্যে মিলার কাজ করতে পারছে না আর আমি আলোচনা করলেই দোষ! আমার এক বান্ধবী বলছিল চার্লি চ্যাপলিন নাকি—'

হাত তুলে মেয়েটাকে থামালেন রবার্ট। একটু ভাবলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'সাধারণত শীতপ্রধান দেশে বেশি বয়স পর্যন্ত ছেলেরা সক্ষম থাকে। মিলার স্বাভাবিক নয়। আমি যখন ইণ্ডিয়ায় ছিলাম তখন দেখেছি চল্লিশের পুরুষরাও যৌনজীবন ত্যাগ করেছে।'

'সেইজন্যে তুমি ইণ্ডিয়া থেকে চলে এসেছ?' হাসল মেয়েটা।

রবার্ট ক্ষমা করলেন ব্যাপারটা, 'ইণ্ডিয়া যখন স্বাধীন হল তখন আমার বয়স ছত্রিশ। মার্থা আর থাকতে চাইল না। এখন মনে হয় থেকে গেলে ভাল করতাম।'

'কেন?'

'এইসব শুনতে হয় না। ব্রিটেনের ঐতিহ্যমন্ত্রী যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে আর তার প্রধানমন্ত্রী সেটাকে সমর্থন করছে। ব্রিটিশ হিসেবে কি লজ্জার কথা! এখন কেটে পড়, আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না।'

মেয়েটা উঠল, 'তোমার একা থাকতে কষ্ট হয় না?'

'হয়। সেটা আমার সমস্যা।'

'তুমি আর একটা বিয়ে করছ না কেন!'

এবার হেসে ফেললেন রবার্ট, 'এই নব্বুই বছর বয়সে কে আমাকে বিয়ে করবে?'

মেয়েটা মাথা নাড়ল, 'আই ডোণ্ট নো! মে বি সামওয়ান, একটা এ্যাড দেওয়া যেতে পারে।' সে হাসল। তারপর ছটফটিয়ে চলে গেল।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর খেয়াল হল রবার্টের। ওর নামটা যেন কি? তিন চারটে নাম একসঙ্গে মারপিট করতে লাগল মাথায়। আজকাল সবকিছু ঠিকঠাক ঠিক সময়ে মাথায় আসে না। দরজা বন্ধ করে তিনি কিচেনে গেলেন। যত্ন করে এক কাপ কফি বানালেন। দেশটার কি হল! ঠিক সময়ে সামার আসে না, কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েও মন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব যায় না। চার্লস

আর ডায়না তো এখনও যুবরাজ আর যুবরানী অথচ প্রোফুমোকে পত্রপাঠ চলে যেতে হয়েছিল একরকম। একজন ব্রিটিশের যদি ঐতিহ্য না থাকে তাহলে আর কি থাকলো। এই যে ইয়ং জেনারেশন তৈরি হচ্ছে, এদের যৌবনে দেশটা তো আরও উচ্ছন্নে যাবে। এত ছোট প্যান্ট পরে কেউ ঘরের বাইরে যায়?

কফিতে চুমুক দিয়ে জানলায় ঝুঁকে দাঁড়ালেন রবার্ট। বৃষ্টিটা বন্ধ হয়েছে বলে মনে হয়। ছাতা ছাড়াই একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে। লোকটা ইণ্ডিয়ান অথবা পাকিস্থানি। মেজাজ নষ্ট হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মার্থা তাঁর সর্বনাশ করে গিয়েছে। লণ্ডনের অনেক দূরে বোণ্টন নামের এই ছোট্ট শহরের রাস্তায় যদি প্রতি পাঁচজনে একটা ভারতীয় বা পাকিস্থানিকে দেখতে হয় তাহলে এদেশে ফিরে আসার দরকার কি ছিল? কিছু ব্রিটিশ এখনও রয়ে গেছে ইণ্ডিয়ায়। আর তারা আছে রাজার মত। বাংলো, লন, গল্ফ খেলা, একগাদা ঝি চাকর, কী আরাম! তখন মার্থা ভয় পেল। যদি ইণ্ডিয়ানরা প্রতিশোধ নেয়। তার ওপর মাতৃভূমি টানতে লাগল। বোঝ এখন! এই তো মাতৃভূমি? হয়তো দেখা যাবে গোটা ব্রিটেনের ওয়ানফিফ্থ মানুষই হল এশিয়ার। লণ্ডনের মেয়র একজন ইণ্ডিয়ান, এমনটা হতে আর বেশি দেরি নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় মার্থার ভয়টাই ঠিক। ইণ্ডিয়ানরা প্রতিশোধ নেবে। ওরা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্বাচিত হয়ে যাবে। একটাই ভরসা, তাঁকে ততদিন বেঁচে থাকতে হবে না।

রবার্ট আবার বি বি সি ধরলেন। তাঁর চোখ বড় হয়ে উঠল। জেসাস! কি দেখছেন তিনি! রোদ উঠবে! আজই। বিকেল আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। থাকবে এক ঘণ্টা। আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আগামীকাল আরও একটু বেশী সময় ধরে রোদ থাববে। আঃ। রবার্ট ছুটে গেলেন জানালায়। কাঁচের আড়াল থেকে রাস্তার যেটুকু দেখা যাচ্ছে। মনটা আনন্দে ভরে গেল। টেলিফোনের কাছে ছুটলেন তিনি। মার্থার বান্ধবী এমিকে খবরটা দেওয়া দরকার। বড় বাতের ব্যথায় ভুগছে বেচারা। 'হ্যালো, এমি? শুনেছ? ওহো, বি বি সি দ্যাখোনি? আজ রোদ উঠবে। পরিষ্কার ঝকঝকে রোদ। আরে, সকাল থেকে দিনটা কেমন যাবে আজকাল আর বোঝা যায় না। তুমি কখনও ভাবতে পেরেছ ব্রিটেনের ঐতিহ্যমন্ত্রী যৌন কেলেঙ্কারীতে জড়িয়েও টিকে থাকবে। হ্যাঁ খবরটা পাওনি দেখছি! যা হোক, আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। বেরুবে নাকি? হ্যাঁ, আমি বের হব। শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করা দরকার। যদি হাঁটতে পার তাহলে চলে এসো পার্কে। বাই।'

বেলা বারোটা থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রবার্ট। রোদ উঠলেও একটু ঠাণ্ডা থাকবে। হালকা পুলওভার পরবেন না মোটা হাফস্লিভ? এখন মে মাস। হলুদ রঙটা মন্দ নয়। ওয়ার্ডরোব থেকে জামাকাপড় বের করে তা থেকে পছন্দে পৌঁছাতেই অনেকটা সময় গেল। মাঝে মাঝে জানালায় যাচ্ছেন তিনি। হ্যাঁ, আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে একটু একটু করে। মেঘ সরে যাচ্ছে। এই সময় টেলিফোন বাজল।

'হ্যালো।' খুশি মনে রিসিভার তুললেন তিনি।

'মিস্টার রবার্ট স্টিভেনসন প্লিজ।'

'হ্যাঁ। কথা বলছি।'

'আমি ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেন সার্ভিস এ্যাণ্ড এক্সটার্নাল এ্যাফেয়ারস্ থেকে বলছি। আমাদের একজন অনারেবল গেস্ট আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আপনি অনুগ্রহ করে কথা বলবেন?'

'আপনাদের গেস্ট মানে ব্রিটেনের গেস্ট। নিশ্চয়ই বলব।' হঠাৎ নিজেকে খুব মূল্যবান বলে মনে হচ্ছিল তাঁর।

'হ্যালো। আমার নাম এস. কে. রয়। আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি।'

'ভারতবর্ষ!' বিড়বিড় করলেন রবার্ট।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত কিন্তু আমার ঠাকুর্দার জন্যে বাধ্য হয়ে কাজটা করতে হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি কি কখনও দার্জিলিং-এ পোস্টেড ছিলেন?'

'দার্জিলিং! হ্যাঁ। ছিলাম। ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট হবার আগে পর্যন্ত ছিলাম।'

'তাহলে ঠিক আছে। আপনার একজন বাঙালি সেক্রেটারি ছিল মনে আছে?'

'সেক্রেটারি? আমি ওকে বাবু বলে ডাকতাম।'

'ঠিক। তাঁর নাম শশীকান্ত রায়?'

'হ্যাঁ। মনে পড়ছে। শশীকান্ত। খুব ভদ্র এবং পরিশ্রমী।'

'তিনিই আমার ঠাকুর্দা।'

'মাইগড। তা আপনি এখানে কি করছেন?'

'আপনাদের দেশ আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে। আমি বিজ্ঞানচর্চা করি। এখানে দিন তিনেক থাকব। ঠাকুর্দা বললেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আচ্ছা, মিসেস স্টিভেনসন এখন কেমন অছেন?'

'মার্থা? সে নেই।'

'ওহো! দাদু আমাকে একটা খাম দিয়েছিলেন মিসেস স্টিভেনসনকে দেওয়ার জন্যে। বলেছেন ওটা যেন অন্য কারো হাতে না দিই। শুনে উনি দুঃখ পাবেন।'

'কি আছে খামে?' রবার্টের গলার স্বর বদলে গেল।

'আমি জানি না। সীল করা। দাদু বলেছেন মিসেস স্টিভেনসনই ওটা ওঁর কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। কোন গোপন ব্যাপার বোধহয়। দাদুর শরীর ভাল না তাই ওটা যার জিনিস তাঁকেই ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।'

'আমাকে দেওয়া যাবে না?'

'তাহলে দাদুর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে হয় আমাকে।'

অবাক হলেন রবার্ট, 'শশী রায়ের বাড়িতে ফোন আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। ওঁর চেষ্টায় আমার বাবা ডাক্তার হয়ে যাওয়ায় অবস্থাটা বদলে গিয়েছে। ঠিক আছে, যদি যোগাযোগ হয়, আমি খামটাকে আপনার কাছে পৌঁছে দেব। বাই।'

রিসিভার রেখে দিল ছোকরা। হঠাৎ নিজেকে জড়ভরত বলে মনে হল রবার্টের। তাঁর বাবুর ছেলে ডাক্তার, তার ছেলে বৈজ্ঞানিক হয়েছে আর ব্রিটেন তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে? ভাবা যায়? বাবু ভাল ইংরেজি লিখত একথা ঠিক। মাঝে মাঝে তাঁর ভুলও ধরিয়ে দিত। বাট আফটার অল হি ওয়াজ এ বাবু। লোকটাকে শেষের দিকে তিনি অপছন্দ করতে আরম্ভ করছিলেন। মার্থা যেন বড্ড বেশি ওর সঙ্গ চাইত। তাঁর সময় ছিল না বলে একবার ওই বাবুর সঙ্গে টাইগার হিলে চলে গিয়েছিলেন মাঝরাতে, সূর্য ওঠার মুহূর্তে হাজির থাকবে বলে। লোকটা এমন অধস্তন যে এ নিয়ে কথা বলা নিচু মনের প্রকাশ হয়ে যেত। কিন্তু মনে মনে সেটাকে মনে রেখেছিলেন তিনি। জিমখানা ক্লাবে এক বাগানের ম্যানেজার যখন মার্থার সঙ্গে নাচতে চাইল আর মার্থা রাজী হল না তখন ক্ষেপে গিয়ে দু'চার কথা শুনিয়েছিলেন। পুষে রাখা রাগটা অন্যভাবে প্রকাশ করতে পেরে বেশ হাল্কা লেগেছিল তখন।

কিন্তু বাবুর কাছে কি জিনিস রেখে আসতে পারে মার্থা? একটা বন্ধ খামে কি কোন কাগজ, চিঠি আর সেই বাবুকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে যাতে অন্য কারো হাতে খামটা না দেয়। অদ্ভুত! পঞ্চাশ বছর কম সময় নয়। এদেশে এসেও মার্থা চল্লিশের ওপর বেঁচে ছিল। কই, তাঁকে একবারও খামটার কথা বলেনি তো! তার মানে মার্থা ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। একটা ব্যাপার যে লুকিয়ে রাখতে পারে সে অনেক কিছুই গোপন করতে সক্ষম। রবার্টের বুকের ভেতরটা কেমন হু হু করে হেসে উঠল। তিনি ভাবতেই পারছেন না মার্থা এমন কাজ করতে পারে। তাহলে তো তাঁর অজান্তে মার্থা অন্য লোকের সঙ্গে প্রেম করতে পারত, শোওয়াশুয়ি হলেও তিনি জানতে পারতেন না। তাঁর সংসারে সব কাজ ঠিকঠাক করে যে মেয়ে ভারতীয় বাবুর কাছে একটা খাম গোপনে রেখে এসে মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারে তাকে আর বিশ্বাস করেন কি করে!

এই মুহূর্তে সামনে পেলে একটা হেস্তনেস্ত করতেন তিনি। জীবনে কখনও মার্থার গায়ে হাত তোলেন নি, এখন—। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেললেন রবার্ট। হঠাৎ মনে হল তিনি যেন একটু আগ বাড়িয়ে ভেবে চলেছেন। একজন অধস্তন কর্মচারীর সঙ্গে মার্থা এমন কিছু করতে পারে না। কিছুতেই নয়। তিনি ছোট হয়ে যাবেন এমন কাজ তো নয়ই। হয়তো সস্নেহে মার্থা কোন কিছু উপহার হিসেবে দিয়েছিল বাবুকে। বাবু সেটা রেখে দিয়েছিল। এমন হতেই পারে ব্রিটিশদের প্রতি রাগবশতঃ আজ সেটা ফেরত দিতে চায়। যে দিয়েছে তার হাতে দিলেই ভাল লাগবে বলে নাতিকে মার্থার কথা বলেছে।

এমনটা হতেই পারে। মন হালকা হল, সামান্য। আর ব্রিটিশ সরকারের কী হাল হয়েছে দ্যাখো, একজন ভারতীয়কে ডেকে আনতে হচ্ছে অতিথি হিসেবে বিজ্ঞানের ব্যাপারে। যাকে ডাকছে তার পেডিগ্রি কি? বাবুর নাতি। হুঃ।

খুব ধীরে ধীরে পোশাক পরলেন রবার্ট। টাই বাঁধলেন। ছাতা নিলেন, সঙ্গে টুপি। দরজা বন্ধ করে ধীরে ধীরে নামছিলেন এমন সময় সেই কিশোরী দরজা খুলল, 'হাই বব্।'

'হ্যালো।'

'আমরা এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিচ্ছি। এইমাত্র মায়ের সঙ্গে আমার কথা হল। অন্য ভাড়াটে জোগাড় করে নাও। উইক এণ্ডেই চলে যাব।' মেয়েটা দরজা বন্ধ করে দিল।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রবার্ট। ইচ্ছে করছিল বন্ধ দরজায় শব্দ করে বলেন, 'তোমরা এটা করতে পার না। উঠে যাওয়ার আগে নোটিশ দিতে হবে। কাগজে কলমে তাই লেখা আছে।' নাঃ, আবার ল-ইয়ারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

রাস্তায় পা দিলেন রবার্ট। ইতিমধ্যেই শুকিয়ে গিয়েছে পায়ের তলার জমি। মুখ তুলে আকাশটা দেখবার চেষ্টায় ছিলেন হঠাৎ কানে এল, 'হাউ ফার বব্?'

চমকে তাকালেন। সামনের মাখনের দোকানের জর্জ ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। লোকটা রসিকতা করতে চাইছে নাকি? তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমার আর আমার থেকে সমান দূরত্ব।' তিনি দাঁড়ালেন না।

এডওয়ার্ডদের বিয়ারের দোকানের সামনে পৌঁছাতেই আবার চিৎকার, 'হাই বব্! সামার এসে গেল শেষ পর্যন্ত।'

বব্ হাসলেন। এড্ তাঁর চেয়ে ছোট কিন্তু খুব ছোট নয়।

'ব্যবসা কেমন চলছে?'

'একই রকম। আজকালকার ছেলে ছোকরারা বিয়ারের বদলে ভোদকা উইদ টনিক খাওয়া বেশি পছন্দ করছে।' ভুঁড়ির ওপর প্যান্ট তুলতে তুলতে বিশাল চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এল এড্। ওর গোঁফ পেকে ঝুলে পড়েছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে এড্ বলল, 'চললে কোথায়?'

'প্রথম সামার!' রবার্ট হাসলেন। তারপর ইচ্ছে করেই বললেন, 'মার্থা খুব ভালবাসত এমন দিনে হাঁটতে।'

'মার্থা? ওহো! ইয়েস। খুব ভাল মেয়ে ছিল সে।'

'ওর মুখ মনে আছে তোমার?'

'তা থাকবে না? কতদিন যাতায়াতের পথে কথা বলে গেছে।'

'আচ্ছা এড্, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!'

'মার্থাকে তোমার কিরকম মনে হত? চরিত্রের কথা বলছি।

'দ্যাখো বব্, চরিত্র অনেক রকম হয়। ও খুব ভাল মেয়ে এইটুকু মনে আছে।'

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।' রবার্ট হাঁটতে লাগলেন, চরিত্র অনেক রকমের হয়। সুতরাং এড্ কথাটা এড়িয়ে গেল। যৌবনে এড্ কি না করেছে। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই পেছনে লাগত। আর মার্থা তো সত্যিকারের সুন্দরী ছিল।

হঠাৎ চিৎকারটা কানে এল। থমকে দাঁড়ালেন রবার্ট। উল্টোদিক থেকে গোটা কয়েক ছেলেমেয়ে চিৎকার করতে করতে আসছে কেন? একজন একটা প্যাকেটকে এমনভাবে লাথি কষাল যে সেটা উড়ে গিয়ে পড়ল মাঝরাস্তায়। এই চিৎকার এবং বেপরোয়া চলাফেরা যে ওদের আনন্দের প্রকাশ তা বুঝতে সময় লাগল। তিনটে কালো ছেলে আছে ওদের মধ্যে। নিশ্চয়ই আফ্রিকা থেকে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে আসা ছেলে। ব্রিটেনকে ওরাও শেষ করে দিচ্ছে। আর ওই সাদা মেয়েটা, তুই কী করে কালোটাকে কোমর জড়িয়ে ধরতে দিলি! এই বোল্টনেই যদি এমন অবস্থা তাহলে লণ্ডনে তো হাঁটাই যাবে না। খুব কষ্ট হচ্ছিল রবার্টের। সারা পৃথিবী যেন ওদেশটাকে কলোনি বানিয়ে ফেলেছে।

তিরতিরে রোদ উঠেছে। আহা! পার্কের সামনে পৌঁছে মুখে হাসি ফুটল তাঁর। এমি আসছে। বেচারার হাঁটতে কষ্ট হলেও সেজেছে খুব।

'হ্যালো এমি!'

'হ্যালো বব্।'

'শেষ পর্যন্ত এবারের সামারটাকে দেখতে পেলাম।'

'বি বি সি-ও ঠিক বলল শেষ পর্যন্ত।'

'যা বলেছ। শরীর কেমন আছে?'

'শরীরের কথা ছেড়ে দাও।'

'দ্যাখো, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড় তবু—।'

'চুপ করো। তোমাকে তিনটে বাচ্চা পেটে ধরতে হয়নি।' এমি খ্যাক-খ্যাক করে উঠল, 'এখন কবরে গেলেই হয়। মাঝে মাঝে ভাবি মার্থা ভাগ্যবতী।'

'কেন? কেন মনে হয়?'

রবার্ট সতর্ক হলেন।

'চল, বেঞ্চিটায় বসা যাক। পা ব্যথা করছে।' এমি এগিয়ে গিয়ে একটা খালি বেঞ্চিতে বসে পড়ল। কয়েকদিন ভিজে ভিজে সিমেন্টের বেঞ্চিও কেমন স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। রবার্ট বসতে বাধ্য হলেন। প্রশ্নটা যেন এমির কানেই যায়নি। সে তার তোবড়ানো গাল তুলে আকাশ দেখছে। প্রায় এরকম চেহারাই হয়ে গিয়েছিল মার্থার। এ্যাদ্দিন বেঁচে থাকলে বান্ধবীর চেয়ে কম কিছু হত না। কোঁচকানো চামড়া, রোঁয়া ওঠা বেড়ালের মত।

'মার্থা তোমার খুব বান্ধবী ছিল, না?'

'ব্যাপারটা কি? কথাটা তুমি জানো না?'

'আচ্ছা, আমি ছাড়া মার্থা অন্য কারো প্রেমে পড়েছে কখনও?'

হঠাৎ হেসে উঠল এমি, 'মাই গড ! তুমি কি নিশ্চিত যে তোমার প্রেমে সে পড়েছিল?'

'না না, আগে কথাটার উত্তর দাও।'

'আমার তো উত্তর পেয়ে গেলে।' মুখ ফিরিয়ে নিল এমি।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল রবার্টের। অতি কুচুটে মহিলা। মার্থা বেঁচে থাকতেই একে তিনি দেখতে পারতেন না। স্ত্রীর বান্ধবী হওয়া সত্ত্বেও এড়িয়ে চলতেন। হঠাৎ গম্ভীর গলায় তিনি ঘোষণা করলেন, 'কিন্তু আমি একটা ঘটনা জানতে পেরেছি।

এমি সন্দেহের চোখে তাকাল, 'কি রকম?'

চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়লেন রবার্ট, 'পেয়েছি!'

'যার কথা বলছ সে এখন কবরে শুয়ে আছে।'

'তাতে তো ঘটনাটা মিথ্যে হয়ে যায় না।' অভিনয় করে যাচ্ছিলেন রবার্ট।

'বুঝতে পেরেছি। জন তোমাকে বলেছে।'

'জন?' বেশ হতভম্ব হয়ে গেলেন রবার্ট।

'ক্যাসিনোর মালিক ছিল। প্রথমে আমার পেছনে লেগেছিল, পাত্তা না পাওয়াতে মার্থাকে জপাতে লাগল। ওর ভদ্রতাবোধকে দুর্বলতা বলে ভুল করল জন।'

'তারপর?' নিশ্বাস চাপলেন রবার্ট।

'তারপর আর কি? এসব পুরোন ছেঁদো কথায় এখন লাভ কি। দুজনেই তো মরে গিয়েছে। সারাদিন একা থাকত, ছেলেপুলে হয়নি, বেচারা তাই ক্যাসিনোয় যেত।'

'গিয়ে জুয়ো খেলত?'

'তা একটু আধটু, আমিও খেলেছি।'

'জনের সঙ্গে সম্পর্কটা, মানে, কতদূর এগিয়েছিল?'

'দ্যাখো, জন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত, মার্থা শুনে যেত। ব্যস।'

গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন রবার্ট। হ্যাঁ, এক সময় মার্থা তাঁকে বলত ক্যাসিনোয় যাওয়ার কথা। তিনি যে সেটা পছন্দ করতেন না তাও সে জানত। কিন্তু জন যে প্রেম নিবেদন করত তা জানা ছিল না। এমির কথা অনুযায়ী জন প্রেম নিবেদন করেছে, মার্থা কিছুই বলেনি। তিনি ঘুরে তাকালেন, 'মার্থা তোমাকে ইণ্ডিয়ার কথা বলত? মনে করে দ্যাখো তো!'

'হ্যাঁ। ওর খুব ভাল লেগেছিল ইণ্ডিয়ায় থাকতে।'

'ভাল লেগেছিল? ও-ই তো জোর করে চলে এল।'

'তা জানি না। যে শহরে থাকত তার গল্প করত খুব। হ্যাঁ, কি একটা জায়গা যেন, যেখান থেকে সানরাইজ খুব ভাল দেখা যায়—'

'টাইগার হিল।' খসখসে গলায় বললেন রবার্ট।

'হ্যাঁ। টাইগার হিলের বর্ণনা করত সে। বলত অত ভাল জায়গা নাকি পৃথিবীতে হয় না। আমি ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওখানে টাইগার আছে নাকি? সে জবাব দিয়েছিল, একদম না। তবে বেড়ালের মত স্বভাবের মানুষ সেখানে গেলে কখনও কখনও টাইগার হয়ে যায়। ওহো, এবার উঠব বব্।'

'এত তাড়াতাড়ি?' রবার্ট বাধ্য হলেন উঠতে, 'ওখানকার কথা সে বলেছে তোমাকে? কোন বাবু? মানে আমার এক ক্লার্ক যার সঙ্গে সে টাইগার হিলে গিয়েছিল, তার কথা কিছু বলেছিল?'

হাঁটতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এমি, তারপর মাথা নাড়ল, 'একজনের কথা খুব বলত মার্থা। লোকটা ওকে কি করে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যায় শিখিয়েছিলেন। ওহো, মনে পড়েছে। লোকটার সঙ্গে ওর একটা চুক্তি হয়েছিল।'

'চুক্তি।'

'হ্যাঁ। দুজনে যা বিশ্বাস করে তা একটা কাগজে লিখে খামে বন্ধ করে দুজনকে দিয়েছিল। তিরিশ বছর পরে দেখা করে সেই খাম খুলে দেখা হবে তখনও সেই বিশ্বাসটা আছে কিনা। মার্থা প্রায়ই বলত কাজটা করা হচ্ছে না। সে চিঠিও দিয়েছিল লোকটাকে কিন্তু জবাব পায়নি। হয়তো ঠিকানা বদলেছে কিংবা মরেই গেছে।' এমি হাসল, 'মজার খেলা না? আমি বলতাম সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মন পাল্টায়, অতএব বিশ্বাসও পাল্টাবে। মার্থা তখনও স্বীকার করেনি। তাও তো অনেকদিন হয়ে গেল।'

'তাহলে মার্থার কাছে সেই লোকটার খাম ছিল?'

'থাকার তো কথা। কারণ দুজনের সামনেই সেটা খোলার চুক্তি ছিল।'

এমি চলে গেল। নিজেকে খুব অসহায়, ছিবড়ে হয়ে যাওয়া মানুষ বলে মনে হচ্ছিল রবার্টের। তাঁরই এক বাবুর সঙ্গে মার্থা এসব করেছে অথচ তাঁকে কিছুই জানায়নি। এড্ কিংবা জনকে তিনি মেনে নিতে পারেন, ওরা ইণ্ডিয়ানদের মত অত সেণ্টিমেণ্টাল নয়। বাট দ্যাট বাবু—। রবার্ট থপ থপ করে হাঁটতে লাগলেন। রোদ চলে গিয়েছে। আকাশে আবার মেঘেদের আনাগোনা, হঠাৎ মনে হল ইণ্ডিয়ায় গিয়ে সেই বুড়োটাকে দু'ঘা কষিয়ে দিলে কেমন হয়। শরীরটা নব্বুই বছরের না হলে তিনি নিশ্চয়ই যেতেন। ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে রাস্তাটা সংক্ষেপ করতেই এগিয়ে গিয়ে মনে হল পাশেই কবরখানা আর সেখানেই মার্থা শুয়ে আছে। প্রথম প্রথম প্রতি রবিবার, জন্মদিন মৃত্যুদিনে যেতেন তিনি ফুল নিয়ে। আজকাল আর যাওয়া হয় না। আজকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন নাকি তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার মার্থা কেন করল? কবরখানার গেটের দিকে তাকিয়ে তিনি মাথা নাড়লেন। যাকে জিজ্ঞাসা করবেন তাব তো একদম ইচ্ছা করে না। মার্থার পাশের জায়গাটা তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করা রয়েছে। ভাবতেই গায়ে কাঁটা ফোটে।

বৃষ্টি নামলো। মাঝেমাঝে রোদ ওঠার একটা খেলা চলল কয়েকদিন ধরে। এই কদিনে রবার্টের কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। নিচের ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে বটে কিন্তু বাড়তি ভাড়া দিয়ে গেছে। ওদের চলে যাওয়ার কারণ অদ্ভুত। মেয়েটা শব্দ করতে চায়। এ বাড়িতে সেটা নিষেধ বলে চলে যাচ্ছে। এমনটা কে কবে শুনেছে? মার্থার সমস্ত জিনিসপত্র একটা আলমারিতে তোলা ছিল। রবার্ট সেগুলো খুঁটিয়ে দেখেছেন কোন মুখবন্ধ পান কিনা। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই বৃথা হয়েছে। মার্থার রেখে যাওয়া জিনিসপত্রে কোন গোপন ঘটনা নেই। এমি যা বলেছে তা তাহলে সত্যি নয়। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে মার্থা একটা লকার নিয়েছিল ব্যাঙ্কে। দুজনের নামেই। যতদূর জানেন তাতে কিছুই রাখা হয়নি। রাখার সময় পায়নি মার্থা। তাদের একাউন্ট থেকে প্রতি বছর লকারের ভাড়া এ্যাডজাস্ট করে নেয় ব্যাঙ্ক। একবার লকারটা দেখতে হবে।

সোমবার সকালে টেলিফোন বাজল। জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হচ্ছিলেন রবার্ট। রিসিভার তুললেন। তাঁর এজেন্ট বলল, 'একজন ভাড়াটে পেয়েছি। আগের ভাড়াটের চেয়ে বেটার। মেয়েটি একাই থাকবে।'

'একা মেয়ে?'

'আঃ, তাতে তোমার কি সমস্যা বব্? এ আওয়াজ করবে না।'

'ঠিক আছে কিন্তু মেয়েটা কি করে?'

'জিজ্ঞাসা করিনি। এ্যাডভান্স দেবে, থাকবে। ইণ্ডিয়ানরা টাকা পয়সার ব্যাপারে—।'

'ইণ্ডিয়ান? আমার বাড়িতে? ওহো, না। কিছুতেই নয়।'

'তুমি ঠিক বলছ বব্?'

'একশবার ঠিক বলছি। ওরা ব্রিটেনকে ইণ্ডিয়া বানাচ্ছে, বোল্টনকে প্রায় বানিয়ে ফেলেছে কিন্তু আমার বাড়িটাকে—কিছুতেই ঢুকতে দেব না।' টেলিফোন নামিয়ে রেখে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বর্ষাতি আর ছাতা নিয়ে।

রাস্তায় লোক নেই, বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। পাগল ছাড়া কেউ বাইরে বের হবে না। কিন্তু তিনি তো পাগলই হয়ে গেছেন। লকার খুলে উঁকি মারতেই একটা বড় খাম দেখতে পেলেন তিনি কাঁপা হাতে সেটা বের করতে মার্থার হাতের লেখা নজরে পড়ল, 'আমি যদি মরে যাই তাহলে দয়া করে নিচের ঠিকানায় পোস্ট করে দিও।'

ঠিকানা দেখেই গা জ্বলে উঠল তাঁর। বাড়ি ফিরে এলেন কাঁপা পায়ে।

শোওয়ার ঘরে ঢুকে বড় খামটা খুলতেই একটা ছোট খাম বের হলো। এটা তাঁর অফিসের খাম, এতদিন বাদেও চিনতে পারলেন। লোকটা অফিসের স্টেশনারী মিস্-ইউজ করেছে। খামটার মুখ বন্ধ। কি লিখেছে লোকটা? খুলব খুলব করেও তিনি খুলতে পারছিলেন না। এতদিনকার

শিক্ষা বাধা তৈরি করছিল। শেষ পর্যন্ত অনেক অস্বস্তি সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নিলেন ওটাকে ইণ্ডিয়াতে পাঠিয়ে দেবেন। মার্থার শেষ অনুরোধ রাখবেন।

সেই বিকেলেই চিঠি এল লণ্ডন থেকে। এস. কে. রায় পাঠিয়েছে। সেই বাবুটার নাতি যে ব্রিটেনের অতিথি হয়ে এসেছে। রাগে খামটাকে ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েও মনে পড়ে গেল। মার্থা ঐ লোকটার কাছে যা গচ্ছিত রেখে এসেছিল তাই রয়েছে এখানে। বাবু এতদিন পরে পাঠিয়ে দিয়েছে। খাম খুললেন তিনি। লণ্ডন থেকে এস. কে. রায় লিখেছে, 'ডিয়ার মিসটার স্টিভেনসন, আমার দাদুর সঙ্গে কথা বলেছি। মিসেস স্টিভেনসনের মারা যাওয়ার খবর পেয়ে তিনি খুব দুঃখিত এবং আপনাকে সহানুভূতি জানাতে বলেছেন। যা হোক, দাদুর ইচ্ছা মতন খামটা আপনার কাছে পাঠালাম। ধন্যবাদ সহ—।'

খামটাকে দেখলেন তিনি। সেই একই খাম। মার্থাও স্টেশনারীর মিস্-ইউজ করেছে। কাঁপা হাতে খামটাকে ছিঁড়লেন রবার্ট। একটা ভাঁজ করা কাগজ। কাগজে চোখ রাখলেন। তাঁর সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। কোন রকমে শরীর তুলে লকার থেকে আনা খামটার মুখ ছিঁড়লেন তিনি। একই রকম কাগজ। ওপরে লেখা দশই মার্চ, ছেচল্লিস, টাইগার হিলের সকাল। তার নিচে লেখা, 'আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। আমৃত্যু করব। শশীকান্ত রায়।'

রবার্টের মনে হচ্ছিল তিনি শূন্যে ভেসে চলেছেন। প্রথম কাগজটা আবার তিনি তুলে ধরলেন, 'দশই মার্চ, ছেচল্লিশ, টাইগার হিলের সকাল। আমি ববকে ভালবাসি। মার্থা স্টিভেনসন।'

বাইরে বৃষ্টি পড়ে চলেছে সমানে। রবার্ট টিভি খুললেন। খবর হচ্ছে। লণ্ডনের এক পাড়ায় ভারতীয়দের সঙ্গে সাদা ছেলেদের বিরোধ লেগেছে। তিনজন ভারতীয়কে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। টিভি বন্ধ করলেন তিনি। তারপর টেলিফোন তুললেন, 'ম্যাক, আমি বব্। রবার্ট সিটভেনসন। হ্যাঁ, তুমি মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিতে পার। বাই।'

জীবনে যেমনটি হয়

চিত্তপ্রিয় চ্যাটার্জী অবসর নিয়েছেন বছর ছয়েক হলো কিন্তু এখনও তাঁর শরীর স্বাস্থ্য মজবুতই আছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী গত হয়েছেন তিন বছর আগে। যাওয়ার আগে প্রায় তিন বছর ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেননি চিত্রপ্রিয়। কিন্তু তিন বছর ধরে একজন মৃতপ্রায় মানুষের সঙ্গে ক্রমাগত বাস করলে শোকের ধার কমে যায় বলেই স্ত্রী গত হবার পর তিনি স্থির আছেন। এখন চিত্তপ্রিয়র সময় কাটে বই পড়ে এবং নিয়মিত ছেলেমেয়েদের চিঠি লিখে। বড়ছেলে অনুতোষ মাদ্রাজে আছে তার পরিবার নিয়ে। ভাল চাকরি করে সেখানে। মেয়ে অনন্যা দিল্লীতে। এরা সবাই তাঁকে কলকাতার বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে তাদের কাছে চলে যেতে বলে। চিত্রপ্রিয় রাজী হননি। একটি চাকরের ওপর ভরসা করে দিব্যি আছেন তিনি।

যেহেতু বয়স বাড়া সত্ত্বেও চিত্তপ্রিয় অশক্ত হয়ে পড়েননি, তাই তাঁর জীবনযাপনের ভঙ্গি একটু অন্যরকম। প্রত্যহ ভোরে তিনি কেডস পরে চার কিলোমিটার হাঁটেন। মদ অথবা সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন বছর কুড়ি হলো। ইদানীং মাংস এবং ডিম খাচ্ছেন না। দীক্ষা নেবার কথা চিন্তাও করেননি, ওসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহও নেই। বাড়িতে ঠাকুর দেবতার কোনো ছবি নেই। ইদানীং তাঁর শখ হচ্ছে বেড়াতে যাওয়ার। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দ্রষ্টব্যগুলো না দেখে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

কিন্তু আজকাল চারধারে এত অব্যবস্থা যে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে সাহস হয় না। ট্রেনের টিকিট নিয়েই তো কত ঝকমারি। শেষপর্যন্ত চিত্তপ্রিয় ঠিক করলেন একটি বিখ্যাত 'স্পেশাল' কোম্পানির সঙ্গী হবেন। হয়তো ইচ্ছেমতো ঘুরে দেখা হবে না কিন্তু টাকা দিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত তো হওয়া যাবে।

সেইমতো ব্যবস্থা হলো। দুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বার। সেখান থেকে হৃষীকেশ হয়ে কেদার এবং বদ্রীনাথ। নামগুলোর গায়ে তীর্থের গন্ধ থাকায় একটু অস্বস্তি হয়েছিল প্রথমে, পরে ভেবে দেখলেন জায়গাগুলোর প্রাকৃতিক আকর্ষণ তো কম নয়। তিনি তো পুণ্য অর্জন করতে যাচ্ছেন না। প্রকৃতি দেখবেন প্রাণভরে। অতএব চাকরের হাতে সংসার ছেড়ে তিনি স্যুটকেস নিয়ে এক সন্ধ্যেবেলায় হাজির হলেন স্টেশনে।

যে কামরায় তাঁদের যাওয়ার কথা তার সামনের প্ল্যাটফর্মে গিজগিজ করছে মানুষেরা। বেশির ভাগ বয়স্ক মানুষদের বিদায় জানাতে এসেছেন তাঁদের পরিবার। ব্যবস্থাপকদের বারংবার সাবধান করে দিচ্ছেন যাতে অযত্ন না হয়। কামরায় উঠে মেয়ে মায়ের জিনিসপত্র

গুছিয়ে দিচ্ছে যাতে অসুবিধে না হয়, ছেলে বাবাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সময়মতো ওষুধ খাওয়ার কথা। চিত্তপ্রিয় লক্ষ্য করলেন অধিকাংশ যাত্রীরই বয়স হয়েছে এবং কোনো আত্মীয় সঙ্গী নেই। এতই যখন দুশ্চিন্তা তখন বিদায় জানাতে আসা আত্মীয়রা সঙ্গী হয়নি কেন?

চিত্তপ্রিয়র স্বভাব হলো কারো সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা না বলা। ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন এতদিন অপরিচিত বৃদ্ধবৃদ্ধারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করেছেন এমন ভঙ্গিতে যে অপরিচয়ের গন্ধটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্যাসেজের পাশে জানলার ধারে যে মুখোমুখি দুটো আসন থাকে তার একটি বরাদ্দ হয়েছিল চিত্তরপ্রিয়ের জন্যে। চিত্তপ্রিয় তাই চেয়েছিলেন। কারও সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে বসতে হবে না। কেউ গলা বাড়িয়ে কথা শুরু করতে পারবে না। ট্রেন ছাড়ার খানিক পরেই তিনি একটা বই খুলে বসলেন। ট্রেনে ওঠার আগে প্ল্যাটফর্ম থেকে ইংরেজি থ্রিলার কিনেছেন। কিন্তু আলোর তেজ এত কম যে ভাল করে পড়া যাচ্ছে না। নাকি চশমার পাওয়ার বদলাতে হবে। চিত্তপ্রিয় বই বন্ধ করলেন। না, সত্যি তিনি এবার বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। শরীরে মেদ জমেনি বটে কিন্তু চামড়া শিথিল হয়েছে, কুঁচকে যাচ্ছে। চোখের নিচে বেশ ভাঁজ পড়েছে। এগুলো কখন অজান্তে এসে গেল খেয়াল করেননি। চারতলায় উঠতে কষ্ট হয়। দৌড়াবার কথা ভাবতেও পারেন না। চোখের আর দোষ কি!

চিত্তপ্রিয়র উল্টোদিকের আসনে যিনি বসেছিলেন তিনিও বৃদ্ধ। এই কামরা শেষ বয়সের মানুষে ঠাসাঠাসি। বৃদ্ধ বললেন, 'আমার শোওয়ার জায়গা পড়েছে ওপরে। বলুন তো, এই শরীর নিয়ে ওপরে উঠি কি করে? এত করে বললাম লোয়ার বার্থ দিতে, কানেই তুলল না। মশাই কি এই প্রথম?'

চিত্তপ্রিয় মাথা নাড়লেন, না। মুখে কিছু বললেন না। কথা বললেই কথা বাড়বে। এবং সে সব কথা যে অভিযোগের নামান্তর তাতে সন্দেহ নেই। বয়স হলে মানুষ সবসময় অসন্তুষ্ট থাকে!

এইসময় আর এক বৃদ্ধ ট্রেনের দুলুনি সামলে কোনোমতে এসে দাঁড়ালেন, 'ওহে হরিহর! উনি রাজী হয়েছেন।'

'হয়েছেন?' উল্টোদিকের বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন।

'হবে না কেন? পাঁচটা দামড়া বুড়োর মধ্যে কোনো মেয়েছেলে একা বসে থাকতে চায়? বললাম, আপনার এখানে অসুবিধে হলে সিঙ্গল সিটে চলে যেতে পারেন। ওখানে হরিহর আছে, বললে চলে আসবে।'

বৃদ্ধ বললেন, 'কিন্তু আমার শোওয়ার বার্থ যে ওপরে। ওঁর বয়স কত?'

'ষাটের মধ্যেই হবে। আগে এখানে পাঠিয়ে তো দিই তারপর দেখা যাবে। মালপত্র নিয়ে চলে এসো, ভ[illegible]য়ে গপ্পো করতে করতে যাওয়া যাবে।'

দুই বৃদ্ধতে মিলে মালপত্র নিয়ে নড়তে নড়তে চলে যেতে চিত্তপ্রিয় বেশ অস্বস্তিতে পড়লেন। উল্টোদিকে একজন মহিলা বসে থাকলে অনেক ঝামেলা। তাঁকেই হয়তো নিজের লোয়ার বার্থ ছেড়ে ওপরে উঠতে হবে। না, তিনি উঠবেন না। টাকা দেবার সময় পইপই

করে বলেছিলেন বলে বার্থটা পেয়েছেন। এখন সেটা ছাড়তে রাজী নন। সবচেয়ে ভাল, কথা না-বলা, প্রশ্রয় না-দেওয়া, আর তাহলে ভদ্রতার মুখোশ পরতে হবে না। চিত্তপ্রিয় আবার বই খুললেন। ভাল দেখতে না-পাওয়া সত্ত্বেও এমন ভাব করলেন যে, গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি পড়ে চলেছেন। একটু বাদেই স্যুটকেস এল। সঙ্গে সাদা কাপড়। চিত্তপ্রিয় মুখ তুলে তাকালেন না। উল্টোদিকের আসনে কেউ বসলে কতক্ষণ না দেখে থাকা যায়?

একসময় চিত্তপ্রিয়কে মুখ তুলতেই হলো। মহিলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। যদিও এত রাতের অন্ধকারে বাইরের কিছুই চোখে পড়ার কথা নয়। তবু তাকিয়ে থাকা। সাদা শাড়ির নীল পাড় কপালের একটু ওপর থেকে ঘোমটা হয়ে নেমেছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট, তবে বোঝা যায় যৌবন পার হয়ে এসেছেন অনেককাল। আজকাল অনেক মহিলাই এইসব ভ্রমণ কোম্পানিগুলোর ওপর ভরসা করে বাইরে যেতে পারছেন। ইনিও সেই দলের। নাক এবং হাত দেখে বোঝা যাচ্ছে গায়ের রঙ একসময় খুবই উজ্জ্বল ছিল। চিত্তপ্রিয়র স্ত্রী সুস্বাস্থ্যবতী ছিলেন না, কিন্তু খুবই ফর্সা ছিলেন। মেয়ে অনন্যা তার মায়ের রঙ পেয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি রকম ছিল, তা আজও স্পষ্ট নয় চিত্তপ্রিয়র কাছে। কোনোদিন অমর্যাদা করেননি, কর্তব্যে অবহেলা হয়নি, রোগশয্যায় সেবা করেছেন, কিন্তু মারা যাওয়ার পর আবিষ্কার করলেন স্মৃতি ধূসর হয়ে আসছে। এখন তো তেমন করে মনেও পড়ে না। প্রেম ভালোবাসার যে টানের কথা বই পত্রে পড়া যায়, তার কোনোটাই নিজের জীবনে স্ত্রীর প্রতি অনুভব করেননি তিনি। উল্টোদিকে বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় কোনো মহিলার প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেননি। এখন পর্যন্ত শব্দ দুটো মনে আসতেই হেসে ফেললেন চিত্তপ্রিয় অন্যমনস্কভাবে। এই ষাটের ওপর পৌঁছে কোন মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হবেন তিনি? যাঁদের প্রতি হলে স্বাভাবিক দেখাবে তাঁদের তো বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। আর পঞ্চাশ ছাড়ালে বাঙালি মেয়েদের মন আর যাই হোক নতুন পুরুষের প্রেম গ্রহণের জন্যে বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষিত থাকে না। বাসনা আসে কিনা জানেন না, কিন্তু তা চেপে রাখতে রাখতে ও ব্যাপারে চৈত্রের দুপুরের মতো সুনসান হয়ে যান।

ভদ্রমহিলা মুখ ফেরালেন। তারপর দুটো হাত তুলে জানলার কাচ নাবাবার চেষ্টা করলেন। ওঁর শক্তিতে কুলোচ্ছিল না। চিত্তপ্রিয় আর নিস্পৃহ থাকতে পারলেন না। বললেন, 'আমি দেখছি, আপনি একটু সরুন।'

ভদ্রমহিলা তাকালেন। সামনের চুলে রুপোলি ছোপ, মুখের চামড়া বয়স হওয়া সত্ত্বেও এখনও টানটান। চশমার ভেতর চোখ দুটো। চিত্তপ্রিয় থমকে গেলেন। তাঁর মাথার মধ্যে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। এইরকম ঘাড় বেঁকিয়ে বড় চোখে তাকানো, না হতে পারে না। মানুষের চেহারা বদলে যায়। ভঙ্গিও। সময় সব কিছু চমৎকার গিলে ফেলে। তাঁর নিজের কুড়ি বছরের চেহারার সঙ্গে এখনকার একটুও মিল নেই। ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। শুধু চাহনি দেখে দুটো মানুষকে এক করে দেওয়া হঠকারিতা।

চিত্তপ্রিয় অনেকটা শক্তি প্রয়োগ করে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের আসনে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন ভদ্রমহিলা একইভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি এবার অস্বস্তিতে পড়লেন। সে ছিল ছিপছিপে, রোগা বলাই ভাল। হলুদ শাড়ি আর হলুদ জামা পরতে খুব ভালবাসত। কোঁচকানো চুল হাঁটুর কাছে নেমে থাকত ঝরনা হয়ে। ইচ্ছে করেই তাকে বন্দী করতো না সে। আর ওই মুখ দেখে মনে হতো পবিত্র শব্দটির বিকল্প আছে। তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই একমাত্র চাহনিটুকু ছাড়া।

চিত্তপ্রিয় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আগ বাড়িয়ে কথা বলা তাঁর স্বভাবে নেই। মহিলাও পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করেছেন। এখন আর বই পড়ার চেষ্টা করলেন না চিত্তপ্রিয়। অনেক, অনেকদিন বাদে সেই অস্বস্তিটা আজ ফিরে এল তাঁর মনে। পেছন ফিরে তাকালে অনেক বছর পেরিয়ে যেতে হয় আর তার সংখ্যাটা মোটেই স্বস্তিজনক নয়। কিন্তু সত্য যা, তা চিরকালই সত্য।

জামসেদপুরে থাকতেন তখন। বাবা চাকরি করতেন টাটা কোম্পানিতে। কুলসি রোডের কোয়াটার্সে থেকে সদ্য কলেজে উঠেছেন। ওই সময় সাকচিতে মানুষজন কম, সবাই সবাইকে চেনে। স্কুলে থাকতেই চিত্তপ্রিয় ভাল ক্রিকেট খেলতেন, নামও হয়েছিল। সাকচির মাঠে শীতের ছুটির দিনগুলো কাটতো। সেদিন ম্যাচ ছিল। ব্যাট করছিলেন তিনি। একটা ফুলটস পেয়ে সপাটে ঘুরিয়েছেন, এমন সময় চিৎকার উঠল। মাঠের ওপাশে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার মাথায় গিয়ে পড়েছে বলটা। দুহাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়েছে যে তার পরনে চকোলেট রঙের শাড়ি, বয়স সতের কি আঠারো। সবাই ছুটে যেতে চিত্তপ্রিয়ও গিয়েছিলেন। মেয়েটার ফর্সা আঙুলের ফাঁক গলে টকটকে লাল রক্ত বেরিয়ে আসছিল। সবাই মিলে মেয়েটাকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। মেয়েটির মা চিৎকার কান্নাকাটি করে বকাঝকা শুরু করে দিলেন। ওবার বাউণ্ডারির আনন্দ মুছে গিয়েছিল, নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। ডাক্তার এল। আঘাত তেমন গুরুতর নয় কিন্তু স্টিচ করতে হলো। সেদিন আর খেলেননি চিত্তপ্রিয়।

সেই মেয়ে, যার নাম সরমা তার সঙ্গে একদিন আলাপ হয়ে গেল চিত্তপ্রিয়র। আলাপ থেকে প্রেম। সরমার চুলের ফাঁকে তখনও ছোট্ট সাদা দাগ উঁকি মারত। জুবিলি পার্কে হাঁটতে হাঁটতে সরমা বলেছিল, 'তুমি আমার মাথায় সারাজীবন থেকে গেলে।'

সে বড় সুখের সময় ছিল। সুখের এবং আশঙ্কার। সপ্তাহে দুদিন লুকিয়ে চুরিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা আর দিন রাত ভাবা। তারপর অবধারিতভাবে সেই দিনটা এল। সরমা কাতর গলায় জানাল, তার বাবা বিয়ের ঠিক করেছেন, কিন্তু সে আত্মহত্যা করবে তবু অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। এখন সব কিছু চিত্তপ্রিয়র হাতে। সে যেটা চায় তাই হবে। চিত্তপ্রিয় নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলেন। সরমাকে বাঁচাতে গেলে তখনই তাঁর একটি চাকরি দরকার। কিন্তু কে তাঁকে চাকরি দেবে? কলেজে পড়া এক তরুণ কোন চাকরি করতে পারে? বাবা মাকে বলে সাহায্য চাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ তাঁরা প্রশ্রয় দেবেন না। বন্ধুরা পরামর্শ দিল সরমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে। সেখানে চেষ্টা চরিত্র করে চাকরি যোগাড় করতে। আর

সেই জায়গাটা কলকাতা হওয়া উচিত। অত লোকের ভিড়ে কেউ তাদের খুঁজে বের করতে পারবে না। সবাই মিলে চাঁদা তুলে হাজার খানেক টাকা যোগাড় করে দিল। সেই টাকা হাতে পেয়ে চিত্তপ্রিয়র মনে হয়েছিল পৃথিবীটা তার মুঠোয় এসে গেছে। সরমাকে প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন তিনি। জামসেদপুর থেকে ট্রেনে কলকাতা। একটা সাধারণ হোটেলে থেকে চাকরির খোঁজখবর নেওয়া এবং সেটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সরমা বলেছিল, 'যদি না পাওয়া যায়?' তিনি বলেছিলেন, 'পেতেই হবে। এ ঝুঁকি না নিলে আমি তোমাকে কখনই পাব না সরমা। তুমি আমার ওপরে ভরসা করতে পারছ না?'

'নিশ্চয়ই করি। আর চাকরি যদি না পাও ক্ষতি নেই, কোনো রকমে পেট চলার একটা কিছু জুটে যাবে। তোমার সঙ্গে বস্তিতে থাকতেও আমার আপত্তি নেই। শুধু—।'

'শুধু কি?'

'আমরা স্বামী-স্ত্রী না হয়ে একসঙ্গে যাই কি করে?'

ব্যাপারটা মাথায় ছিল না চিত্তপ্রিয়র। তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন সত্যি তো, সরমার সঙ্গে বিয়ে হবে কখন? কি করে? তারপরেই তাঁর খেয়াল হলো। বললেন, 'আমরা কলকাতায় পৌঁছেই কালীঘাটের মন্দিরে চলে যাব। ওখানে শুনেছি গেলেই বিয়ে করা যায়। খোদ ঠাকুরের সামনে বিয়ে হলে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কি, রাজী?'

ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে গল্প করেছিল। একেবারে ভোরের ট্রেন ধরবে ওরা যাতে বাড়ি থেকে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে যেতে পারে। কয়েকটা জামাকাপড় ছাড়া সঙ্গে কিছু নেবার দরকার নেই। চলন্ত ট্রেনের জানলার পাশে বসে দুজনে সূর্য ওঠা দেখবে। এখন এই মুহূর্তে শুধু বেড়াতে যাচ্ছি বললেও ওদের দুই পরিবারের কেউ ট্রেনে উঠতে দিতে রাজী হবে না। যেন ট্রেনে উঠলেই তরুণ-তরুণী নষ্ট হয়ে যাবে। ওরা তখন স্বপ্নে ভাসছিল।

সরমা ধরা পড়ে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে তার মা পথ আগলেছিলেন। হয়তো চিত্তপ্রিয়র কোনো বন্ধুই ওই উপকার করেছিলেন, নয়তো মেয়ের ভাবগতিক দেখে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। স্টেশনে অনেকটা বেলা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসেছিলেন চিত্তপ্রিয়। তখন তাঁর অবস্থা উন্মাদের মতো। বন্ধুরা বিকেলে খবর আনল সরমাকে নিয়ে তার বাবা-মা কলকাতায় চলে গিয়েছেন।

তারপর আর কোনো যোগাযোগ নেই। সরমার বিয়ে হয়েছে এ খবর কানে এসেছিল। সে যে আত্মহত্যা করেনি জেনে স্বস্তি পেয়েছিলেন চিত্তপ্রিয়। সময় এমন একটা ওষুধ, যা সব দুঃখের স্মৃতি মুছে দেয় ধীরে ধীরে। আরও পরে কলকাতায় চাকরি করতে গিয়ে তাঁর হাসি পেয়েছিল। সেদিন যদি সরমা ঠিকঠাক স্টেশনে আসত তাহলে দুজনের জীবন কিভাবে ভেসে যেত, তা ভাবলে কষ্টের বদলে হাসি পায়। কারণ দুটো অপরিণত মস্তিষ্কের মানুষ শুধু আবেগ সম্বল করে জীবনের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিল, এটা হাস্যকর ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু একটু চাপা নিঃশ্বাস যে বুকের মধ্যে পাক খেত না তাই বা কে বলবে? নইলে, অনেক পরে বাবার পছন্দ-করা মেয়েকে বিয়ে করেও তিনি স্বাভাবিক হতে পারেননি কেন? কর্তব্য করা এক জিনিস আর ভেতর থেকে আসা ভালবাসায় আঁকড়ে-ধরা আর এক জিনিস।

চিত্তপ্রিয় আবিষ্কার করেছিলেন সেই ভেতর থেকে আসার পথ সরমাকে হারানোর পর থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা তাঁর অজানা ছিল বিয়ে পর্যন্ত। যে যাদুমন্ত্রে সেই দরজা খোলা সম্ভব হতো, তা তাঁর স্ত্রীর জানা ছিল না। অবশ্য এত বছর একসঙ্গে বাস করার পর তা নিয়ে আফসোস করার কথা মনেও আসত না চিত্তপ্রিয়র। সরমার স্মৃতিতে ধুলো জমতে জমতে কখন তা মনের আড়ালে চলে গিয়েছিল, তা টের পাননি তিনি। আজ হঠাৎই ওই চাহনির ঘূর্ণিঝড় এসে ধুলোর কিছুটা সরিয়ে দিতে অস্বস্তি শুরু হয়েছিল। চিত্তপ্রিয় উল্টোদিকে বসা প্রৌঢ়ার দিকে তাকালেন। এই মেয়ে কি সরমা? তিনি মহিলার চুলের ফাঁকে দাগটা খোঁজার চেষ্টা করলেন দূর থেকে। ওই দাগ নাকি আজন্ম বহন করতে হবে সরমাকে। ছোট্ট একটা কাটা দাগ কি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়? ভাল করে চেহারাটা দেখলেন তিনি। না, তাঁর মনে একটুও উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে না। যে সরমাকে এক মাইল দূর থেকে আসতে দেখলেই হৃদয়ে কাঁপুনি আসত, তার বিন্দুমাত্র এখন নেই।

ট্যুর কোম্পানির কর্মচারীরা খাবার দিয়ে গেল। হালকা খাবার। ভালই লাগল। রাত হচ্ছে। এবার শোওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। রাত ন'টার পরে যে কোনো যাত্রী ইচ্ছে করলে তাঁর নিজস্ব জায়গায় শুতে পারেন। কিন্তু সেটা করতে হলে ভদ্রমহিলাকে বলা দরকার। ওঁকে ওপরে উঠে যেতে হবে।

কিন্তু কথাটা বলতে পারলেন না চিত্তপ্রিয়। তার বদলে নিজের বিছানা ওপরে করে নিলেন। টয়লেট থেকে ঘুরে এসে ওপরে উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নিচের বার্থ না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু, আপনার ওপরে উঠতে অসুবিধা হতে পারে ভেবে—।'

'ধন্যবাদ।'

চিত্তপ্রিয় কোনো কথা না বলে ওপরে উঠে এলেন। বালিশে মাথা রেখে সরমার গলার স্বর মনে করার চেষ্টা করলেন। চল্লিশের বেশি বছর আগে একটি তরুণীর কণ্ঠস্বর কি রকম ছিল আজ আর কিছুতেই মনে এল না। তবে নীচে যিনি বসে আছেন, তিনি অবশ্যই সরমা নন।

সকালবেলায় আবার মুখোমুখি। দু-একটা কথা হয়েছিল। প্ল্যাটফর্ম থেকে চা-ওয়ালাকে ডেকে ভাঁড়ে চা নিয়েছিলেন চিত্তপ্রিয়। মহিলাও চা চেয়েছিলেন। খুব সামান্য সাধারণ কথা এবং চিত্তপ্রিয়র আর কোনো সন্দেহ রইল না। তিনি স্বাভাবিক হলেন। ট্রেন দ্রুত গতিতে ছুটছিল। ক্রমশ আলাপ হলো। ভদ্রমহিলা প্রতিবছরই বের হন। ছেলে টিকিট কেটে ট্রেনে চড়িয়ে দেয়। ট্যুরিস্ট কোম্পানির সঙ্গে ঘুরলে কোনো চিন্তা থাকে না। যতদিন স্বামী জীবিত ছিলেন ততদিনই নিজেরাই ঘুরেছেন। একমাত্র ছেলে, বড় চাকরি করে, তার সময়ের খুব অভাব। চিত্তপ্রিয় নিজের কথা বললেন। ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'এবার দেখবেন এটাই আপনার নেশা হয়ে যাবে। আমার তো ভারবতবর্ষ এদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'আপনি কি চিরকালই কলকাতায় আছেন?' চিত্তপ্রিয় জিজ্ঞাসা করলেন।

'না। বিয়ের পর এসেছি।'

'ও। বাবা বাইরে থাকতেন?'

'হ্যাঁ। জামসেদপুরে।'

শোনামাত্র নড়েচড়ে বসলেন চিত্তপ্রিয়। জামসেদপুর? সেকি! তাহলে এই কি সরমা? তিনি একটুও বুঝতে পারেননি? বুকের ভেতর বাতাস ধাক্কা মারছে। তিনি বললেন, 'আমিও একসময় জামসেদপুরের সাকচিতে থাকতাম।'

'আচ্ছা! কবে?'

'অনেককাল আগে। কলেজে পড়ার সময়।'

'আমি স্কুল শেষ করেই শ্বশুরবাড়িতে চলে এসেছি।'

'ও। কিছু মনে করবেন না। আপনার নাম কি সরমা?'

'না তো। আমি কনক, কনকলতা মুখার্জী।'

বাতাসটা বুক থেকে বেরিয়ে গেল এক নিমেষেই। চিত্তপ্রিয় বললেন, 'ও। আমার নাম চিত্তপ্রিয় দত্ত। একসময় সাকচিতে খুব ক্রিকেট খেলতাম।'

ভদ্রমহিলার কপালে ভাঁজ পড়ল। যেন মনে করার চেষ্টা করলেন, 'আমার দাদাও খুব ক্রিকেট খেলত। অনিল ব্যানার্জী।'

'আরে, অনিল আপনার দাদা? আমরা দুজনে ওপেন করতাম।'

'তাই?'

'অনিল এখন কোথায়?'

'আমেরিকায়। ওখানেই সেট্‌লড। দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনি কি একবার একটা মেয়ের মাথা বল মেরে ফাটিয়ে দিয়েছিলেন?'

চিত্তপ্রিয় লজ্জা পেলেন, 'আমি ইচ্ছে করে ফাটাইনি। বলটা উড়ে গিয়ে পড়েছিল।'

'দাদার কাছে শুনেছি। তারপর মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, তাই না?'

'বাঃ, এত কথা মনে রেখেছেন?'

'মনে যে ছিল, তা নিজেই জানতাম না। অল্প বয়সের ব্যাপার একটু খুঁচিয়ে দিলে আপনি উঠে আসে। দাদারা চাঁদা তুলেছিল আপনাদের জন্যে, এটা মনে আছে। কারণ আমাকে জমানো টাকা থেকে দশ টাকা দিতে হয়েছিল। সে সময় দশ টাকার প্রচুর দাম ছিল।' কনকলতা হাসলেন, 'তা তিনিই আপনার সঙ্গে এতদিন—।'

'না। তার বিয়ে হয়েছিল অন্য জায়গায়।'

'সেকি! কেন?'

'সে সময় আমার রোজগার ছিল না।'

'আচ্ছা!'

'তখন মেয়েরা এভাবে ছেলেদের সঙ্গে বেরুতে সাহসও পেত না।'

'তা ঠিক। এই যে আমি একা যাচ্ছি, কতজনের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, যেমন আপনার সঙ্গে গল্প করছি চলন্ত ট্রেনে বসে, তা নিয়ে কেউ কিছু ভাববেও না। কেন বলুন তো?

'বোধহয় বয়সের জন্যে।'

কনকলতা বললেন, 'তার মানে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সব কিছু শেষ হয়ে যায়?'

চিত্তপ্রিয় হাসলেন, 'মানুষ সেরকম ভাবতে পছন্দ করে। এই যে আপনি একা ট্রেনে যেতে যেতে আমার সঙ্গে গল্প করছেন, কুড়ি বছর বয়সে পারতেন?'

'তখন ভাল মন্দের তফাৎ তেমন করে বুঝতাম না। নিজের দায়িত্ব নিতে পারতাম না, তাই আড়ষ্টতা ছিল। এখন তো সেই সমস্যা নেই।'

'আপনার যুক্তি এটা। আত্মীয়স্বজন তখন যে আশঙ্কা করত এখন সেটা করবে না।'

কনকলতা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। বোঝা গেল তিনি এখন কথা বলতে চাইছেন না। কিন্তু তাঁর মুখের আদলের সঙ্গে খুব মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন চিত্তপ্রিয়। একটা তরুণীর টানটান মুখে কতটা চর্বি এবং বয়স মিশিয়ে দিলে এই মুখ হয় জানা নেই, কিন্তু তাঁর মনে হতো সরমাকে এতদিন পরে দেখলে কি তিনি চিনতে পারতেন না? অসম্ভব।

হরিদ্বারে নামার পর ট্যুর কোম্পানির লোকেরা তাঁদের একটা ভাল হোটেলে নিয়ে গেল। চিত্তপ্রিয় আগেই বলে রেখেছিলেন তাঁর আলাদা ঘর চাই। সেই ব্যবস্থা হলো। দু'রাত কনকলতার মুখোমুখি থাকার পর চিত্তপ্রিয়র একটু খারাপ লাগছিল এখন। যদিও সেই সংলাপগুলোর পর তাঁদের আর তেমন কথাবার্তা হয়নি। তবু কনকলতার উপস্থিতি তাঁর ভাল লেগেছিল। কনকলতা এই হোটেলেই আছেন। তাঁর ঘর আলাদা। এ ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া অশোভন বলেই চিত্তপ্রিয় সেই চেষ্টা করলেন না।

সারাটা দিন একা-একাই ঘুরলেন তিনি। বিকেলে গঙ্গার ধারে হাঁটতে হাঁটতে নানান রঙ্গ দেখলেন। রঙ্গ বলেই মনে হচ্ছিল। এক প্রৌঢ়া কপালে তিলক এঁকে বাজনা বাজিয়ে রামায়ণ গান করছেন, পাশেই গীতা পাঠ হচ্ছে। সর্বত্র বুড়োবুড়িদের ভিড়। গ্যাসের আলো জ্বলছে কথকদের সামনে। হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের কাছে চলে এলেন তিনি। কনকলতাকে কোথাও দেখতে পেলেন না।

সন্ধ্যে নাগাদ তাঁর শীত-শীত করতে লাগল। তারপরেই দুটো পা দুর্বল হয়ে পড়ল। শরীর ভাল বোধ না হওয়ায় হোটেলে ফিরে এলেন তিনি। হরিদ্বারে এখনও ঠাণ্ডা তেমনভাবে পড়েনি, তবু লেপের তলায় ঢুকেও শীত করছিল। চিত্তপ্রিয় বুঝতে পারছিলেন তাঁর জ্বর আসছে। অনেক অনেকদিন পরে অসুস্থ হচ্ছেন তিনি।

রাত্রে কোম্পানির লোক খাবার দিতে এসে জানল তাঁর অসুস্থতার কথা। তখনই ডাক্তার ডেকে আনা হলো। জানা গেল চিত্তপ্রিয়র শরীরের তাপ তিন ছাড়িয়ে গেছে। ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। ঘুম ভাঙল যখন তখন সমস্ত শরীরে ব্যথা। মুখ বিস্বাদ। গায়ে জ্বালা। চোখ খুলতেই কয়েকটা মুখ। কোম্পানির ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম লাগছে?'

ভাল না বলতে গিয়েও বললেন না চিত্তপ্রিয়। চোখ সরালেন। অবাক হয়ে দেখলেন কনকলতা রয়েছেন এ ঘরে। ম্যানেজার বললেন, 'ডাক্তারের মতে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু

আমরা তো কাল পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাব। এ অবস্থায় ওঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা ছাড়া কোনো পথ নেই। ওঁর পক্ষে একা ফিরে যাওয়া তো সম্ভব নয়।'

চিত্তপ্রিয় তারপরের কথাবার্তা শোনেননি। ঢেউ-এর মতো ঘুম এসে ডুবিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। বিকেল নাগাদ আবার সেই ঘুম ভাঙল। টয়লেট যাওয়া দরকার। উঠতে যেতেই বাধা পেলেন, 'কি হলো?'

কোনোরকমে মুখ ফেরাতে কনকলতার দেখা পেলেন। ঘরের কোণে চেয়ারে বসে আছেন কনকলতা। চিত্তপ্রিয় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি?'

'আপত্তি আছে আমি থাকলে?'

'না, কিন্তু—।'

'টয়লেট যাব।'

'পারবেন?'

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন চিত্তপ্রিয়। কাছে তাঁর বাহু শক্ত করে ধরলেন কনকলতা, 'ইস, জ্বর দেখছি এখনও কমেনি। কি করে বাধালেন?' .

'বেধে গেল।'

টয়লেটের দরজা পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিলেন কনকলতা। সাবধান হতে বললেন। টয়লেট সেরে ফিরে আসার পর ভদ্রমহিলা আবার যত্ন করে তাঁকে শুইয়ে দিলেন, 'এবার একটু মুখে দিতে হবে। তারপর ওষুধ।'

'আমাকে হাসপাতালে কখন নিয়ে যাবে?'

'কেন? সেখানে যাওয়ার খুব শখ আছে বুঝি?'

'তা নয়। আপনারা তো কাল চলে যাবেন?'

'যেতাম। কিন্তু এই অবস্থায় আমি যেতে পারছি না।'

'আপনি আমার জন্যে থেকে যাবেন?'

'কথা বলবেন না। নিন, এই ফলের রসটুকু খেয়ে নিন। কি রকম ডাক্তার এখানকার জানি না, দুদিনেও জ্বর কমাতে পারল না।'

অনেক অনেকদিন পরে কারও সেবা পেলেন বলে মনে হলো তাঁর। চিত্তপ্রিয় কনকলতার মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু তাঁর কথা বলার শক্তি কমে আসছিল। নিস্তেজ, দুর্বল হয়ে কনকলতার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হলো তিনি যেন সরমাকে দেখছেন। কিন্তু সরমা কি এরকম দেখতে হয়েছে এখন? চোখ বন্ধ করলেন চিত্তপ্রিয়।

তৃতীয় দিনে ডাক্তারের নির্দেশে চিত্তপ্রিয়কে হাসপাতালে যেতে হলো। ট্যুরিস্ট কোম্পানি অন্যদের নিয়ে বেরিয়ে গেল তাদের প্রোগাম মতো। কনকলতা গেলেন না। হোটেল ছেড়ে তিনি একটি আশ্রমে উঠে গেলেন। দুবেলা হাসপাতালে আসেন, ফল ওষুধের ব্যবস্থা করেন। একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে আসা যাওয়া।

একদিন, চিত্তপ্রিয় যখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ তখন সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আমার জন্যে এত করছেন কেন?'

কনকলতা হাসলেন, 'অনেকে দিতে কার্পণ্য করে বলে জানতাম, কেউ কেউ নিতেও কুণ্ঠিত হয়, তা আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি।'

'কুণ্ঠা কি অকারণে?'

'হ্যাঁ। আপনি আমার দাদার বন্ধু ছিলেন। বিদেশ বিভুঁই-এ আপনি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন দেখে আমি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাই কি করে? যদি আপনার পরিচয় না জানতাম তাহলে অন্য কথা ছিল।'

'কিন্তু আমার জন্যে আপনার বেড়ানো হলো না যে।'

'অনেক কিছুই তো জীবনে হয়নি।'

'আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।'

'কী'

'আপনি সরমা!'

'পাগল। আমি সরমা হতে যাব কোন দুঃখে। আপনি তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন, সে সেই স্মৃতি নিয়ে থাকুক। আমি কেন সরমা হব।'

ট্যুরিস্ট কোম্পানি ফিরে আসার আগে সম্পূর্ণ সুস্থ হননি চিত্তপ্রিয়। ফেরার সময় এক ট্রেন, কিন্তু আগের মতো মুখোমুখি আসন নয়। কনকলতা বসেছেন তিনটে কুপের ওপাশে। ব্যবস্থাটা কে করল তা চিত্তপ্রিয় জানেন না। তাঁর সামনে বসা বৃদ্ধকে তিনি জায়গা বদল করার কথা লজ্জায় বলতে পারলেন না।

হাওড়া স্টেশনে নামার পর কনকলতা কাছে এলেন, 'একা যেতে পারবেন?'

'পারব।'

'তাহলে চলি।'

চিত্তপ্রিয় কিছু বলার আগে এগিয়ে আসা এক যুবককে দেখালেন কনকলতা, 'আমাকে নিয়ে যেতে এসে গিয়েছে। ভাল থাকবেন।'

'আমি কিন্তু ঠিকানাটা জানলাম না।'

কনকলতা হাসলেন, 'কি দরকার। চলি।'

কনকলতা চলে গেলেন, প্ল্যাটফর্মে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন চিত্তপ্রিয়। ঠিকানা তিনি ইচ্ছে করলে পেতে পারেন। ট্যুর কোম্পানির খাতায় নিশ্চয়ই ওঁর ঠিকানা লেখা রয়েছে। কিন্তু, সত্যি তো, ঠিকানা নিয়ে তিনি কি করবেন? কনকলতা যদি সরমাই হয় তাহলেই বা কি করা যেতে পারে। হ্যাঁ, তিনি প্রশ্নটা করতে পারেন. কেন সেই দিন স্টেশনে এল না? উত্তর যাই হোক তাতে তো এখন আর জীবন বদলাবে না।

গোমুখে যে জল পবিত্র, হরিদ্বারে যার স্পর্শে শান্তি সেই গঙ্গার জল কালীঘাটে শুধু দুর্গন্ধ ছড়ায়। বয়ে-আসা নদীকে কেউ আর ছেড়ে-যাওয়া ঘাটে ঘাটে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এরই নাম জীবন। বেঁচে থাকতে হলে এই সত্যিটা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

দি ন যা প ন

রাত ৯টায় রাতের খাবার শেষ করেন নির্মলেন্দু। টেবিলের ওপাশে স্ত্রী বসে থাকেন চুপচাপ। খাওয়া শেষ হলে দশ মিনিট ছাদে হেঁটে এসে বিছানায় চলে যান। আজ একটু অন্যরকম হল। স্ত্রী বললেন, 'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

নির্মলেন্দু ওষুধ কোম্পানীর জাঁদরেল সাহেব ছিলেন। ছয়মাস আগে অবসর নিয়েছেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। স্ত্রী কিন্তু কিন্তু করে বললেন, 'রোজ সিনেমায় না গেলেই কি নয়?'

নির্মলেন্দু সোজা হলেন। খানিক চোখ বন্ধ রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার কে বলল?'

'ছোটখোকা।' স্ত্রী নিচু গলায় জানালেন।

'হুম।' উঠে গেলেন নির্মলেন্দু। হাতমুখ ধুয়ে সোজা অন্ধকার ছাদে। এখনও ছেলেরা বাড়ি ফেরেনি। সল্টলেকের এই বাড়ি তাঁরই টাকায় তৈরি। বড় ছেলের স্ত্রী এই বাড়িতে থাকতে চান না। কিন্তু তাঁর স্বামীর জন্য সেটা পারছেন না। ছোট ছেলে এখনও বিয়ে করেনি। করলে একই অবস্থা হতে পারে।

এখন প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃভ্রমণে যান নির্মলেন্দু। সাদা কেডস্ এবং শর্টস গেঞ্জি পরে। ফিরে এসে চা খান, কাগজ পড়েন এবং বাথরুমে ঢোকেন। দাড়ি কামানো, স্নান সেরে এসে একবারে তৈরী হয়ে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে যান। ঠিক নটা নাগাদ পুরোদস্তুর পোশাক পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ফেরেন ঠিক ছটায়। বাড়ি ফিরে পরিষ্কার হয়ে এক কাপ চা আর সামান্য কিছু খেয়ে বই নিয়ে বসেন। রাত নটায় রাতের খাবার। স্ত্রী বলেছিলেন অবসর নেবার পর নিত্যদিন এভাবে বেরুনো কেন? তিনি কি নতুন করে কোথাও চাকরি নিয়েছেন? জবাব দেননি নির্মলেন্দু। চাকরি যতদিন ছিল ততদিন কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করার সাহস স্ত্রীর ছিল না।

আগে অফিসের গাড়ি আসতো দরজায়। এখন হেঁটে টার্মিনাসে যান। প্রয়োজন হলে দুটো বাস ছেড়ে দিয়ে লাইনে দাঁড়ান সিট পাবার জন্যে। ডালহৌসিতে নেমে ধীরে ধীরে ফুটপাত ধরে চক্কর মারেন কয়েকটা। এতবছর এ পাড়ায় এসেছেন কিন্তু ডালহৌসিটাই ভাল করে দেখার সুযোগ পাননি। এখন দেখছেন। ফুটপাতে মানুষ হাঁটতে পারে না। এত ভাঙাচোরা, নোংরা জানা ছিল না। রাজভবনের দিকটায় তবু হাঁটা যায়। এগারটা নাগাদ তিনি ইডেন গার্ডেনে পৌঁছে যেতেন। সেখানে বসে থাকতেন ঠিক পাঁচটা পর্যন্ত। সেই ছেলেবেলায় তিনি ইডেনে আসতেন মিলিটারিদের ব্যাণ্ড শুনতে। আর আসা হয়নি। প্যাগোডার কি দুরবস্থা। তবু

গাছপালার মধ্যে বসে থাকাটা খুব খারাপ লাগত না। আশেপাশের গাছতলায় রোজ নতুন নতুন প্রেমিক-প্রেমিকার ভিড়। সবাই নিম্ন অথবা মধ্যবিত্ত। স্কুলের মেয়েও আছে। প্রথম প্রথম খুব রাগ হত। একটানা সকাল এগারটা থেকে সমানে প্রেম করে গেলে দেশ তাদের কাছে কি পাবে? শেষ পর্যন্ত এসব উপেক্ষা করেছিলেন। তখন ঘুম আসত। ঘুমালে সময় দিব্যি চলে যেত।

এক রাত্রে স্ত্রী বললেন, 'বড় খোকা খুব রাগ করছিল।'

'কেন? তার আবার কি হল?'

'তুমি দুপুরে ইডেন গার্ডেনে গিয়েছিলে?'

হকচকিয়ে গিয়েছিলেন নির্মলেন্দু। উত্তরের অপেক্ষা না করে স্ত্রী বলে গেলেন, 'ওর অফিসের লোকজন কি সব সার্ভে করার জন্য ওখানে গিয়েছিল। তাদের একজন তোমাকে চিনতে পারে। তুমি ঘুমোচ্ছিলে বলে ডাকেনি। বড় খোকা বলছিল, কাজকর্ম নেই যখন তখন বাড়িতেই ঘুমালে ভাল হয়।'

চোয়াল শক্ত হয়েছিল নির্মলেন্দুর কিন্তু মুখে কিছু বলেননি। তবে রোজ বেরিয়ে যাওয়ার পিছনে যে রহস্য ছিল তা এদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়াতে একটু খারাপ লেগেছিল। কিন্তু পরের দিনও ঠিক নটায় সেজেগুজে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। হাঁটাহাঁটি করে মেট্রো সিনেমায় দুপুরের ছবি দেখে সময় কাটালেন ভালভাবে। কিন্তু কি ছবি? চোখ খোলা রাখতে ইচ্ছে করছিল না। তবে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে তাঁকে চিনে ফেলবে কেউ এমন সম্ভাবনা নেই বলে প্রতিদিন বাড়ি ফেরার আগে ধর্মতলা অঞ্চলের সমস্ত সিনেমার নুন এবং ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট আগাম কেটে ফেলতে লাগলেন।

একবার না জেনে কাটার ফলে সোসাইটি প্রেক্ষাগৃহের তামিল ছবিতেও গিয়েছিলেন তিনি, তবে চোখ বন্ধ করে বসে থাকলে ছবি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। তখন ছবি সামনে নেই আর শব্দ ধীরে ধীরে কান থেকে সরিয়ে ফেললেই চমৎকার ঘুম, শুধু সতর্ক থাকতে হয় যাতে পাশের লোক সেটা বুঝতে না পারে। দুবার এই অবস্থায় তাঁকে কিঞ্চিত কথা শুনতে হয়েছে। কি মশাই, টিকিট কেটে হলে এসে ঘুমাচ্ছেন?

আজ ছাদে পায়চারি করতে করতে ঠোঁট কামড়ালেন নির্মলেন্দু। ওরা কি খুব হাসাহাসি করছে এই নিয়ে? তিনি যে সিনেমায় গিয়েছেন তা ছোট খোকা জানল কি করে? কাজ ফেলে সেও যাচ্ছে নাকি? ওই বয়সের ছেলেদের বেলা বারোটার শোয়ে তিনি দেখেছেন বটে কিন্তু তাঁর ছেলে—! স্ত্রী বললেন, রোজ রোজ না গেলে নয়? রোজ যে যাচ্ছেন এই তথ্য কোথায় পেল ওরা।

পরদিন ঠিক নটায় বের হলেন নির্মলেন্দু। বেরুবার আগে মনে হচ্ছিল প্রথমে স্ত্রী, পরে ছোট খোকা তাঁকে কিছু বলবে। কিন্তু তিনি মোটেই আমল দিলেন না। গম্ভীর মুখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে টার্মিনাসে চলে এলেন। এবং সেখানে হরিপদবাবুর সঙ্গে দেখা। খুব বিচলিত অবস্থা

ভদ্রলোকের। পাড়ার লোকদের সঙ্গে এতকাল নিরাপদ দূরত্ব রাখতেন তিনি। রাসভারী অফিসার হিসেবে সবাই তাঁকে জানে। তবু হরিপদবাবু কথা বললেন, 'রায়সাহেব, আপনার সঙ্গে কি মেডিক্যাল কলেজের কারো চেনা আছে?'

'মেডিক্যাল কলেজ? কেন?' অবাক হলেন নির্মলেন্দু।

'আর বলবেন না, আমার ভাই ওখানে কাল রাত্রে ভর্তি হয়েছে। হঠাৎ হার্ট এ্যাটাক, মাঝ রাতে, ভোরে জেনে এসেছি এমার্জেন্সিতে ফেলে রেখেছে, বললে কোন বেড খালি নেই, কি যে করি!' হরিপদবাবু বিচলিত।

মনে মনে মেডিক্যাল কলেজের কাউকে খুঁজে পেলেন না নির্মলেন্দু। হ্যাঁ, বেলভিউ বা ক্যালকাটা হসপিটাল হলে এখনই দু'দশটা নাম বলে দিতে পারতেন। তাঁর পর্যায়ের অফিসারদের ওসব জায়গায় ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। হরিপদবাবুর দিকে তাকালেন তিনি। ওষুধ কোম্পানীর বড়কর্তা হিসেবে অনেক বিখ্যাত ডাক্তারকে তিনি চিনতেন। বললেন, 'চলুন দেখি।'

হরিপদবাবু অবাক, 'আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?'

'আপনি বিপদে পড়েছেন, তাই না?'

আজ রুট বদল করতে হবে। পকেটে নুন শোয়ের টিকিট যা তিনি অ্যাডভান্স কেটেছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের সামনে নামতে প্রচণ্ড কষ্ট হল। এত ভিড় ঠেলে গুঁতোগুঁতি করে কখনও নামেননি তিনি। হরিপদবাবু বারংবার বলছিলেন তাঁর জন্যে নির্মলেন্দুর খুব কষ্ট হচ্ছে। নির্মলেন্দু কিছু বললেন না।

এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকে নির্মলেন্দু হতবাক। এই নোংরা পরিবেশে প্যাসেজের মধ্যে পাশাপাশি কিছু অসুস্থ মানুষকে ফেলে রেখেছে ওরা। একটি স্বাধীন আধুনিক রাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা! সারা জীবন আয়কর দেওয়া একটা লোক এখানে এসে সরকারের কাছ থেকে একটু ভাল পরিবেশ আশা করতে পারে না? হরিপদবাবুর ভাইয়ের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রমহিলা হাওয়া করছেন। সম্ভবত স্ত্রী। কাতর গলায় বললো, সকালে বড় ডাক্তার রাউণ্ডে এসে একবার দেখে গিয়েছেন কিন্তু চিকিৎসা তেমনভাবে শুরু হয়নি। নির্মলেন্দু বুঝলেন এদের লোকবলও নেই। ঠিক তিন হাত দূরে শোওয়া এক রুগী এমনভাবে কঁকিয়ে উঠল যে তিনি প্রায় ছিটকেই বাইরে চলে এলেন।

রুমালে ঘাড় মুছলেন নির্মলেন্দু। দরিদ্র মানুষেরা তাদের আত্মীয়দের সুস্থ করতে এসে ভিড় জমিয়েছেন চারপাশে। কি করা যায়? নির্মলেন্দু হাঁটতে হাঁটতে একটা বোর্ড দেখে ভেতরে ঢুকলেন। দুজন বসেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন বড়কর্তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে কি করতে হয়? একজন ভেতরের দরজা দেখালো, 'ওখানে আর. পি. আছেন। চলে যান।'

নির্মলেন্দু সেই দরজায় পৌঁছে ইংরেজীতে প্রশ্ন করলেন, 'ভেতরে আসতে পারি?'

মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আর একজনকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, মুখ ফিরিয়ে মাথা নাড়লেন। নির্মলেন্দু ভেতরে ঢুকে বললেন, 'আমি নির্মলেন্দু রায়। কিছুদিন আগেও চাকরি করতাম। এখন অবসরপ্রাপ্ত নাগরিক। আপনি?'

'আমি এই হাসপাতালের রেসিডেন্সিয়াল ফিজিসিয়ান। কোন সমস্যা থাকলে বলতে পারেন। বলুন।'

'গুড। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের ভাই গত রাত্রে অসুস্থ হয়ে এই নরকে পড়ে আছেন। তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব কি?'

আর. পি. হাসলেন, 'সুচিকিৎসা নিশ্চয়ই করা হবে বা হচ্ছে। তবে আপনি যাকে নরক বললেন সেটাকে স্বর্গে পরিণত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যখন সমস্ত দেশ, এই শহরটা বিশৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে তখন আমার একার চেষ্টায় হাসপাতালে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।'

'বাট ইউ আর পেইড ফর দ্যাট।'

'ঠিকই। কিন্তু দশটা সিটের হাসপাতালে যদি একশ'টা রুগী আসেন তাহলে হয় নব্বইজনকে ফিরিয়ে দিতে হয়, নয় তাঁদের চিকিৎসার সুবিধে দেবার জন্যে এই ব্যবস্থা মানতে হয়। যারা এখানে কাজ করেন তারা যদি মনে করেন অন্য পাঁচটি সরকারি চাকরির সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই তাহলে পরিবেশের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। কি হয়েছে আপনার পেসেন্টের?'

'শুনলাম হার্ট এ্যাটাক হয়েছে।'

আর. পি. উঠলেন। নির্মলেন্দুকে নিয়ে সোজা পৌঁছে গেলেন হরিপদবাবুর ভাইয়ের কাছে। পরীক্ষা করলেন। তারপর একটু এগিয়ে আর একটা ঘরে পৌঁছে হাউস সার্জেনকে ডেকে প্রশ্ন করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নির্মলেন্দুকে বললেন, 'আমি আপনাকে এটুকু বলতে পারি চিকিৎসার ত্রুটি হচ্ছে না। আমাদের কাছে যথেষ্ট ওষুধপত্র আছে। যদি অন্য কিছু পরীক্ষার দরকার হয় তবে আপনারা তাতে সাহায্য করবেন। হাসপাতালেও ব্যবস্থা আছে কিন্তু আনঅফিসিয়ালি করলে ব্যবস্থা দ্রুত নেওয়া যাবে। আর পেসেন্টের যা কণ্ডিশন তাতে নাড়াচাড়া করা ঠিক নয়। একটু ভাল বুঝলে বেডের কথা ভাবা যাবে। নমস্কার!' আর. পি. চলে গেলেন।

হরিপদবাবু সব শুনছিলেন। এবার গদগদ গলায় বললেন, 'উঃ, তবু স্যার আপনার জন্যে এসব শুনতে পেলাম। আমি তো থৈ পাচ্ছিলাম না।'

সারাটা দিন হরিপদবাবুর ভাইকে নিয়ে কেটে গলে। অসুস্থ মানুষের চিকিৎসায় সাহায্য করতে প্রচুর উৎসাহ দরকার। নির্মলেন্দু সেটা দেখালেন। এবং এরই মধ্যে আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ, যাঁর স্ত্রী এমার্জেন্সিতে ভর্তি হয়েছেন সাতদিন জ্বরে ভুগে। বুকে নিমোনিয়া

হয়েছে। লোকবল নেই। ডাক্তার তাঁর রক্ত পরীক্ষা করতে দিয়েছেন। তিনি সেটা জমা দিতে তালতলায় গেলে রুগী একা পড়ে থাকবেন। নির্মলেন্দু আগবাড়িয়ে সেটা নিয়ে ছুটলেন। বিকেলে দুই রুগী নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করলেন তিনি। দেখা গেল দুটি পরিবারের সঙ্গে একদিনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন নির্মলেন্দু। বিকেলে আত্মীয়াকে দেখতে আসা ভিজিটররা তাঁকেই প্রশ্ন করছেন অসুস্থতা সম্পর্কে। সারাটা দিন বেশ উন্মাদনার সঙ্গে কেটে গেল। ক্রমশ মেডিক্যাল কলেজের নোংরা পরিবেশ অভ্যেসে এসে যাচ্ছিল। তিনি দেখলেন এখানকার হাউস সার্জেন, ডাক্তার, পেসেণ্ট নিয়ে খুব ভাবেন। একটি দাড়িওয়ালা হাউস সার্জেনের কাজ দেখে তিনি তো মুগ্ধ।

আজ বাড়িতে ফিরতে দেরি হল। গম্ভীর মুখে বাথরুমে ঢুকে গেলেন তিনি। স্নান করলেন। খুব ক্লান্ত লাগছিল। কাল ওই ভদ্রমহিলার রিপোর্ট পাওয়া যাবে। সকালে সরাসরি তালতলায় চলে যাবেন তিনি রিপোর্ট নিতে। একটা বাচ্চা ছেলে ভর্তি হয়েছে। নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। কেসটা কি?

রাত্রে খাবার খেতে বসলেন তিনি। স্ত্রী সামনে। এই সময় হরিপদবাবু এলেন। স্ত্রী উঠে গেলেন। ফিরে এসে জানালেন, 'হরিপদবাবু এসেছেন। ওঁর ভাইকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে গিয়েছে বললেন।'

'উনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন?' নির্মলেন্দু জানতে চাইলেন।

'না। কি ব্যাপার?'

নির্মলেন্দু অনেকদিন বাদে হাসলেন, 'তোমার খোকারা এখন থেকে আর আমার ঠিকানা খুঁজে পাবে না! দিন কাটাবার চমৎকার উপায় খুঁজে পেয়েছি আমি। বুঝলে?'

দু ই ম লা টে র গ ল্প

বাঙালিরা বিদেশে বেড়াতে গেলে যাঁদের সঙ্গে জানপয়চান হয় তাঁদের অধিকাংশই বাঙালি, কিন্তু ভারতের অন্য প্রদেশের মানুষ থাকতে কিন্তু যে দেশে বেড়াতে গেছেন সেই দেশের মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতা হচ্ছে এমন ঘটনা খুব একটা দেখা যায় না। এর অনেগুলো কারণের প্রধান হল পরিচিত কোন বঙ্গসন্তানের বাড়িতে উঠে তাঁরই সাহায্যে দেশ দেখা। প্রধানত বড় শহরের মানুষেরা নিজেদের একটু গুটিয়ে রাখেন। সেক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য স্থান দেখতেই বেড়ানোর সময় চলে যায়।

এই লেখকের পায়ের তলায় যখন সরষে জমল তখন একদিন সে হাজির হয়েছিল লণ্ডন থেকে অনেক দূরে বোষ্টন নামের এক গ্রামে। সেই গ্রামের একটি বর্দ্ধিষ্ণু হোটেলের মালিক আমাদের বঙ্গসন্তান পাল। মোগলাই রান্না তার রেস্টুরেন্টের বৈশিষ্ট্য। বোস্টনে দ্বিতীয় কোন বাঙালি ছিল না। ভারতীয় খুব কম। সাহেব মেমরা দলবেঁধে প্রতি রাত্রে সেই রেস্টুরেন্টে ভারতীয় খাবার খেতে আসত। কে বলে ঝাল অথবা মশলা সাহেবরা পছন্দ করে না। আমি তো তাদের চিকেন চাপ চেটেপুটে খেতে দেখেছি। পাল ছিল তখন একা। আমি ওর অতিথি। গ্রামটি ছোট। আমাদের কালিম্পং শহরের মত। নামেই গ্রাম। কিছুদিন থাকলেই সবার চেনাজানা হয়ে যায়। পালের রেস্টুরেন্ট দিনের বেলায় বন্ধ থাকত। কারণ তখন কারো খাওয়ার সময় নেই। সোম থেকে বৃহস্পতি সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত বারোটা আর শুক্র শনিবার ভোর তিনটে পর্যন্ত রেস্টুরেন্ট গমগম করত। দিনের বেলায় আমি ঘুরে বেড়াতাম পাবে পাবে, কফিখানায়। এইরকম এক রাত্রে পালের রেস্টুরেন্টে আমার সঙ্গে আলাপ সাইমনের।

পালের রেস্টুরেন্টে একজন ডোরকিপার থাকত। ব্যায়াম করা চেহারা। কোন খদ্দের ঝামেলা করলে সে হাত চালাত। আমার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল লোকটার। এক সন্ধ্যায় সে আমাকে বলল, 'সাইমেনর সঙ্গে আলাপ হয়নি?'

'কে সাইমন?'

'ওই যে কোণের দিকে বসে আছে সুন্দরীকে নিয়ে।'

দেখলাম। ব্রিটিশ মহিলা সুন্দরী হলে সেটা সত্যি চোখে টানে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'লোকটার বিশেষত্ব কি। বউকে নিয়ে নিশ্চয়ই খেতে এসেছে।'

'বউ? ওর বউকে দেখলে তুমি ভিরমি খাবে। বিশাল চেহারা। ও রোজ এখানে আসে। ছয়দিন ছয় সুন্দরীকে নিয়ে। পালকে বলো, আলাপ করিয়ে দেবে।'

রেস্টুরেন্টটা এত বড় যে সব খদ্দেরকে রোজ দেখা মুস্কিল। ভদ্রলোক আমায় আকর্ষণ করলেন। প্রতি সন্ধ্যায় একজন সুন্দরী ওঁকে ডিনার খেতে সঙ্গ দেন, ভাবাই যায় না। দূর থেকে দেখলাম মানুষটির বয়স চল্লিশের নিচে নয়। অর্থাৎ যুবক বলা চলে না।

পালকে বলতেই সে জানাল, 'সাইমন খুব দুঃখী। দুঃখী বলেই খুব হাসে।'

বললাম, 'দুঃখী মানুষ অত সুন্দরী পেয়ে দুঃখ ভুলে যাচ্ছে না কেন?'

পাল বলল, 'দুঃখ ক্যানসারের মত। কোন ওষুধেই সারে না। আসুন, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। কথা বললে ভাল লাগবে।'

সাইমনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে পাল ফিরে গেল কাউন্টারে। লোকটা পরিচয় জেনে হৈ চৈ করে উঠল, 'আরে আপনি গল্প লেখেন, বাঃ। এই প্রথম আমি কোন লেখককে দেখলাম। বসুন বসুন। লিজা, একটু সরে বসো, ওকে বসতে দাও।'

সুন্দরী হাসিমুখে সরলেন। বসলাম। সাইমন বলল, 'ভারত বলতে আমি জানি ইন্দিরা আর তাজমহল। ইন্দিরা খুব সুন্দরী ছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

হঠাৎ লিজা ঘাড় বেঁকালেন, 'আমার চেয়েও?'

হকচকিয়ে গেলাম, বললাম, 'ওঁর বয়স হয়েছিল। তুলনা করা ঠিক হবে না।'

'আমার কত বয়স বলে মনে হচ্ছে?'

কোন মহিলা, বিশেষ করে সুন্দরী মহিলার বয়স অনুমান করা বোকামি। সাইমন আমাকে উৎসাহিত করছিল অনুমানটা বলার জন্যে। কিন্তু কিন্তু করে বললাম, 'তিরিশ।'

তিনি হেসে উঠলেন এমন জোরে যে সবাই আমাদের দিকে ঘুরে তাকাল। লিজা কোনরকমে হাসি সামলে বললেন, 'আমি পঞ্চাশে দাঁড়িয়ে আছি। আমার বড়মেয়ের বয়স এখন আপনি যা বললেন তাই।

চমকে গেলাম। ভদ্রমহিলার চোখ মুখ, গলার চামড়ায় বয়স একটুও আঁচড় টানেনি। হেসে বললাম, 'আপনারা দুজনেই সমান সুন্দরী।'

প্রশংসা শুনলে কে না খুশী হয়। ইনিও হলেন। টুকটাক গল্প চলছিল। আমি ইচ্ছে করেই বললাম, 'সাইমন, আপনার স্ত্রী কিন্তু খুব সোজা কথা বলেন।'

লিজা হেসে উঠলেন। সাইমন মাথা নাড়লেন।

'না ভাই। লিজা আমার স্ত্রী হবে কেন? ওর স্বামী একটা গম্ভীরমুখো ব্যবসায়ী। এর কোন বন্ধু নেই। তাই আমি সঙ্গ দিচ্ছি। তা আপনি ইচ্ছে করলে লিজার বন্ধু হতে পারেন। আমার আপত্তি নেই। লিজা আজ তো তোমার স্বামী লণ্ডনে, নতুন বন্ধুকে নিয়ে যাবে নাকি?'

লিজা মাথা নাড়লেন, 'আগে আমি জিজ্ঞাসা করব ওঁর কজন বান্ধবী আছে?'

মজা লাগছিল, বললাম, 'খুবই দুর্ভাগ্য, একজনও নেই।'

লিজা বললেন, 'তাহলে দুঃখিত। আপনার নিশ্চয়ই কোন গলতি আছে।'

আমরা তিনজনেই হেসে উঠেছিলাম।

পরের রাত্রে সাইমনের সঙ্গে আবার দেখা। এদিন অন্য সুন্দরী। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি কি হে? কেন বললে বান্ধবী নেই। লিজার সঙ্গ হারালে।'

'বান্ধবী থাকাটা কি কৃতিত্বের?'

'নিশ্চয়ই। তাহলে তুমি ওকে বেশী বিরক্ত করবে না। বিবাহিতা মেয়েরা চায় না পুরুষ প্রেমিক সবসময় পেছনে ঘুরুক। তাদের তো স্বামী সংসারও দেখতে হয়।'

'আজকে যিনি এসেছেন তিনিও কি তোমার বান্ধবী?'

'হ্যাঁ। এ একটু গম্ভীর প্রকৃতির। স্বামী পুলিশ অফিসার।'

'তোমার সব বান্ধবীই বিবাহিতা?'

'হ্যাঁ ভাই। এতে ঝামেলা কম।'

'তার মানে?'

'বিয়ে করো বিয়ে করো বলে মাথা খারাপ করে না কেউ।'

'তোমার স্ত্রী?'

'দুঃখের কথা কি বলব ভাই, সে আমার বান্ধবী নয়।'

'তিনি এসব জানেন?'

'খু-উ-ব। রাত্রে বাড়ি ফিরলে তিনি খুশী হন এই বলে যতই হোক সে অন্যের বউ, রেস্টুরেন্ট সঙ্গ দেবে কিন্তু তোমার ঘর করবে না। কি আনন্দ পায় যে কি বলব!'

'বউকে ডিভোর্স করছ না কেন?'

'আর একজন বউ হতে না চাইলে কেউ পাকা বউকে হাতছাড়া করে? এই বয়সে কোন কচি অবিবাহিতা আমাকে ঝট করে বিয়ে করতে চাইবে না। এই বোস্টন গ্রামের সব কচি মেয়েই আমার কোন না কোন বান্ধবীর সন্তান। এই দুঃখ আমাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে ভাই।' সাইমন বলেছিল।

সাইমনের সঙ্গে আমার প্রায় বছর চারেক দেখা হয়নি। অবশ্য এর মধ্যে একবার আমি বোস্টনে গিয়েছিলাম। সাইমন তখন ব্যবসার কাজে বাইরে ছিল। তবে লোকটার কথা খুব মনে হত আমার। পাল বলেছিল লোকটা দুঃখী। কিন্তু কতটা দুঃখী আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু বাড়িতে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সপ্তাহে ছ'দিন বান্ধবী পায় যে মানুষ তার মত ভাগ্যবান আর কে আছে। সাইমনকে মনে পড়ত এই কারণেই।

হঠাৎ কিছুদিন আগে কলকাতার বাড়িতে টেলিফোনে যে বিদেশির গলা পেলাম সে সাইমন। আমি অবাক। পালের কাছ থেকে আমার টেলিফোন নম্বর নিয়ে এসেছে। তাজমহল দেখে কলকাতা এসেছে। কাল সকালের ফ্লাইটেই চলে যাবে। আজ রাত্রেই দেখা করতে চায়। সদর স্ট্রীটের লিটন হোটেলে উঠেছে।

গেলাম। দেখা হওয়া মাত্র জড়িয়ে ধরল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'একা?'

সাইমন গম্ভীর হয়ে গেল, 'হ্যাঁ, একাই। আমার বউ তো সঙ্গে আসবে না। আর আমার বান্ধবীদের স্বামী আছে, তারা কিভাবে এতদূরে আসবে।'

গল্প হল। হঠাৎ সাইমন বলল, 'তোমার বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।'

সাইমন লিজার ব্যাপারে খুব উদার হয়েছিল, মনে পড়ল। বললাম, 'আমার কোন বান্ধবী নেই। তবে তুমি আমার বাড়িতে যেতে পার ইচ্ছে হলে।'

'না। একটাই তো রাত। তুমি আমাকে নাইট লাইফ দেখাও।'

'কলকাতার নাইট লাইফ কি সোহো অথবা পিগ্যালের নাইট লাইফের সঙ্গে তুলনা করা চলে? পানসে লাগবে তোমার।'

সাইমন মানতে চাইল না। সে এদেশীয় রাতের জীবন দেখবেই। আমি পড়লাম ফাঁপড়ে। অনেক চেষ্টা করেও নিরস্ত করা গেল না। বাঈজীদের কথা শুনছে সে। তাদের গান শুনতে চায়।

অথচ কলকাতার বাঈজী পাড়ায় যাওয়ার রাস্তা আমার জানা নেই। হঠাৎ খেয়াল হল চন্দ্রদার কথা। আমি যখন সরকারি চাকরি করতাম তখন চন্দ্রদার ওসব ব্যাপারে কুখ্যাতি ছিল। লোকটাকে কিন্তু আমার ভাল লাগত। উত্তর কলকাতার বনেদী মানুষ। টেলিফোন ডাইরেক্টরী দেখে ফোন করলাম। চন্দ্রদাই ধরলেন। এতদিন পরে আমার গলা পেয়ে খুব খুশী। সমস্যাটা জানালাম ওঁকে। চন্দ্রদা বললেন, দ্যাখো ভাই, বাতের ব্যাথায় পঙ্গু হয়ে আমি বসে আছি। ও পড়ায় যাই না পাঁচ বছর। তবে বিদেশী এসেছে, দেশের সম্মান বলে তো একটা ব্যাপার আছে। আমি একজনকে ফোন করে দিচ্ছি, তার কাছে চলে যাও। লোকটার নাম লোকেন। আমাকে খুব ভক্তি করে। তবে হ্যাঁ, সাড়ে দশটার মধ্যে পাড়া থেকে বেরিয়ে এসো। দাঁড়াও, ওই সঙ্গে তোমাদের কথা থানায় বলে দিচ্ছি।'

'থানা?' আমি আপত্তি জানালাম।

'কোন চিন্তা নেই। লোকাল ওসি তোমার খুব ফ্যান।'

চন্দ্রদা যে ডিরেকশন দিলো সেইমত আমি সাইমনকে নিয়ে সোনাগাছির কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। শ্রদ্ধেয় গায়ক রামকুমার চট্টোপাধ্যায় কাছে যে কয়েকবার গিয়েছি সেই পথ ধরেই এক বাড়ির সামনে পৌঁছে লোকেনবাবুর নাম বলতে একটা লোক ওপরে নিয়ে গেল। বলেছিলাম বাঈজী পাড়ায় যাব, এ দেখছি একবারে বারবনিতাদের আস্তানা। দুপাশে রঙ মেখে দাঁড়িয়ে তারা। সাইমন চাপা গলায় বলল, 'এ কোথায় নিয়ে এলে? এদের কাছে আমি তো আসতে চাইনি।'

বললাম, 'আমার গাইড ভুল করেছে। চল, দেখা করেই ফিরে যাব।'

যে ঘরের দরজায় আমরা পৌঁছালাম সেটি বেশ বড়। খাটের ওপর বাবু হয়ে বসে আছেন যিনি তিনিই লোকেনবাবু। পাকানো চেহারা। বছর ষাটেকের। এক ফোঁটা মেদমাংস নেই। হাতজোড় করে বললেন, 'আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য, চন্দ্রদার লোক আপনারা, ভাবা যায় না। বসুন বসুন।'

দুটো চেয়ার আছে খাটের পাশে, বসলাম। বললাম, 'দেখুন, চন্দ্রদাকে বলেছিলাম এই সাহেবকে বাঈজীদের গান শোনাব—।'

'সব মরে গেছে। কলকাতায় বাঈ-কালচার আর নেই। কি আফশোষ, আজ আমার ওয়াইফ দেশে গেছে, সে থাকলে—।' লোকেন বললেন।

'আপনার ওয়াইফ?'

'হ্যাঁ। আমার এইটথ ওয়াইফ।'

ইংরেজি শব্দ দুটো শুনে সাইমন বিস্ময়ে আমার দিকে তাকাল। অবাক আমিও কম নই। লোকেনবাবু বললেন, 'ওর দেশ আগ্রায়। এখন সোনাগাছিতে আগ্রাওয়ালিদের রাজত্ব। আমার ওয়াইফ খুব ভাল গায়। চন্দ্রদা শুনেছেন। কিন্তু বেচারার বাচ্চা হবে তো, চারমাসের মধ্যে কাজে আসতে পারবে না বলে দেশে রেখে এসেছি।'

'দেশ কোথায়?'

'ওই যে বললাম, আগ্রায়।'

'ইনি আপনার অষ্টম স্ত্রী?'

'স্ত্রী নন মশাই, ওয়াইফ। আমার স্ত্রী একটিই, তিনি গত হয়েছেন বছর দশেক হল। আমি থাকি হেদোর কাছে। পৈতৃক বাড়ি।' লোকেনবাবু জানালেন।

কথাগুলো ইংরেজিতে সাইমনকে বলে দিতে হচ্ছিল। সে বলল, 'ইন্টারেস্টিং।'

লোকেনবাবু বললেন, 'আরও আছে সাহেব। কুড়ি বছর থেকে এখানে আসছি। তা প্রায় চব্বিশ বছর হয়ে গেল। একদিন এই ঘরের মালিক হয়ে গেলাম। এখন এখানকার সবাই আমাকে মামা কাকা বলে ডাকে। কেউ কেউ বাবাও বলে। সবাই সম্মান করে। একি কম কথা। এখন দিন খারাপ হয়েছে। সাড়ে দশটার পর পুলিশ হামলা করে। কিন্তু আমার নাম বললে হবে। বুঝলেন?'

'আপনি এখানেই থাকেন?'

'মাথা খারাপ। এখানে কেউ রাত কাটায়? রোজ আসি। তবে রাত থাকতে থাকতে ফিরে যাই। নিজস্ব রিক্সা আছে। ভোর আমি এখানে বসে কখনও দেখিনি।'

'আপনার আট ওয়াইফের গল্প বলুন।'

'বলছি। কিন্তু একটু খাওয়া দাওয়া হবে না?'

'না, না। আমরা খেতে আসিনি।'

'তা কি হয়? ওয়াইফ ফিরে এসে শুনলে আমাকে ছাড়বে?'

'সত্যি বলছি, আমরা খাব না।'

'অন্য কোন উদ্দেশ্য?'

'কোন উদ্দেশ্যই নেই।'

'ভাল। যা বলছিলাম, বছর পঁয়ত্রিশ আগে বাঙালি মেয়ের সঙ্গে হাজব্যাণ্ড ওয়াইফ রিলেশন হল কালীঘাটে গিয়ে। সে আমার এই ঘরেই ব্যবসা করত। তবে সেটা ন'টার আগে।

আমি আসতাম তারপরে। সে বেঁচে ছিল পাঁচ বছর। তারপর এক এক করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মেয়ে আমার ওয়াইফ হয়েছে। এখন তো আগ্রাওয়ালী।'

'বাকি সাতজনও মারা গিয়েছেন?'

'নাঃ। কেউ বিট্রে করেছিল বলে তাড়িয়ে দিয়েছি। কেউ এমনি চলে গেছে।'

'বিট্রে মানে?'

'আমার কথা হল, ব্যবসার জন্যে তুমি যা করার কর, কিন্তু আমি ছাড়া আর কাউকে মন দেবে না। দিলে বিট্রে করা হবে।'

'ও! এদের রোজগারের টাকা—!'

'এরাই ভোগ করেছে। সেই টাকা আমি পায়ের নখ দিয়ে ছুঁইনি কখনও।'

'আপনার স্ত্রী, মানে বিবাহিতা পত্নী জানতেন এসব?'

'বিলক্ষণ। প্রথম দিকে রাগারাগি কান্না চলত। পরে যখন বুঝল আমি কখনই সংসার ত্যাগ করব না তখন চুপ করে গেল আনন্দে।'

লোকনবাবুই আমাদের ট্যাক্সিতে তুলে দিলেন। হোটেলে ফিরে সাইমন হঠাৎ আমার হাত জড়িয়ে ধরল, 'তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না।'

'কেন?'

'অদ্ভুত একটা মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে।'

'কি রকম?'

'হঠাৎ মনে হচ্ছিল নিজেকে দেখছি। ওই লোকটির স্ত্রীর সঙ্গে আমার স্ত্রীর কোন পার্থক্য নেই জানো।' সাইমনের গলায় বিষণ্ণ সুর।

'কিন্তু এই লোকটা খারাপ পাড়ায় মেয়েদের সঙ্গে—।'

'কিন্তু লোকটা তাদের খারাপ ভাবে না। যে সব বউ স্বামীদের ঠকিয়ে রোজ রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করে তাদেরও তো আমরা খারাপ ভাবতে চাই না। তাই না? কিন্তু যে গলায় লোকটা কথা বলল সেই গলায় কথা আমি এ জীবনে বলতে পারব না। এটাই তফাৎ।' সাইমন থেমে গেল।

সাইমনের কাছে বিদায় নিয়ে ফেরার সময় আমার না দেখা সেই দুই মহিলার কথা মনে পড়ছিল। একজন সাইমনের স্ত্রী অন্যজন লোকেনবাবুর। দুই গোলার্ধের এই দুটি মানুষ যদি পরস্পরের দেখা পেতেন তাহলে কি বান্ধবী হতে পারতেন?

প রি ব র্তি ত প রি স্থি তি

রিক্সায় বাড়ি ফিরছিলেন অবনীমোহন। তাঁর বাঁ দিকে বাসব বসে আছে। বাসবের শরীর ইদানীং এত ভারি হয়েছে যে এক রিক্সায় সহজভাবে বসা যাচ্ছে না। পার্টি অফিস থেকে বেরুবার সময় বাসব বলেছিল, 'দাদা, আপনি এখনও রিক্সায় যাওয়া আসা করছেন কেন? গাড়ি তো আছেই!' অবনীমোহন মাথা নেড়েছিলেন, 'নাহে, চল্লিশ সাল থেকে এই শহরে হেঁটে বেড়িয়েছি, শক্তি কমে এসেছে বলে রিক্সায় চড়ি কিন্তু গাড়িতে উঠলে হুস্ করে পৌঁছে যাব। শহরটা দেখতেই পাব না।'

বাসব আর কথা বাড়ায়নি। তাঁর পাশে উঠে বসেছিল। একটু চেপে বসে জায়গা করে দিতে হয়েছে ওকে। বাসব তাঁর হাতে গড়া ছেলে। জেলার এম. পি.। গত নির্বাচনে প্রচুর ব্যবধানে জিতেছে সে। ছেলেটি ভাল।

এখন সকাল। অবনীমোহন দেখলেন যেতে যেতে বাসব হাত তুলে একে ওকে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে সমানে। এক সময় রাস্তা ফাঁকা হলে বাসব বলল, 'দাদা, আপনি এখনও এসব ছেঁদো কেস নিয়ে কেন মাথা ঘামান?'

'ছেঁদো কেস?'

'ওই যে সুলতা না কি নাম মেয়েটার?'

'এটা ছেঁদো কেস নয় বাসব। শহরটাকে তো জানো। মানুষ এমন একটা ইস্যু পেলে সমালোচনা করতে ছাড়বে না। হয়তো এই একটা ঘটনাই অনেককে বিরূপ করে তুলবে।'

'সোমনাথরা তো ব্যাপারটাকে ম্যানেজ করতে চাইছে। কেউ জানতেও পারবে না।'

অবনীমোহনের চোয়াল শক্ত হল, 'কেসটা কে নিয়ে এসেছে? কল্যাণ। তাই না। সে আমাদের ছেলে। কল্যাণ মনে করছে সুলতার ওপর অবিচার করা হয়েছে। আর সেটা যে করা হয়েছে তাতে তো কোন প্রশ্ন নেই।'

বাসব হাঁটুর ওপর ডান হাত রেখেছিল। সেটা তুলে রাস্তায় দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে নেড়ে হাসল। রিক্সা বেরিয়ে গেলে বাসব হাত নামিয়ে বলল, 'কিন্তু আমরা সতীদিকে বিপদে ফেলতে পারি না। গত পাঁচ বছরে ভদ্রমহিলা দলের জন্য যা করেছেন তার কোন তুলনা নেই।'

'তুমি আমাকে আপোস করতে বলছ বাসব?'

'দেখুন, এখন কিছুই করা যাবে না! মেয়েটি ইতিমধ্যে পাঁচ মাসের প্রেগন্যান্ট। ওর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিল। সতীদির ভাই কলেজে পড়ে। ওকে আমরা বাধ্য করতে পারি না একটা মেইড সার্ভেন্টকে বিয়ে করতে। দুটো লোক, একটা ফ্যামিলির জীবন তাতে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'কিন্তু একটা ছেলে অতবড় অন্যায় করে শাস্তি পাবে না?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না। শাস্তি দিতে গেলে পুলিস কেস করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজগুলো ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাদের দলের একজন নেত্রীর ভাই এই করেছে। এখন এমন প্রচার আমরা করতে দিতে পারি না। সোমনাথ বলছে সতীদি আগে যা বলেছেন বা করেছেন তা ভুলে গিয়ে সুলতার পুনর্বাসনের জন্যে হাজার টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। সুলতাও এতে রাজী হয়েছে। কল্যাণের সঙ্গে সোমনাথরা কথা বলবে। আপনি আর এ নিয়ে ভাববেন না।' কথা শেষ করে বাসব আবার একজনকে হাত নাড়ল। রিক্সাওয়ালা খুব যত্ন নিয়ে চালাচ্ছিল। সে জানে এই জেলার সবচেয়ে দামী দুটি মানুষ এখন তার সওয়ার। অবনীমোহনের বাড়ির সামনে পৌঁছে সে সসম্ভ্রমে নেমে দাঁড়াল। অবনীমোহন পকেট থেকে টাকা বের করছিলেন, রিক্সাওয়ালা জোরে মাথা দোলাতে লাগল, 'না স্যার, দিতে হবে না। আমি নিতে পারব না।'

'স্যার! তুই আমাকে স্যার বলছিস। ওহে বাসব, একি বলছে শোন।'

'স্যার কথাটা আজকাল সবাই শিখে গেছে দাদা।'

'নাহে। আজ তুমি সঙ্গে আছ বলে ওর মুখে স্যার বেরিয়েছে। টাকাটা ধর, আমি বিনি পয়সায় কাউকে খাটাই না। ধর বলছি।' শেষ শব্দ দুটোয় এতটা জোর ছিল যে রিক্সাওয়ালা আর আপত্তি করতে পারল না।

গেট খুলে বাড়ির দিকে যেতে যেতে বাসব বলল, 'দাদা, এই জন্যে আমি আপনাকে চিরদিন শ্রদ্ধা করি। তবে আপনাদের মত মানুষ খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না। বাড়ির বাঁ দিকের ঘরটি তাঁর। বসা পড়া এবং শোওয়ার। বাড়িটি পৈতৃক, বাকি অংশে তাঁর ভাই-এরা থাকেন। অকৃতদার অবনীমোহনের একটি ঘরই যথেষ্ট। বেতের চেয়ারে বসতে দিয়ে তিনি বাসবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটু চা খাবে?'

বাসব রুমালে মুখ মুছল, 'আবার ওদের খাটাবেন?'

'বউমা এটাকে খাটনি বলে মনে করেন না। তাছাড়া এখন তো বাড়িতে অনেক মেয়ে। ভাইপোর বউ, তাদের মেয়ে এবার ক্লাশ টেনে উঠল। দাঁড়াও, বলে দিই ওদের।'

অবনীমোহন ভেতরে চলে গেলেন। বাসব চারপাশে তাকাল। এই ঘরে সে গত কুড়ি বছর ধরে আসছে। একটুও পরিবর্তন হয়নি কোথাও। তক্তাপোশ, বেতের চেয়ার, আলনা, কুঁজো, গ্লাস এবং বই-এর তাক একই রকম রয়ে গেছে। সারাজীবন মাস্টারি করেছেন অবনীমোহন। জেলে গিয়েছেন অনেকবার। এখন তিনি সরকারিভাবে এই জেলার পার্টির

সভাপতি। তিনি থাকায় দলের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে সম্ভ্রম এসেছে। অথচ অবনীমোহনের জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনি। আজ যাঁরা মন্ত্রী তাঁদের অনেকেই ওঁর পরে দলে এসেছেন। প্রবীণ যাঁরা তাঁরা মনে করেন অবনীমোহন ইচ্ছে করেই জেলার বাইরে যেতে চাননি।

বাসব বইগুলোর দিকে তাকাল। অবনীমোহন এদের বন্ধু বলেন। এক সময় সে এখান থেকে অনেক বই নিয়ে গিয়েছে পড়ার জন্যে। কিন্তু বই-এর তত্ত্ব এবং জীবনের সত্য যখন মুখোমুখি হল তখন তাকে জীবনকেই বেছে নিতে হয়েছে। অবনীমোহন এখনও তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। বলা যায় তাঁর বাস এখনও ওই বই-এর লাইনে লাইনে। ফলে অবনীমোহন দলের মূলস্রোতের সঙ্গে ঠিকঠাক গা ভাসাতে পারছেন না। সোমনাথরা এই কথাই তাকে বলছিল। জেলা থেকে নির্বাচিত এম. পি. বলে তার নিজস্ব কিছু ক্ষমতা আছেই। কিন্তু দলের প্রশাসনিক ব্যাপারে সে মাথা ঘামায় না। আজ যখন অবনীমোহন বলেন তার সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে চান তখন বাসব আপত্তি করেনি। মনে হয়েছিল এই সুযোগে গুরুকে একটু বাস্তবমুখী করা যেতে পারে। সুলতা কেসটা নিয়ে উনি খুবই অখুশি। সতী দত্ত অধ্যাপিকা। কল্যাণই তাঁকে দলে এনেছিল। তারপর ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছেন ভদ্রমহিলা। এখন দলের মহিলা শাখার নেত্রীত্ব ওঁর হাতে। সেই সতী দত্তের বাড়িতে সুলতা চাকরি করত। কল্যাণের অভিযোগ অসহায় মেয়েটিকে সতী দত্তের ভাই-এর কারণে গর্ভবতী হতে হয়েছে। ব্যাপারটা জানতে পেরে সতী দত্ত সুলতাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মেয়েটির কোন আত্মীয়স্বজন দায়িত্ব নিতে চায়নি। মা বাবা নেই। কিন্তু সুলতা কি করে কল্যাণের কাছে পৌঁছালো সেটাই বিস্ময়ের। আর তারপর থেকে কল্যাণ ওকে সাহায্য করার জন্য চাপ দিচ্ছে। তবু কল্যাণ দলের ছেলে। যদি বিপক্ষের কেউ খবরটা জানত তা হলে বিপাকে পড়তে হত। সতীকে দলের জন্যই দরকার। অবনীমোহন যেটা চাইছেন সেটা ন্যায়সঙ্গত। এই ন্যায়বোধের কথা বই-এর পাতায় লেখা থাকে। জীবন আরও ব্যাপক। সেখানে যে সত্যিটা জন্ম নেয় তা প্রয়োজনের মাপকাঠিতে। তাই সতীর দেওয়া হাজার টাকা সুলতাকে অখুশি করেনি। সে চলে গিয়েছে শহরের বাইরে।

অবনীমোহন এলেন। পাঞ্জাবি খুলে ফেলেছেন। তক্তাপোশে বসে হাসলেন, 'তোমাকে যে কারণে নিয়ে এলাম, বাসব, আমি এবার বিশ্রাম চাই।'

'বিশ্রাম? মানে?' বাসব চমকে উঠল।

'আমার বয়স ঢের হল। শরীরও ঠিক নেই। আগের মত খাটাখাটনি করতে পারি না। তার ওপর যেটা সত্যি তা হল, এখনকার রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে আমি নিজেকে মেলাতে পারছি না। নিজের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধ করতে হয়। তুমি আমাকে দাদা বলে মনে করেছ চিরকাল, আমার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে।' অবনীমোহন শান্ত গলায় বললেন।

দ্রুত মাথা নাড়ল বাসব, 'অসম্ভব। এখন আপনাকে ছাড়া যাবে না।'

'কেন? যা কিছু সিদ্ধান্ত তো তোমরাই নিচ্ছ।'

'এটা আপনার অভিমানের কথা। আপনাকে বাদ দিয়ে আমরা কিছুই করিনি।'

'আমি সম্মতি দিয়েছি। না দিলে কাজ আটকে যেত, তাই।'

'দাদা, আপনি যেভাবে বলছেন তাতে যে কেউ মনে করবে আপনাকে আমরা ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখেছি। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। সুলতার কেসটা নিয়ে আপনি একটু বেশী ভাবছেন।'

'সুলতা একা নয় বাসব। হাসপাতালে আন্দোলনের নামে যা করা হয়েছিল আমি তার বিরোধী ছিলাম। চা-বাগান অঞ্চলে দলের ছেলেদের পার্টির চাঁদার রসিদবই বিলিয়ে দিয়ে কোন হিসেব না চাওয়া আমি মানতে পারিনি। বাসব, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, নিজেকে কি বোঝাব?' অবনীমোহন মাথা নাড়লেন, 'আমরা ক্রমশ বুর্জোয়া ড্রেসিং রুমের শিকার হয়ে যাচ্ছি।'

বাসব হাসল, 'আপনি সোনার পাথরবাটি চাইছেন। এই সংবিধান মানবার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। নির্বাচনে আর কোন গরীবদের দল জিততে পারে না। কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়। বিশাল মেশিনারি লাগে। বুর্জোয়াদের লালনে যে দল লড়ছে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে সমপর্যায়ে নিজেদের নিয়ে যেতে হয়, অন্তত অর্থবল এবং লোকবলে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে আমরা আমাদের পথে অবশ্যই চলব। কিন্তু কিছু ফাঁক তো থেকেই যায়। দাদা, আমরা যতদিন বিরোধী দল হিসেবে কাজ করেছি ততদিন আপনার ওই বইগুলোর তত্ত্ব আমাদের কাজে লেগেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সরকার বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা সঠিক পথে চলতে পেরেছিলাম। কিন্তু সরকার চালাতে গিয়ে অনেকসময় আমাদের হয়তো আদর্শচ্যুত হতে হচ্ছে। তবে এখানেও প্রশ্ন, আদর্শ কোনটা? সেটা শালগ্রাম শিলা হতে পারে না। এক পয়সা ট্রামবাসে ভাড়া যখন বাড়ানো হয়েছিল তখন আমরা আন্দোলনে জনসাধারণকে সঙ্গে পেয়েছিলাম। কিন্তু তিরিশ বছর পরে সরকার চালাতে গিয়ে খরচের বহরে যখন নাভিশ্বাস উঠছে তখন নিজেরাই ভাড়া বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি। প্রতিপক্ষ যে আন্দোলন শুরু করেছে তাকে অগণতান্ত্রিক বলতে বাধ্য হচ্ছি। এছাড়া কোন উপায় নেই। আর এই সব করেই আমাদের সাধারণ মানুষের জন্যে কাজ করতে হবে। এই অবস্থায় আপনি সরে দাঁড়ালে জনসাধারণ আমাদের সন্দেহ করবে। শাসন যার হাতে তাকে তো সাধারণ মানুষ বন্ধু বলে মনে করে না। আমরা যতই বলি জনসাধারণের বন্ধু আমরা, তবু তারা দূরত্ব রাখবেই। এ অবস্থায় আপনার চলে যাওয়া মানে ওদের ভাবনাকে আরও মজবুত করা।' বাসব কথা শেষ করা মাত্র একটি কিশোরী দু'কাপ চা নিয়ে এল। বাসব তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরে নন্দিনী না, কত বড় হয়ে গেছিস?'

নন্দিনী চায়ের কাপ দিয়ে বলল, 'আজকাল তো আপনি আসেনই না।'

'হ্যাঁরে, সময় পাই না। দিল্লি আর কলকাতা করতে করতে নিশ্বাস ফেলতে পারি না।' চায়ে চুমুক দিল বাসব। নন্দিনী দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

'কোন ক্লাশ এবার?'

'টেন। আসছি।' নন্দিনী চলে গেল।

চা খেয়ে বাসব বলল, 'দাদা, আপনি নেক্সট ইলেকশন পর্যন্ত চুপ করে থাকুন। এমনিতেই হঠাৎ হাওয়াটা একটু গরম হয়ে উঠেছে। এসব কথা নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করবেন না।'

'না। আমার মনে হয়েছিল তুমি শিক্ষিত ছেলে, পড়াশুনা করেছ, তুমি বুঝবে।'

বাসব উঠে দাঁড়াল, 'আপনি তো জনসাধারণকে চেনেন। কোন কোন নেতার একটু বেহিসাবী কথায় তারা খেপে উঠেছে। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ এত বিশৃঙ্খল, যে তাদের শান্ত করতে বেশী সময় লাগবে না। সেক্সপীয়ার সাহেব তো জনতার চরিত্র বলেই গিয়েছেন।'

অবনীমোহন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন বাসবকে, 'ওইটেই বোধহয় ভুল হচ্ছে বাসব। ঢেউ-এর ধাক্কায় কণা কণা বালি কখন যে নিজেরাই জড়ো হয়ে একটা বিরাট চর হয়ে যায় তা আগে ঠাওর করা যায় না। বিরোধ যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন নেতৃত্ব আপনা থেকেই তৈরী হয়ে যায়। আমরা এটাই বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব।'

বাসব মাথা নাড়ল। রাস্তায় পা দিয়ে সে পেছন ফিরে তাকল। অবনীমোহন তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। মানুষটি সত্যি ভাল। তার আজকের যা কিছু উন্নতি সব ওই একটি লোকের জন্য। না, অবনীমোহনকে এখন কিছুতেই ছাড়া যেতে পারে না। কিছুদিন আগে সুধাময় চৌধুরী কলকাতার পার্টি অফিসে বসে বলেছিলেন, 'বাসব, অবনীর মত একজন আমাদের দলে আছে এটা ভাবতে আমার খুব ভালো লাগে। ও জেলা থেকে বেরিয়ে এলে দেশের অনেক বেশী উপকার হত।' পুরোনদিনের লোক যাঁরা তাঁদের এমনই ধারণা ওঁর সম্পর্কে। চারপাশে তাকিয়ে বাসব একটিমাত্র রিক্সাওয়ালাকে দেখতে পেল। তাকে দাঁড়াতে দেখেই সে রিক্সা নিয়ে এগিয়ে আসছে, 'চলুন স্যার।' সঙ্গে সঙ্গে বাসবের মনে পড়ল এই লোকটাই তাদের নিয়ে এসেছিল। সে হেসে বলল, 'তুমি এখনও এখানে? এর মধ্যে ভাড়া পাওনি?'

'পেয়েছি স্যার। নিইনি। আপনি তো ফিরে যাবেন।'

রিক্সায় উঠে বসল বাসব। তার ভাল লাগল। একেবারে, যাকে বলে রুট লেভেলে সে চলে গিয়েছে। একজন রিক্সাওয়ালা পর্যন্ত তাকে খাতির করছে। কিন্তু ও কি চায়? এখন জেলায় এলেই যারা ভিড় করে তারা কিছু না কিছু চায়। লোকগুলো যখন বোঝে বিধানসভা বা কলকাতার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, লোকসভা বা দিল্লীতেই তার কাজকর্ম, তখন খুব হতাশ হয় সবাই। একমাত্র বড় ব্যবসায়ী ছাড়া কেউ তাই বিব্রত করতে পারে না তাকে। এম. পি. হয়ে খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে সে। মুখ ফিরিয়ে সে শেষবার তাকাল, অবনীমোহন দাঁড়িয়ে আছেন।

অবনীমোহন শূন্য রাজপথের দিক তাকিয়ে ছিলেন। বাসব যা বলে গেল তার সবটাই ওর দিকে থেকে সত্যি। বিরুদ্ধ ভাবনাটা তাঁর মনে আজই প্রথম এল না। দল ক্ষমতায় আসার

পর থেকেই ধীরে ধীরে এমন দানা বাঁধছিল। নিজেকে বুঝিয়েছিলেন মতে মিলছে না বলে সরে দাঁড়ালে কাজের কাজ তো কিছুই হবে না। ক্ষমতাহীন অবস্থায় ঘরে বসে অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারবেন না। তবু জেলার সর্বোচ্চ পদে থেকে তিনি কিছুটা কাজ নিজের মত করে করতে পারছেন। ভেবেছিলেন বাসব তাঁর কথা বুঝতে পারবে। এখন মনে হচ্ছে বুঝেও বাসব তাকে মানিয়ে চলার নীতি নিতে বলছে। কিন্তু একটা মানুষ কতখানি মেনে নিতে পারে? গ্রামের প্রায় সবগুলো পঞ্চায়েত এখন তাঁদের দখলে। যদিও পঞ্চায়েতের সদস্যরা কিছু চামচে নিয়ে গ্রাম থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছে। এখন নির্বাচনে জিততে জনসাধারণের দেওয়া ব্যালটের ওপর নির্ভর করতে হয় না। তাই পরবর্তী নির্বাচনেও ওরা জিতবে। কিন্তু আগুন একদিন জ্বলবেই। পার্টি ফান্ডে হাজার টাকা চাঁদা না দিতে পারার অপরাধে এক সম্পন্ন কৃষিজীবী পরিবারের চাষবাস বন্ধ করে দেওয়া হল। কেউ তার জমিতে চাষ করতে যেতে পারবে না। যারা চাষ করত তাদের দিয়ে বেশী মজুরী দাবী করানো হল। পরিবারটি এক বছর চাষ বন্ধ রাখল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভাবের তাড়নায় বাধ্য হল হাজার টাকা চাঁদা দিতে। এই বাধ্য হওয়া মানুষগুলোর বুকে আগুন জ্বলছে ধিক ধিক করে। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কখনই ও গ্রামের শাখাকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি অত টাকা চাঁদা আদায় করতে। অথচ তারা করছে। এসব খবর জানা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। থানা তো এখন অতিরিক্ত রকমের তাঁবেদার। এই আধা ফ্যাসিস্ত ক্রিয়াকলাপ বেশীদিন চলতে পারে না। কিন্তু একথাও ঠিক, পদত্যাগ করলে তিনি কোন সুরাহা করার সুযোগই পাবেন না।

অবনীমোহন দেখলেন, শূন্য রাজপথে একটি রিক্সা আসছে। রিক্সার সওয়ারি এই শেষ-সকালেই মাথায় ছাউনি ফেলেছে। রিক্সাটি অবনীমোহনের বাড়ির সামনে এসে থামল। রিক্সাওয়ালা সওয়ারিকে বাড়িটা দেখিয়ে কিছু বলতেই লোকটা ভাড়া মেটাল। তারপর একটা কাঁধে ঝোলানো বড় ব্যাগ নিয়ে নেমে দাঁড়াল।

দরজায় দাঁড়িয়ে অবনীমোহন লোকটাকে দেখলেন। বছর তিরিশেক বয়স। ভাঙা গাল। কাঁধ অবধি চুল। চেক সার্ট আর বিবর্ণ জিনসের প্যান্ট পরে কাঁধে ব্যাগ ফেলে এগিয়ে আসছে। প্রায় মুখোমুখি হতেই লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'অবনীমোহনবাবু আছেন?'

'আমিই অবনীমোহন।'

'অ। ভেতরে চলুন, কথা আছে।'

'আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'কলকাতা থেকে। চলুন ভেতরে বসে কথা বলব।'

লোকটার বলার ভঙ্গীতে যে ঔদ্ধত্য রয়েছে সেটা অবনীমোহনকে বিরক্ত করল। অশিক্ষা থেকেই মানুষ এই ভঙ্গীতে কথা বলতে পারে। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনার কি দরকার তা এখানে দাঁড়িয়ে বলতে অসুবিধে হচ্ছে কেন?'

লোকটা চারপাশে তাকাল, 'পাবলিক শুনুক আমি চাই না। হোলনাইট জার্নি করে এসেছি। হেভি টায়ার্ড। বসেই কথা বলতে চাই।'

অতএব অবনীমোহন ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। নিজে তক্তাপোশে বসে লোকটাকে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন লোকটা তাঁর ঘরের চেহারা দেখছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তো জেলা কমিটির চেয়ারম্যান?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'কতদিন হয়েছেন?'

'আগাগোড়া।'

'যাঃ শালা!

'মানে?'

'এ্যাদ্দিনেও বাড়িঘরের চেহারা পাল্টাতে পারেননি?'

'কি চান আপনি?' চোয়াল শক্ত হল অবনীমোহনের।

বুক পকেটে রাখা একটা ভাঁজ করা খাম বের করে অবনীমোহনের দিকে বাড়িয়ে ধরল লোকটা। খামটা নিয়ে মুখ ছিঁড়ে চিঠি বের করলেন তিনি। সত্যর চিঠি। অত্যন্ত ক্ষমতাবান মন্ত্রী। বছর কুড়ি হল পার্টিতে এসেছে। কয়েকবার জেলায় এসেছে। তাঁকে খুব দাদা দাদা করে। সম্ভবত প্রবীণ নেতাদের মুখে তাঁর কথা শুনেছে। সেই সত্য চিঠি লিখেছে।

'শ্রদ্ধাস্পদেষু। পত্রবাহক শ্রীমান বলাই গুপ্ত আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। সে দলের সদস্য না হলেও সক্রিয় কর্মী। আজ যখন বিরুদ্ধপক্ষের মদত দিতে কিছু বুর্জোয়া কাগজ আমাদের পেছনে লেগেছে তখন আমাদের সংগ্রামে নামতেই হচ্ছে। যাহোক শ্রীমান বলাই-এর নামে কয়েকটি মিথ্যে এফ. আই. আর. করা হয়েছে। মিথ্যে বলেই পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু খবরের কাগজগুলো প্রতিদিন এমন চাপ দিচ্ছে যে পুলিশকে আর নিষ্ক্রিয় রাখা যাচ্ছে না। তাই ওকে আমি আপনার কাছে পাঠালাম। অন্তত মাসখানেক আপনি ওর নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিন। আপনার কাছে ওকে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। দলের জন্যে আপনার অবদানের কথা আমরা সবাই জানি। শ্রীমানকে আশ্রয় দেওয়া দলের প্রতি কর্তব্য বলে মনে করলে বাধিত হব। ওর সমর্থনে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করার কথা চিন্তা করছি। নমস্কার সহ—আপনার সত্য দত্ত।'

অবনীমোহন চিঠিটি শেষ করে বলাই গুপ্তের দিকে তাকালেন। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কলকাতা থেকে কিসে এলেন?'

'রকেটে। কৃষ্ণনগর থেকে উঠেছি।'

'কেন?'

'সত্যদা বললেন, বুলু চান্স নিও না। এসপ্ল্যানেডে গেলে পাবলিক চিনে ফেলতে পারে! তাই প্রাইভেট কারে কৃষ্ণনগরে পাঠালেন। ওখানে রকেট এসে থামতেই উঠে পড়লাম।'

অবনীমোহনের মনে হল এই লোকটিকে নিছকই মস্তান বলা যায়। পেশীশক্তির প্রয়োজন আপনা থেকেই হচ্ছে। অথবা পেশীশক্তি যাদের আছে তারা নিজেদের প্রয়োজনেই রাজনৈতিক দলের ছায়ায় আসছে। এখন সেই অর্থে তত্ত্বসর্বস্ব রাজনৈতিক দল প্রায় সোনার পাথরবাটির মত ব্যাপার। অবনীমোহনকে মানতে হয়েছে। আটচল্লিশ সালের অবনীমোহনের সঙ্গে সাতষট্টির অবনীমোহনের যেমন অনেক অমিল ছিল, নব্বুইতে এসে তিনি প্রচুর পাল্টেছেন। এসব সত্যি। কিন্তু এই শহরে তথাকথিত পেশীশক্তি নিয়ে যারা ঘোরাফেরা করে তাদেরও একটা পারিবারিক দিক আছে। শেকড়ছাড়া কেউ নয়। আর তারা অবনীমোহনের সামনে এলে মাথা নিচু করে কথা বলে। অবশ্য সামনে আসার অস্বস্তি থেকে দূরে থাকতেই তারা পছন্দ করে।

অবনীমোহন বললেন, 'আপনি একটু বসুন। আমার কিছু জানার আছে।'

বলাই হাত নাড়ল, 'আমি তো মাসখানেক এখানে থাকব। পরে জানলে ক্ষতি আছে? আমার এখনই ল্যাট্রিনে যাওয়া দরকার। হোল নাইট জার্নি করেছি।'

অবনীমোহন উঠলেন। তাঁর ঘরের লাগোয়া একটি স্নানঘর এবং পায়খানা আছে। ব্যবস্থাটা অনেকদিনের। বাড়ির লোকজনকে বিব্রত না করতেই তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। একসময় তাঁর ঘরেই প্রচুর সভা হয়েছে। অনেক মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত। সে সময় ওই ব্যবস্থা করা। বলাইকে ইশারায় তিনি ভেতরে নিয়ে এলেন। এক চিলতে উঠোন। উঠোনের পরেই মূল বাড়ি। সেদিকে না গিয়ে তিনি বলাইকে নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

বলাই বলল, 'আমার ব্যাগ বাইরে পড়ে রইল কিন্তু!'

'এখানে কোন চুরি চামারির ভয় নেই।'

'ওর ভেতরে মাল আছে। একটু নজর রাখবেন।' বলাই ঢুকে গেল। অবনীমোহন ফিরে এলেন বাইরের ঘরে। তক্তাপোশে বসে সত্যর চিঠিটা আবার পড়লেন।

সব কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছিল অবনীমোহনের। জীবনে তাঁকে দু'বার আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতে হয়েছিল। পার্টিকে যখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল আর জরুরী ব্যবস্থা জারি হবার সময়। সেটা ছিল পুলিশের নজর থেকে দূরে সরে থাকা, সাধারণ মানুষের সাহায্য পেয়েছিলেন অনেক। একটা সততাবোধ সেই সময় তাঁদের অনুপ্রাণিত করত।

পায়ের শব্দে অবনীমোহন চোখ খুললেন। নন্দিনী এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, 'কে এসেছে দাদু?'

'কলকাতা থেকে একজনকে পাঠানো হয়েছে।'

'কেন?'

'ও এখানে কিছুদিন থাকবে। তুমি ভেতরে যাও।'

'মা জিজ্ঞাসা করল তোমার জলখাবার এখন দেবে কিনা?'

মাথা নাড়লেন অবনীমোহন, 'না, এখন খাব না। তুমি বরং ভেতরে যাও।'

'কেন?'

অবনীমোহন কি জবাব দেবেন বুঝতে পারলেন না। বলাই-এর সামনে নন্দিনী থাকুক তিনি পছন্দ করছেন না, এ-কথাটা কিভাবে বলবেন, নাতনির হাত ধরে তিনি বললেন, 'আমরা এখন কিছু জরুরী কথা বলব তো, তাই তোমাকে ভেতরে যেতে বলছি।'

'ও, তাই বল। লোকটার নাম কি দাদু?'

'বলাই।'

নন্দিনী হেসে উঠল, 'ওর চুলগুলো দেখেছ? অমিতাভ বচ্চনের নকল করা।'

'তুমি কি করে দেখলে?'

'বাঃ। আমি তো ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'বুঝলাম। এবার যাও।'

নন্দিনী যখন চলে যাচ্ছে সেইসময় বলাই ঢুকল। জামাপ্যান্ট পাল্টানোর চেষ্টা করে নি কিন্তু একটু পরিচ্ছন্ন হয়েছে। চলে যাওয়া নন্দিনীর দিকে সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। অবনীমোহনের এটা পছন্দ হল না।

চেয়ারে বসে বলাই বলল, 'আঃ, এবার আরাম লাগছে। কিষাণগঞ্জের কাছে রাস্তা যা খারাপ ছিল, কি বলব আপনাকে।'

'আপনার ব্যাগে কি আছে?' অবনীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন।

'কি আছে মানে?'

'বাথরুমে ঢোকার সময় বলছিলেন।'

'অ। রিভলবার!'

'আপনি রিভলবার নিয়ে ঘুরছেন? লাইসেন্স আছে?'

এবার শব্দ করে হাসল বলাই, 'আপনি কোন জগতে বাস করেন বলুন তো? এই শহরে যারা অ্যাকশান করে তারা কি লাইসেন্স নিয়ে রিভলবার চালায়?'

'এখানে ওসবের প্রয়োজন হয় না।'

'তাই নাকি? প্রথম শুনলাম। আমি কোন ঘরে থাকব?'

'কোন ঘর মানে?'

'বাঃ, সত্যদা বলেছেন আপনি থাকার ব্যবস্থা করবেন।'

অবনীমোহন উঠে দাঁড়ালেন। মনে মনে বললেন, অসম্ভব। এবাড়িতে কিছুতেই নয়। এই মুহূর্তে ওকে তাড়িয়ে দিতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু সত্যর অনুরোধ তিনি ঠেলতেও পারছেন না। লোকটাকে অনেক দূরে কোথাও পাঠানো দরকার যেখানে গিয়ে ওকে একদম একা থাকতে হবে। হঠাৎই তাঁর মনে পড়ল সেই ফরেস্ট বাংলোটার কথা। প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে গভীর জঙ্গলে বাংলোটা রয়েছে। সেখানে কোন ট্যুরিস্ট যায় না। ডি. এফ. ও.-র সঙ্গে কথা বলা দরকার এবং তার আগে থানাতে যেতে হবে। এই একমাস বলাইকে যেন কেউ বিরক্ত না করে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

অবনীমোহন বললেন, 'দেরি করে লাভ নেই। চলুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'আপনার একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার। আমার এখানে সেটা সম্ভব নয়। সারাদিন প্রচুর লোক আসেন। একটা ফরেস্ট বাংলোয় ব্যবস্থা করছি। ওখানে চৌকিদার আছে, সেই রান্না করে দেবে। মাসখানেক জঙ্গলের বাইরে আসবেন না।'

'বাঃ। ওরকম জায়গায় একা থাকলে পুলিশ সবচেয়ে আগে টের পাবে।'

'টের যাতে না পায় তার ব্যবস্থা করছি। চলুন।'

আদ্দেকের চেয়ে কম বয়সের লোকটাকে অবনীমোহনের তুমি বলতে ইচ্ছে করছিল না। আর মজার ব্যাপার বলাই তাঁকে একবারও অনুরোধ করেনি তুমি বলতে। এতে স্বস্তি পাচ্ছেন তিনি।

নিতান্ত অনিচ্ছায় তাঁর পাশে রিক্সায় বসে বলাই জিজ্ঞাসা করল, 'কতদূরে?'

'বাসে ঘণ্টা দুয়েক লাগে।'

'আমার কাছে বেশী মালকড়ি নেই।'

'ঠিক আছে।' বলতেই মাল শব্দটা থেকেই রিভলভারের কথা মনে হল। অবনীমোহন বললেন, 'আমরা প্রথমে থানায় যাব।'

'থানা? থানা কেন?' চমকে উঠল বলাই।

'আপনার নিরাপত্তার জন্যে।'

'আপনার মতলবটা কি বলুন তো?'

'সত্য আপনাকে পাঠিয়েছে। তাই ওর অনুরোধ রাখছি। একটা কথা, আপনার রিভলভারটা আমাকে দিন। পুলিশের চরিত্র আমি বুঝি না। ওরা কিছু করবে না। তবু থানার ভেতরে আপনার কাছে রিভলভার না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'পুলিশের নজর এড়াতে এতদূরে এলাম আবার আমাকেই কেন থানায় নিয়ে যাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। দু-নম্বরী কিছু করতে চাইলে সত্যদা কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে না মনে রাখবেন।' প্রায় শাসানোর ভঙ্গীতে কথাগুলো বললেও ব্যাগ খুলে হাতের আড়ালে রেখে রিভলভারটা বের করে অবনীমোহনকে দিল বলাই। অবনীমোহন জীবনে প্রথমবার রিভলভার ধরলেন। কাঁপা হাতে পকেটে রেখে দিলেন তিনি। বলাই বলল, 'সাবধানে রাখবেন। লোড করা আছে।'

থানার গেট পেরিয়ে রিক্সাটা থামতেই ভাড়া মিটিয়ে দিলেন অবনীমোহন। তাঁকে দেখতে পেয়েই দারোগাবাবু হাতজোড় করে বেরিয়ে এলেন, 'আসুন আসুন। কি সৌভাগ্য। আমাকেই তো ডেকে পাঠাতে পারতেন। আসুন।'

দারোগার ঘরে বসে অবনীমোহন দেখলেন বলাই খুব শক্ত হয়ে বসে আছে। খুব ভয় পাওয়া একটা মানুষের চেহারা এরকম হয়। অবনীমোহন হাসলেন, 'আমাকে একটু টেলিফোনে ডি. এফ. ও.-কে ধরিয়ে দেবেন?'

দারোগা বললেন, 'নিশ্চয়ই। একটু আগে ডি. এফ. ও. বাংলোয় ফিরে গেলেন। দাঁড়ান, দেখছি।' রিসিভার তুলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই যোগাযোগ করিয়ে দিলেন তিনি।

অবনীমোহন বললেন, 'কেমন আছেন ডি. এফ. ও. সাহেব?'

'আর বলবেন না, বয়স হচ্ছে এবার টের পাচ্ছি।'

'একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে।'

মিনিটখানেকও লাগল না। ডি. এফ. ও. খুশী হয়ে অনুমতি দিলেন। তিনি এখনই ওই ফরেস্ট এলাকার অধস্তন কর্মচারীদের জানিয়ে দিচ্ছেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।... টেলিফোন রেখে অবনীমোহন বললেন, 'এই ভদ্রলোকের খুব খিদে পেয়েছে। কিছু আনানো যাবে?'

দারোগা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই। কি আনাবো? কচুরী তরকারী ছাড়া তো কিছুই পাওয়া যাবে না এখন। তাই আনাই? আপনি খাবেন তো স্যার? খাবেন না? চা? অ্যাই, কে আছ? গোটা ছয়েক কচুরী আর তিন কাপ চা নিয়ে এসো জলদি।'

একজন পুলিশ আদেশ পালন করতে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। দারোগা এবার হাত কচলালো, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কোন অন্যায় হয়ে যায়নি তো? মানে নিজে এখানে এলেন!'

'না না। আমি এসেছি এর জন্যে। আচ্ছা, একে কি আপনি চিনতে পারছেন?'

দারোগা বলাই-এর দিকে তাকালেন। অবনীমোহন দেখলেন, বলাই খুব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। দারোগা কিছুক্ষণ তাকিয়ে মাথা নেড়ে না বললেন। অবনীমোহন হাসলেন, 'একটু আগে যে ফরেস্ট বাংলোটার কথা ডি. এফ. ও.-কে বললাম, সেখানে ইনি মাসখানেক থাকবেন। আমাদের কলকাতার একজন বড় নেতা চাইছেন এই সময়টা ওঁকে কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

'ওটা তো আমার এলাকা নয় স্যার।'

'ওই এলাকার যিনি দারোগা তাঁকে তো আপনি চেনেন।'

'চিনি। তা আপনি কি ওখানে সেপাই পোস্ট করতে বলছেন।'

'না। ঠিক উল্টো। নেতা চাইছেন কেউ যেন ওঁর খোঁজ না করে।'

'ও। বুঝলাম। ঠিক আছে স্যার, হবে। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

এত দ্রুত খাবার এসে যাবে কল্পনা করেননি অবনীমোহন। বলাই চেটেপুটে খেল। খেয়ে বলল, 'কচুরিতে যেন কেমন গন্ধ!'

দারোগা হাসল, 'মফস্বলের কচুরী তো। কলকাতার স্বাদ পাবেন কোথায়!'

চা খাওয়া হলে অবনীমোহন উঠছিলেন। দারোগা তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল, 'স্যার, এবার মন্ত্রী এলে আমার কথাটা মনে রাখবেন।'

'মনে করিয়ে দেবেন।' অবনীমোহন বেরিয়ে এলেন থানা থেকে। তার পেছন পেছন বলাই। তার গলায় হাসি ছিল, 'বাপস। খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। দিন, এবার মালটা দিন।'

'ওটা আপনাকে এই জেলা থেকে চলে যাওয়ার দিন দেব।'

'সে কি? ওটা ছাড়া আমি থাকতে পারি না।'

কান দিলেন না অবনীমোহন। বললেন, 'আপনাকে আমি বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দিচ্ছি। বাস ওই ফরেস্টের পাশ দিয়ে যায়। কিছুটা হাঁটতে হবে। ততক্ষণে ডি. এফ. ও. সাহেবের হুকুম পৌঁছে যাবে। আপনি চলে যান।'

'অ্যা? আমি একা যাব?' বলাই পাশে এসে দাঁড়াল, 'অসম্ভব। সত্যদা বলেছেন আপনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজে যেতে না পারেন কাউকে সঙ্গে দিন।'

'কাউকে সঙ্গে দিলে জানতে পারবে আপনার কথা।' মাথা নাড়লেন অবনীমোহন। তাঁকে খুব বিষণ্ণ লাগছিল। এই লোকটিকে কেন তাঁকে বহন করতে হচ্ছে? কেন তিনি একে ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না? সত্য দত্তর মুখ মনে পড়ল। বলাই অ্যাকশন করত। কি রকম কাজ সেটা তো তিনি এখনও জানেন না। এফ. আই. আর. আছে যখন তখন—! না, তিনি একে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তা দলের কাউকে জানানো চলবে না।

সামান্য হাঁটতেই বাসের দেখা পেলেন অবনীমোহন। হাত দেখাতেই সেটা থামল। কণ্ডাক্টর অবনীমোহনকে চিনতে পেরে উদ্যোগ নিয়ে জায়গা করে দিল। পাশাপাশি দুটো সিট। অবনীমোহন জানলার ধারে বসেই টিকিট কাটলেন। কণ্ডাক্টর নিতে চাইছিল না টাকা, তিনি বাধ্য করলেন। শহর ছাড়িয়ে বাস বাইরে বেরুলে অবনীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নামে এফ. আই. আর. করা হয়েছে কেন?'

'ওই যে, তখন বললাম। অ্যাকশান করেছিলাম।' নিচু গলায় বলল বলাই।

'কি রকম অ্যাকশান?'

'অনেকগুলো।'

'যেমন?'

'ইলেকশনের সময় বুথ জ্যাম করতে বলা হয়েছিল। দলের লোকজন পারছিল না। তখন বোম নিয়ে রিভলভার নিয়ে নামলাম। সব ভোটার হাওয়া হয়ে গেল। বুথে ঢুকে কাজ শেষ করে চলে এলাম। কোন ঝামেলা হয়নি।'

'এ ছাড়া?' চোয়াল আবার শক্ত হল অবনীমোহনের।

'মাসখানেক আগে আমাদের পাশের পাড়ার কয়েকজন খুব গোলমাল পাকাচ্ছিল। কাটা পাঁচুর নাম শুনেছেন? শোনেননি? সত্যদা পাত্তা দেয়নি বলে এনিমি হয়ে গিয়েছিল। পুরো

বস্তিটাকেই অ্যান্টি করে তুলেছিল। চোলাই, মেয়েছেলে সবরকম ব্যাবসা করত। একদিন অ্যাকশন করলাম। কাটা পাঁচুর প্রেমিকাকে ধরে রেপ করলাম। ব্যস, সব ঠাণ্ডা। পুরো বস্তি এখন আমাদের দলে। কাটা পাঁচু ভোগে।'

'ভোগে মানে?'

'লাইনে পড়ে আধাআধি টুকরো হয়ে গিয়েছে।'

'আপনি রেপ করেছেন?' হতভম্ব অবনীমোহন।

'ওসব তো করতেই হয়। মেয়েছেলেটা আমার নাম পুলিশকে বলে দিয়েছে। ওকে ঠাণ্ডা করার টাইম পাইনি। ফিরে গিয়ে হিসেব নেব।'

'সত্য জানে আপনি এসব করেছেন?'

'গুরুর পারমিশন ছাড়া কোন কাজ করি না দাদা।'

অবনীমোহনের বমি পাচ্ছিল। বলাই-এর পাশে বসতে তাঁর ঘেন্না হচ্ছিল। সত্য কাকে পাঠিয়েছে তাঁর কাছে? একি তাঁদের ক্যাডার? সত্যর ক্যাডার? ক্যাডার মানে শিক্ষিত সৎ রাজনৈতিক কর্মী। তাহলে?

হঠাৎ অবনীমোহনের সমস্ত শরীরে জ্বলুনি ধরল। তিনি স্থির করলেন এই সামাজিক অপরাধীটিকে কোনরকম সাহায্য করবেন না। একে অবিলম্বে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। তারপরেই মনে হল পুলিশকে তিনি অন্যরকম অনুরোধ করে এসেছেন। বাড়িতে বসে এসব শুনলে কখনই সেটা করতেন না। এখন নতুন করে কিছু বলতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। তাহলে? অবনীমোহন ভেবে পাচ্ছিলেন না কি করবেন। বাসবরা বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে বলে। বাসব হলে কি করত? তিনি সরে বসলেন। কোন রকম রাস্তা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ফরেস্টের গেটের মুখে ওঁরা বাস থেকে নামলেন। বলাই বলল, 'যাঃ শালা! এখানে তো মানুষের মুখই দেখা যাবে না। সময় কাটবে কি করে?'

'মানুষের মুখ দেখার মত মুখ তো আপনি করেননি।' চাপা গলায় বললেন তিনি।

'মানে? কি উল্টোপাল্টা বলছেন?'

'ঠিকই বলছি। আমার বয়স হয়েছে। আর হাঁটতে পারব না। সোজা ওই কাঁচা রাস্তা ধরে চলে যান। বাংলো পাবেন। একমাসের মধ্যে এখান থেকে বের হবেন না।'

'আমি একা যাব?'

'এতদিন যা করেছেন তা কি একা করেননি?'

'না। সঙ্গী ছিল।'

'আমার কাজ আমি করেছি, যান।'

'মাল দিন। টাকা আর রিভলভার।'

বাস চলে গেছে। কয়েক মাইলের মধ্যে মানুষের বসতি নেই। গাছে পাখি ডাকছে। হঠাৎ সচেতন হলেন অবনীমোহন। জীবনে কখনও রিভলভার চালাননি তিনি, একটা পিঁপড়েকেও

কখনও মারেননি। রিভলভার তাঁর পকেটে আছে। তাতে গুলি আছে বলেছিল বলাই। তিনি যদি এখন ওটা বের করে বলাই-এর বুক লক্ষ্য করে ছোঁড়েন তাহলে কেউ টের পাবে না। আর এইটেই তাঁর কর্তব্য। একজন মানুষ হিসেবে, একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বলাই-এর মত পিশাচকে সরিয়ে দেওয়া একমাত্র কর্তব্য। তিনি রিভলভার বের করলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। বলাই এগিয়ে এসে রিভলভার নিয়ে নিল। তাঁর আঙুলগুলো যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে। বলাই ওটাকে পকেটে রেখে বলল, 'টাকাটা?'

'পকেটে একশটা টাকা ছিল, এটাই আপাতত রাখুন।' বিড়বিড় করলেন তিনি।

'এতে আর কদিন চলবে? পাঠিয়ে দেবেন, নইলে আমাকে আবার আপনার বাড়িতে যেতে হবে। সত্যদাকে খবরটা দিয়ে দেবেন, দিতে বলেছে।' বলাই হেলতে দুলতে জঙ্গলের পথ ধরল। অবনীমোহনের মনে হল একটি জন্তুও ওর চেয়ে অনেক স্বাভাবিক পায়ে হাঁটে।

শহরে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। অস্নাত অভুক্ত অবনীমোহন বাড়িতে ঢুকে শুনলেন প্রচুর লোক তাঁর খোঁজে এসেছিল। সোমনাথরা যেতে বলেছে। তিনি দরজা বন্ধ করে তক্তপোশে শুয়ে পড়লেন। মাথা ঘুরছে, বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে। নন্দিনী একটু আগে ভেতরে চলে গেছে। তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতে চাননি। হঠাৎ মনে পড়ল সকালে বলাই নন্দিনীর দিকে তাকিয়েছিল। যে বলাই প্রকাশ্যে রেপ করতে পারে, যে বলাই রেপের গল্প গর্বের সঙ্গে করতে পারে তাকে তিনি আশ্রয় দিয়ে এলেন। নন্দিনীর মুখ মনে পড়তেই শিউরে উঠলেন।

অনেকক্ষণ পরে অবনীমোহন উঠলেন। আলো জ্বাললেন। তারপর চিঠি লেখার কাগজ নিয়ে বসলেন। একটু ভেবে তিনি শুরু করলেন, শ্রীযুক্ত সত্য দত্ত প্রীতিভাজনেষু,

—তোমার চিঠি নিয়ে বলাই আমার কাছে এসেছিল। প্রথমে থানায় নিয়ে গিয়ে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি। তারপর ডি. এফ. ও.-র অনুমতি নিয়ে একটি ফরেস্ট বাংলোয় রেখে এসেছি। সেখানে যাওয়ার আগে আমি তার ক্রিয়াকলাপ জানতাম না।

আমি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। অনেক সংগ্রাম করে আজ আমরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি। কিন্তু এই পৌঁছানোটা মূল লক্ষ্যের সিকিভাগও নয়। আমরা চিরকাল জেনে এসেছি জনসাধারণের পাশে বন্ধু হিসেবে দাঁড়ানোটাই আমাদের পবিত্র কর্তব্য। ঠিক যে কারণে আমাদের দেশের ধনতান্ত্রিক দলগুলো বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যে কারণে উগ্রপন্থী বিপ্লবীরা হেরে গিয়েছে, সেই কারণটা আমাদের যেন ধ্বংস না করে। ক্ষমতায় আসার পর আমাদের আরও সুযোগ এসে গিয়েছে জনসাধারণের পাশে দাঁড়ানোর। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি কয়েক কোটি মানুষকে তাঁবে আনতে আমরা কিছু পেশী শক্তির ওপর নির্ভর করছি। আজ যাকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়েছ সে জনগণের শত্রু। অথচ তার ওপর তোমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে। যতদিন তোমার হাতে ক্ষমতা থাকবে ততদিন সে কথা শুনবে। যেদিন প্রতিপক্ষের হাতে ক্ষমতা যাবে সেদিন যে দলবদল করে তোমার আমার স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

এই সত্যটা আমাদের বোঝা উচিত। জনসাধারণের জন্যে কাজ করতে এসে তাদের শত্রু করে তোলার পথ থেকে এখনই আমাদের সরে আসা উচিত। এখন আমরা সমালোচনা সহ্য করতে পারি না। কেউ সমালোচনা করলেই তাকে শত্রু মনে করি। কিন্তু আমি মনে করি, আমার মত যারা বামপন্থী আন্দোলনকে মনে প্রাণে সমর্থন করেন তাঁরাও একমত হবেন, বর্তমান অবস্থায় আমরা সঠিক পথে চলছি না। আমাদের আত্মশুদ্ধি হওয়া দরকার। ঔদ্ধত্য ত্যাগ করা উচিত। আর এই সমাজবিরোধীদের উৎখাত করে সামাজিক তরুণদের ওপর আস্থা রাখা প্রয়োজন।

আজ সকালে বাসবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। সে আমাকে বর্তমানের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বলেছিল। আমিও তোমাদের জীবনের সঙ্গে পা মেলাতে অনুরোধ করছি। তোমার কাছে অনুরোধ, তুমি বলাইকে পুলিশের হাতে তুলে দাও। এই শহরের দারোগা জানে সে কোথায় আছে। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধর—যাতে মানুষ জানবে আমরা অপরাধীর রক্তাক্ত হাতের সঙ্গে হাত মেলাইনি।

একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এইটুকু আমার আবেদন। অবনীমোহন।'

চিঠিটা ভাঁজ করলেন তিনি। খামে ঢোকালেন। তারপর ধীরে ধীরে ভেতরের দরজা খুলে অন্ধকারেই বাথরুমে ঢুকলেন। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল স্নান করার। জলের ধারায় নিজেকে ধুয়ে নিতে। কিন্তু কল পর্যন্ত তাঁর যাওয়া হল না। মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন তিনি। শব্দ শুনে বাড়ির সবাই ছুটে এল। চিৎকার চেঁচামেচি। অ্যাম্বুলেন্স এল হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সারা শহরে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে কথা বলার চেষ্টা করছিলেন অবনীমোহন। তাঁর মাথার পাশে বসে নন্দিনী আকুল গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছ দাদু?'

অবনীমোহন জড়ানো গলায় বললেন, 'চিঠি—টে-বিলে—!'

'তুমি চিঠি লিখেছ, কাকে পাঠাবো?'

অবনীমোহন চেষ্টা করলেন। কথা বেরুলো না ঠোঁট থেকে। এক হাত অসাড়। অন্য হাতে তিনি যেন এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তের ঠিকানা আঁকলেন।

প্র থ ম জী ব ন দ্বি তী য় জী ব ন

বেশ কিছুদিন ধরে বিপন্নপালকের মনে হচ্ছিল এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।

মধ্যবিত্ত বাঙালি যা যা পেলে খুশি হয় বিপন্নপালকের তা আছে। সল্টলেকের খোদ বিডি মার্কেটের পেছনে একটা দোতলা বাড়ি, সাত হাজার টাকা মাইনের একটা চাকরি, ব্যাঙ্ক, ইউনিট ট্রাস্ট, এন এস সি এবং জীবনবীমায় ভাল টাকা। চাকরি ছাড়া তার একটা বিরাট রোজগার, লেখার টাকা। সেটা বছরে ছ'লাখের কম হয় না কুড়িয়ে-বাড়িয়ে। বিপন্ন বিবাহিত। স্ত্রী তপতীর বয়স গত শ্রাবণে চুয়াল্লিশ, ছেলে দিব্য জয়েন্ট দিয়ে শিবপুরে পড়ছে। একজন বাঙালির এসব থাকলে তাকে নিশ্চয়ই সুখী বলতে অসুবিধা নেই। বিপন্ন একটি মারুতি গাড়ির মালিকও। গাড়িটা এখন চমৎকার চলছে।

তপতী সম্পর্কে বিপন্নর কিছু অভিযোগ ছিল। কোন বাঙালি স্বামীর তা না থাকে! বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে যদি অভিযোগগুলো থেকেই যায় তাহলে তার ধার ভোঁতা হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। তপতী একটু অলস প্রকৃতির। হুটহাট বাইরে বেরুতে চায় না। শরীরের দিকেও নজর নেই। তার মধ্যাঙ্গ যে স্ফীত হচ্ছে তাতে কিছুই এসে যায় না। পেটের গোলমালে কানের দু'পাশের চুল রঙ বদলেছে কিন্তু তা লুকোবার চেষ্টা নেই। বিউটি পার্লারে তাকে পাঠানো যায় না। নিজেকে বয়স্কা দেখানোর ব্যাপারে ওর কোনও আপত্তি নেই। তবে সংসারের যাবতীয় কাজ সে-ই করে। দুবেলা স্বামীকে ভাল রান্না খাওয়াতেই স্ত্রীর দায়িত্ব শেষ—এরকম একটা ধারণা থাকলেও থাকতে পারে।

শরীর ভারি হয়ে যাওয়ায় তপতীর শরীরে চাহিদাও কমে গেছে। বিপন্ন আজকাল আর বেশি অনুরোধ করতে চায় না। রাত্রের কাজ চুকিয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুম ছাড়া অন্যকিছুর ভাবনা তপতী ভাবতে চায় না। সামান্য জেগে থাকলেই নাকি তার রাত্রের ঘুম ঘণ্টা তিনেকের জন্যে চলে যায়! বিপন্ন এখন চমৎকার নিরাসক্ত হয়ে থাকে।

তবে তপতীর সুনাম আছে। আত্মীয়স্বজন ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপারে ওর জুড়ি নেই। কার কবে জন্মদিন তা ও ঠিক মনে রাখে। বয়স্করা বলেন, এরকম বউ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। বিপন্ন এ-ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চায় না।

বিপন্নর বয়স এই আশ্বিনে আটচল্লিশ। রোজ ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে তিন কিলোমিটার হাঁটে সে। সেই সঙ্গে একটু ফ্রিহ্যাণ্ড করে নেয়। পেটে যে মেদ জমছিল সেটা নিয়ন্ত্রণে এসে

গিয়েছে। হাঁটা-চলায় চনমনে ভাব। রঙিন শার্ট প্যান্টের নিচে গুঁজে পরে। জুলপি সাদা হয়ে গেলেও পাঁচজনে সেটা বুঝতে পারে না দামী কলপ ব্যবহার করায়। বিদেশি পারফিউম একবার গায়ে ছড়াবেই সে। আটচল্লিশের বিপন্নকে চল্লিশ বলে ভুল করতে অসুবিধে নেই।

প্রাতঃভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে চাকরের দেওয়া খবরের কাগজ দেখে, চা খেয়ে বাথরুমে ঢোকে বিপন্ন। একটু পরিষ্কার হয়ে লিখতে বসা। বেলা নটা পর্যন্ত সেটা চলে। এই সময়টায় তাকে বিরক্ত করার নিয়ম নেই এই বাড়িতে। টেলিফোনও ধরে না। ন'টায় উঠে তৈরি হয়ে অফিসের জন্যে বেরুনোর সময়টা ঝড়ের মত কাটে। খেতে বসলে তপতী দিনের প্রথম কথা বলে। টাকা-পয়সা চাওয়া বা কোনও জরুরি খবরের সঙ্গে আর-একটু ভাত দেবে কিনা জানতে চায়। ঠিক সওয়া দশটায় অফিসে ঢুকে পড়ে বিপন্ন। বিদেশি ফার্ম। তাদের কাজের চাপও বেশি। লাঞ্চের আগে মাথা তোলার সময় পাওয়া যায় না। এমন কি ওর পাশের চেম্বারে সুন্দরী গুজরাতি মহিলার দিকে তাকানোও সম্ভব হয় না। সাড়ে পাঁচটায় অফিস থেকে বেরিয়ে কলেজ স্ট্রিটে প্রকাশকদের আস্তানায় চলে আসতে হয় কাজ থাকলে। নাইলে মাঝে-মধ্যে ক্লাবে। রাত্রে লেখে না বিপন্ন। নিত্য নিয়ম করে ওষুধ খাওয়ার মত দু পেগ হুইস্কি গলায় ঢালে বই পড়তে পড়তে। রাতের খাওয়ার শেষে তপতীর ঘুমন্ত শরীরের দিকে একবার তাকায় কি তাকায় না সে। বিছানায় পড়লে এখনও রাতভর ঘুম।

এটা একটা জীবন হল? একে কি বেঁচে থাকা বলে? প্রশ্নগুলো ইদানীং বিপন্নকে কেবলই ঠোকরাচ্ছে। সে অনেক ভেবে দেখেছে, তপতীর তাকে বিশেষ প্রয়োজন নেই। মাসের প্রথমে থোক টাকা পেয়ে গেলেই তার সমস্যা শেষ। গত কয়েক মাসে তপতী তাকে কোনও ব্যক্তিগত কথা বলেনি। বাড়িতে মেয়ে ঝি চাকর যেমন আছে তেমনি স্বামীও রয়েছে, এমনই যেন ভাবখানা। ছেলে শিবপুর থেকে প্রথম প্রথম শনিবারে বাড়ি আসত। এখন বন্ধুবান্ধব বেড়ে যাওয়ায় আসার সময় পায় না। মাসিক টাকার বাইরে প্রয়োজন হলেই সেটা মায়ের কাছে নিবেদন করে। মাঝে মাঝে লেখার টেবিলে বসে বিপন্ন সেই বাড়তি টাকার চিরকুট পায়। অর্থাৎ বাপ যদি বেঁচে থাকে এবং টাকার নিয়মিত যোগানের ব্যবস্থা হয় তাহলে ছেলে দিব্যি থাকবে।

এসব কথা ভাবলেই বুকে অস্বস্তি জমে। বিয়ের পর তপতীর ব্যবহার, ছেলের শৈশব ঝাঁপিয়ে চলে আসে সামনে। কী সুন্দর, নরম ছিল সেইসব ছবি। সময় কেমন করে সবকিছু উদাস করে দিল। এই নিয়ে লেখার চেষ্টা করেছে বিপন্ন কিন্তু কিছুতেই জমেনি। সময় কখন কেমন করে দাঁত বের করে এই কায়দাটা লেখায় ধরতে পারেনি সে।

এভাবে চলতে পারে না। এই একভাবে অর্থহীন বেঁচে থাকা; অবশ্য কোনটা অর্থপূর্ণ তাও তো জানা নেই। জানবার সুযোগ পেলে অবশ্য জানা সেই সুযোগটার জন্যে মনে মনে আজকাল ছটফট করে সে। মানুষের একটাই জীবন, একবার শুরু হয়ে শেষ হয়ে যায়। ভারতীয় নারী-পুরুষ যে-বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাই বহন করে যায় শেষ পর্যন্ত। কিন্তু

এক শরীরে দুইরকম জীবনযাপন করা যাবে না? আমি বিপন্নপালক, ছাত্রাবস্থা পর্যন্ত একরকম ছিলাম, বিবাহিত জীবনে তপতীর স্বামী, দিব্যর বাবা, আটচল্লিশ পর্যন্ত একভাবে কাটানোর পর আমার বাকী জীবন অন্যভাবে শুরু করে শেষ করতে পারবে না কেন? সন্ন্যাসীরা যেমন বলেন পূর্বাশ্রমের কথা। অনন্ত হালদার তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত সংসার করে স্ত্রী-পুত্রকে ভাসিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে যদি পরমানন্দ মহারাজ হয়ে দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে মাথা কামিয়ে, তবে বিপন্ন পারবে না কেন। অনন্তর যুক্তি ছিল তাকে ঈশ্বর ডেকেছে। বিপন্নর যুক্তি যদি হয় তাকে হৃদয় মুক্ত হতে বলেছে তাহলে সেটা কি অন্যায় হবে? না, সন্যাস-টন্যাস তার দ্বারা হবে না। ওসব তাকে কখনই টানেনি। সেই একজন সুস্থ মানুষের মত অন্যরকম জীবনযাপন করতে চায়।

শনিবার ছুটির দিন। লেখা ছেড়ে হিসেব নিয়ে বসল বিপন্ন। ব্যাঙ্ক, ইউনিট ট্রাস্ট, এন. এস. সি., এন. এস. এস, ইনস্যুরেন্স মিলিয়ে সাত লক্ষ টাকা এতদিন ধরে লগ্নী করেছে সে। সেগুলো নির্দিষ্ট সময় পার হলে চোদ্দ লক্ষ টাকায় পৌঁছবে। এছাড়া আছে প্রকাশকদের পাঠানো নিয়মিত টাকা। অফিস ছেড়ে দিলে লাখ দুয়েক হাতে আসবে। প্রতি মাসে তপতী যদি দশ হাজার হাতে পায় তাহলে তার রানীব হালে চলে যাবে। সুদ এবং আয়ের টাকার ওপর আয়কর ধরে তপতী ওই টাকা পেতে পারে। এর ফলে কেউ অভিযোগ করতে পারবে না, সে ওদের জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। মাস তিনেক আগে বিপন্নর এক সহকর্মী হঠাৎই মারা গেলেন। তাঁর অভাব তো পরিবারের সবাই এখন স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে। আর সেই ভদ্রলোক তো বেশি কিছু রেখে যেতে পারেননি।

একটি ব্যাপারে দোটানায় পড়ল বিপন্ন। এক জীবনে দুই জীবনযাপন করতে গেলে প্রথম জীবনের কোনও স্মৃতি বহন করা উচিত নয়। এতদিনের অভ্যাস, ধ্যানধারণা সব পাল্টাতে হবে। খুব কঠিন কাজ কিন্তু চেষ্টা করলে হয়ত সম্ভব হবে। কিন্তু দ্বিতীয় জীবন-যাপনের জন্য টাকার দরকার। সেই টাকা সে প্রথম জীবনের অর্জিত টাকা থেকে কী করে নেবে। আটচল্লিশ বছর বয়সে বিপন্নপালক নতুন জায়গায় গিয়ে করুণাসুন্দর নাম নিয়ে চাকরি পেতে পারে না। চাকরির জন্যে তাকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। এতদিন কী করছিল তার কৈফিয়ত চাইবে নিয়োগকর্তা। তার মানেই প্রথম জীবনের কাছে হাত পাতা। অবশ্য নতুন লেখা লিখে কাগজ এবং প্রকাশকদের কাছ থেকে টাকা পেতে পারে। কিন্তু সম্পাদক প্রকাশকরা বিপন্নপালকের লেখা ছাপতে যেভাবে উৎসাহিত হবে করুণাসুন্দরের লেখায় নিশ্চয়ই হবে না। করুণাসুন্দর তাঁদের কাছে একজন নতুন লেখক। টাকা আসবে বিপন্নপালকের নামে। সেক্ষেত্রে লেখালেখি থেকে কোনও রোজগার হবে না দ্বিতীয় জীবনে যদি সে বিপন্নপালককে মেরে ফেলে। এই সমস্যায় বিব্রত হয়ে সে শেষ পর্যন্ত স্থির করল একটু সমঝোতা করা যাক। বিপন্নপালক যদি করণাসুন্দরকে কিছু দান করে তাতে অন্যায় কী! এই শরীরটাই তো বিপন্নপালকের যা সে করুণাসুন্দরকে দিয়ে দিচ্ছে। মাসে চার হাজার টাকার

ব্যবস্থা থাকলে দ্বিতীয় জীবনটা চমৎকার কাটানো যাবে একা একা। চার হাজার মানে ব্যাঙ্কে জমা থাকতে হবে চার লক্ষ টাকা। এই টাকাটার ব্যবস্থা করতে হবেই।

অনেকদিন থেকেই মাথায় একটা ইচ্ছে ঠোকর মারছিল। বেশ ছিমছাম নির্জন পাহাড়ি জায়গায় থাকলে কেমন হয়! ঠাণ্ডা তার খুব পছন্দের। কুয়াশা দল বেঁধে উঠে আসবে, ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা থেকে জলের ফোঁটা ঝরবে। বেশ স্বপ্ন-স্বপ্ন ব্যাপার। ভারতবর্ষের পাহাড়ি শহরগুলো তার দেখা হয়ে আছে। বড় শহর দার্জিলিং, সিমলা, মুসৌরিতে নয়। সেখানে বহু মানুষের ভিড়, নিত্য ট্যুরিস্টদের আনাগোনা। একটু অখ্যাত অথবা নির্জন জায়গা প্রয়োজন। দুটো নাম মনে এসেছে। একটি ডালহৌসি অন্যটি ঘুম। বাঙালি ট্যুরিস্ট চট করে ডালহৌসিতে বেড়াতে যায় না। ঘুমের ওপর দিয়ে দার্জিলিং-এ যেতে হয় বলে যায়, বেড়াতে থাকতে সেখানে নামে না। ডালহৌসি অনেকদূর। কিন্তু ঘুম চেনাজানার মধ্যে। বিপন্নকে ঘুমই টানতে লাগল। কিছুদিন আগে সে শিলিগুড়িতে সাহিত্যসভা করতে গিয়ে ফাঁক পেয়ে ঘুমে বেড়াতে গিয়েছিল। ছবির মত জায়গা। তার কল্পনার সঙ্গে চমৎকার মিল। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস। কিছু সরকারি অফিস। পাহাড়ের অন্যধারে কিছু সুন্দর বাংলো বাড়ি। দুটো বাড়ির গেটে টু-লেট সাইনবোর্ড দেখেছে বিপন্ন।

অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে তপতীর ভবিষ্যতের দিকে হাত না বাড়িয়ে বিপন্ন চারলক্ষ টাকার ব্যবস্থা করে ফেলল। এইসময় তার মনে হল, শরীরটাকে যখন বদলাতে পারছে না তখন নাম পরিবর্তনের চেষ্টা কেন। কেউ চিনতে পারলে তাকে জালিয়াত বলে ভাবতে পারে। নামে কী এসে যায়! সে শুধু দ্বিতীয় জীবনের স্বাদ এক জীবনে নিতে চাইছে। তার জীবন-যাপন হবে একেবারে অন্যরকম। নামের সঙ্গে তো কোন সংঘাত নেই। ঘুমে যে ব্যাঙ্ক দেখে এসেছিল তার কলকাতার শাখায় সে বিপন্নপালক নামেই চারলক্ষ টাকা রেখে অ্যাকাউন্ট খুলল। ঘুমে পৌঁছে টাকাটা ওই ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করিয়ে নেবে।

এ যেন একটা যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি। প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে অত্যন্ত সতর্কভাবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে। কিছু ব্যাপারে অবশ্য অসুবিধে হচ্ছে। যেসব প্রকাশক সম্পাদক অগামী বছরের পরিকল্পনা তাকে নিয়ে করেছেন তাঁদের সরাসরি না বলে দিতে হচ্ছে। তাঁরা অবাক হয়ে কারণ জানতে চাইলে বিপন্ন বলেছে সে এখন কিছুকাল বিশ্রাম নেবে, কোনো নতুন লেখা নয়। এব্যাপারে প্রচুর উপদেশ শুনতে হচ্ছে কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে অটল। প্রকাশক সম্পাদকরা ভাবছেন সে চাপ দিয়ে নিজের দাম বাড়াতে চাইছে।

প্রথম জীবনের কোন আকর্ষণ তাকে টেনে রাখতে পারছে না, শুধু—। হ্যাঁ, লেখালেখির ব্যাপারটা তাকে কিছুটা ভাবিয়েছে। প্রথম জীবন বাতিল করতে হলে লেখালেখিও ছাড়তে হয়। সেই কবে কলেজে পড়ার সময় লেখার নেশায় পড়েছিল বিপন্ন। একদিন না লিখতে পারলে পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে যেত। লিখতে লিখতে সে একসময় লেখক হয়ে গেল। প্রথম

প্রথম লেখার প্রশংসা শুনলে কী ভালই না লাগত। নিন্দে শুনলে বিশ্রি হয়ে যেত দিনটা। অন্যের লেখা পড়ার জন্যে তখনই সময় পেত এবং ইচ্ছেও থাকত। তারপর যখন ধাপে ধাপে জনপ্রিয়তা এল তখন ওইসব বোধগুলো ভোঁতা হয়ে গেল কখন কোন ফাঁকে। এখন একটা উপন্যাস মানে অগণিত পাঠকদের মন জয় করা, একটা উপন্যাস মানে বছরে অন্তত তিনটে সংস্করণ। একটা উপন্যাস মানে বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা। হিসেবটা অজান্তেই স্থায়ী হয়েছে। লিখতে লিখতে বিপন্ন বড্ড বুঝে গেছে পাঠকদের প্রিয় হবার জন্যে যেসব লেখক ফর্মুলার ওপর নির্ভর করেন তাঁদের আয়ু বোঝার আগেই শেষ হয়ে যায়। এখনও বাঙালি পাঠক আদর্শবান চরিত্র পছন্দ করে, সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই-করা নারী চরিত্র এখনও পাঠকের প্রিয়তমা হয়ে ওঠে। পাঠক নিজের জীবনে যা পারেন না তা সাহিত্যের কোনো চরিত্র করতে দেখলে উৎসাহিত হন। আর এই সঙ্গে গল্প বলার সাবলীল ভঙ্গি যদি মিশে থাকে তাহলে কথাই নেই। হয়ত এটাও একধরনের ফর্মুলা কিন্তু সেটা সাইনবোর্ডের মত সামনে ঝুলে থাকে না বলেই বিপন্ন আজ সফল। শুরু করলে শেষ না করে উপায় নেই, ওর লেখা সম্পর্কে নিন্দুকদেরও এই অভিমত।

আর এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে লেখা এখন প্রয়োজনীয় কর্ম ছাড়া অন্য কোন ভূমিকায় নেই বিপন্নর কাছে। লেখার টেবিলে না বসলে দিনটা নষ্ট হয়ে গেল এই অনুভূতিও অনেককাল আগেই মরে গেছে। অন্যের লেখা সে পড়ে না, ধারাবাহিক না হলে নিজের লেখাও পড়তে ইচ্ছে করে না। ধারাবাহিকের ক্ষেত্রে যোগসূত্র বজায় রাখতেই পুরোনো কিস্তি পড়তে হয়। তাই দ্বিতীয় জীবনে লেখা ছেড়ে দিলে খুব একটা কষ্ট হবে বলে তার বিশ্বাস হয় না। গত পুজোর পর দেড়মাস সে একটা শব্দও লেখেনি, কই, তাতে তো কোনো কষ্ট হয়নি। বরং লিখতে হবে না বলে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। হয়ত একটু বাড়াবাড়ি, তবু আজ বিপন্নর মনে হল, সে বেশ সহজভাবেই লেখা ছেড়ে দিতে পারবে।

মানসিকভাবে তৈরি হবার পর আজ রাত্রে সে তপতীর সঙ্গে কথা বলল। রাত্রে তপতী যেমন ব্যস্ত থকে এবং ব্যস্ততার পরে বিছানার দিকে শরীর এলিয়ে দিতে এগোয় তেমনি আজও ব্যতিক্রম ছিল না। বিপন্ন গম্ভীর গলায় বলল, 'শুয়ো না, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

তপতী হাই তুলল, 'এতরাত্রে আবার কী কথা?'

'তুমি আগে বসো।'

'না বাবা। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। সারাদিন ধরে এত খাটুনির পর এখন আর বসতে পারব না। এখন নাটক করার কী আছে!' তপতী শুয়ে পড়ল।

'তোমার কি আমার সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না?'

'মানে! সারাদিন ধরেই তো বলছি।'

'সারাদিন? আজ তুমি আমার সঙ্গে কটা কথা বলেছ?'

শুয়ে শুয়েই তপতী মনে করার চেষ্টা করল, 'দূর! আমার অত মনে থাকে না।'

'তপতী, আমার এইরকম জীবন ভাল লাগছে না!'

'আমার জন্যে?' তপতী বেশ অবাক।

'না। তুমি নও। সব মিলিয়েই। এ জীবন আমার খুব একঘেয়ে লাগছে।'

'একঘেয়ে তো সবার লাগে। আমার লাগে না? শনি রবি খোকা এলে অন্যরকম মনে হয়। বাকি কদিন কাটতেই চায় না। এ আর নতুন কী!'

'তোমার কি মনে হয় না এই একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দরকার?'

'দূর। ঘুমোতে দাও তো। তিনকাল চলে গেল এখন উল্টো-পাল্টা ভাবনা।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'বেশ তো, কোথাও বেড়িয়ে এসো, একঘেয়েমি কেটে যাবে। যতদিন ইচ্ছে ততদিন থাকো বাইরে।'

'তোমার কোনো অসুবিধে হবে না?'

'আমার কিসের অসুবিধে? সংসারের কোন কাজে লাগ তুমি? মাসকাবারি টাকাটা পেলেই হল। তবে বাইরে গেলে লিখতে পারবে?'

'আমার আর লিখতেও ইচ্ছে করে না।'

'না লিখলে চলবে কী করে?'

'যা জমেছে, যা পাবে তাতে দিব্যি চলে যাবে।'

তপতী পাশ ফিরে শুলো, 'যা ভাল বোঝ তাই কর।'

বিপন্ন স্ত্রীর দিকে তাকায়। একটু বাদেই নাকের পাটা ফুলবে। সে বিছানায় পাশে চলে এল, 'তপতী, বেড়াতে গিয়ে আমি যদি আর কখনও ফিরে না আসি—'

তপতী তাকাল, 'মতলবটা কী?'

'আমার এই সংসারে থাকতে ভাল লাগছে না।'

'সন্ন্যেসী হবে?'

'না! কোথাও চলে যাব।'

'আমাকে ঘুমোতে দাও।' আবার চোখ বন্ধ করল তপতী।

বিপন্ন সরে এল জানলায়। অন্ধকারে কলকাতা বড্ড চুপচাপ। এই বয়সে এসে তপতী আর নতুন কিছু ভাবতে চায় না অথবা ভাবার ক্ষমতাটাই চলে গেছে। বিয়ের বছরখানেক পরে এইসব কথা শুনলে কেঁদেকেটে একসা করত। এরই নাম জীবন। থাকগে, কথা তো বলাই হল। অন্তত কেউ বলতে পারবে না—সে না বলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

পরের দিন অফিসে গিয়ে পদত্যাগপত্র দাখিল করল বিপন্ন। ভেবেছিল এই নিয়ে খুব হই-চই হবে। কিন্তু দেখা গেল সবাই ব্যাপারটাকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেখছে। এত নামী

লেখক, যার লেখার টাকায় ছাতা পড়ছে, সে এতদিন অফিসের আইনে নিজেকে আটকে রেখেছিল সেটাই যেন আশ্চর্যের। পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়ে গেল। অফিস থেকে মোটা টাকার চেকও পেয়ে গেল সে। তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে তপতীর নাম জড়িয়ে আছে। অবর্তমানে টাকা তুলতে কোন অসুবিধে হবে না তপতীর। শুধু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নয়, যাবতীয় সঞ্চয়ে দুজনের নাম আছে। এ ব্যাপারে তাকে কোনো প্রয়োজন হবে না। কলেজ স্ট্রিটে ঘুরে প্রকাশকদের নির্দেশ দিয়ে দিল লিখিতভাবে, তার প্রাপ্য টাকা যেন নিয়মিত তপতীর কাছে পৌঁছায়। কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছে সে। না ফেরা পর্যন্ত এই অবস্থা, প্রকাশকদের বোঝাল বিপন্ন। একটা ফাইল তৈরি করে তার কোথায় কী আছে প্রকাশকদের কাছে ওইদিন পর্যন্ত কত টাকা পাওনা আছে তার বিশদ বিবরণ লিখে রাখল তপতীর সুবিধের জন্যে।

এক বিকেলে বাড়ি ফিরে বিপন্ন ঘোষণা করল, 'আজ সন্ধ্যের ট্রেনে বেড়াতে যাচ্ছি।'

তপতী ভি-সি-আরে ছবি দেখছিল কাজের লোকদের নিয়ে, জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়?'

'দ্বিতীয় জীবনে।'

ঠোঁট ওল্টালো তপতী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কখন ট্রেন?'

'সাতটায়।'

'স্যুটকেশ গুছিয়ে দেব?'

'না। তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। আমিই নিচ্ছি।'

ঘরে ঢুকে স্যুটকেশ নামিয়ে ফাঁপরে পড়ল বিপন্ন। যা নিয়ে যাবে তাই তো প্রথম জীবনের স্মৃতি। স্মৃতি বহন করা কি উচিত হবে? শরীর বাতিল করা যায় না বলেই পরিবর্তনের কথা ওঠে না।

বেরুবার সময় সে আবার তপতীর সামনে এসে দাঁড়াল, 'চললাম!'

'কবে ফিরছ?'

'জানি না।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'পাহাড়ে।'

'গরম জামা কাপড় নিয়েছ?'

'নিয়ে নেব।'

'স্যুটকেশ কোথায়?'

'সবই তো ওখানে পাওয়া যায়। সঙ্গে বয়ে নিয়ে গিয়ে কি হবে?'

'কী ব্যাপার বল তো?' টিভির সামনে থেকে উঠে এল তপতী।

'কিসের কী!' হাসল বিপন্ন।

'তোমার কথাবার্তা অন্যরকম লাগছে?'

'কী রকম?'

'বেঁকা বেঁকা। তুমি তো এমনভাবে কথা বল না।'

'তোমার কানের দোষ!'

'তা তো বলবেই। যা কিছু ত্রুটি আমারই। এতই যদি দোষ তাহলে বিয়ে করলে কেন?'

তপতীর গলা আচমকা টিভির আওয়াজ ছাপিয়ে গেল। কাজের লোকগুলো মুখ ঘুরিয়ে দেখল। অনেকদিন কাজ করেও তারা তপতীকে এমন গলায় বিপন্নর সঙ্গে কথা বলতে শোনেনি।

প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল বিপন্নর। 'তুমি এদের সামনে এভাবে চেঁচাচ্ছ?'

'ঠিক করেছি! ক'দিন থেকে শুধু ঠারেঠুরে আমাকে ঠোকা হচ্ছে। আমি মোটা হয়ে গেছি, শরীরের যত্ন নিই না, একঘেয়ে হয়ে গেছি। নিজে কার্তিক সেজে থাক বলে আমাকেও সেই সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে? ছেলের মুখ চেয়ে আমি বেঁচে আছি।' হঠাৎ গলায় যেন কিছু আটকাল, তপতী দৌড়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেল।

বিপন্ন তাকে অনুসরণ করল, 'ন্যাকামি করো না। আমি যা বলেছি তার কোনটে মিথ্যে? বলো? তোমাকে বলতেই হবে। জীবনে বৈচিত্র্য আনার জন্যে তুমি কিছু করেছ?'

বিছানায় বসে কান্না থামিয়ে তপতী ফুঁসে উঠল, 'তুমি কী করেছ?'

বিপন্ন চিৎকার করল, 'যথেষ্ট করেছি। যখন আমাকে বিয়ে করেছিলে তখন মাইনে পেতাম পনের শ' টাকা। আজ তোমার ঝি চাকর ড্রাইভারের মাইনে তার 'বেশি।'

'ও!' অদ্ভুত সুরে টানল শব্দটি তপতী, 'তুমি আমায় টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছ না?'

'বাজে বকো না। টাকা না রোজগার করলে এই বাড়িতে থাকতে পারতে না, ছেলেকে শিবপুরে পড়তে পাঠানোও যেত না। আমার কথা কিছু ভেবেছ তুমি? আমি যাতে খুশি হই এমন কাজ কখনও করেছ? তুমি—তুমি সংসারসর্বস্ব স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছুই নও।'

'তুমি এই ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলছ?'

'বেশ করেছি। অনেক আগেই বলা উচিত ছিল।'

'এতদিনে তোমার মুখোশটা তবে খুলল!'

'তোমারও। আজ ঝি চাকরের সামনে আমাকে অপমান করেছ তুমি!'

'তুমি করোনি? সভা সমিতির নাম করে সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে এত ঢলাঢলি, এতে আমার অপমান হয়নি? আজ বর্ধমান, কাল দুর্গাপুর, সভা লেগেই আছে। সেখানে সভা হচ্ছে না ফুর্তি হচ্ছে তা কে জানতে পারছে?'

'তপতী?' চেঁচিয়ে উঠল বিপন্ন। তার শরীর কাঁপছিল।

'চিৎকার করো না। সেদিন, একটা কুড়ি বছরের মেয়ের সঙ্গে কী মিষ্টি গলায় কথা। মেয়েটা এসে যেই বলল—আমি আপনার অন্ধ ভক্ত, কী সুন্দর লেখেন আপনি, আপনাকে একবার দেখতে পাব বলে অনেক দূর থেকে ছুটে এসেছি—অমনি কোয়ালিটির আইসক্রিম হয়ে গেলে। ছি ছি ছি। একবারও মনে হল না মেয়েটা তোমার ছেলের বয়সী।'

'তুমি এত নীচ, তোমার মন এত নোংরা?'

'হ্যাঁ আমি নীচ হব, নোংরা হব! আর উনি চুলে কলপ মেখে হাঁটুর বয়সী মেয়েদের সঙ্গে কেষ্টলীলা করবেন সেটা মহৎ ব্যাপার।'

'মুখ সামলে কথা বল তপতী।'

'কেন? মারবে নাকি? মারো। এসো। তাতেও বুঝব পৌরুষ আছে।'

'ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না করছে আমার। এতদিন মনে এই প্যাঁচ পুষে রেখেছিলে! আমি যাচ্ছি, এজীবনে তোমার কাছে ফিরে আসব না।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল তপতী, 'তা তো যাবেই, নিশ্চয়ই কোন শাকচুন্নিকে মনে ধরেছে। আমি তখনই বুঝেছি, অত সাজের বাহার যখন তখন নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে। মর্নিং ওয়াক! হুঁ। রোগা হয়ে যুবক সাজা। এসব আমার জানা ছিল।'

'তোমার মন কী নোংরা হয়ে গেছে তপতী! স্টেশনে চল, গিয়ে দেখবে কেউ সঙ্গে যাচ্ছে কিনা।' ফোঁস করে উঠল বিপন্ন।

'আমার বয়ে গেছে স্টেশনে যেতে।'

'না। তোমাকে যেতেই হবে। নইলে দুনিয়ার লোককে এই মিথ্যেটা বলে বেড়াবে। তৈরি হও।' বিপন্ন নিচে নেমে এল। চাকরকে বলল ট্যাক্সি ডাকতে। ওপর থেকে তপতী চেঁচাল। চাকরকে ডেকে বলল, 'ট্যাক্সি ডাকবি না। স্টেশনে যখন নিয়ে যেতে চাইছে তখন সেখানে শাকচুন্নি নিশ্চয়ই নেই। যেখানে যাচ্ছে সেখানেই তিনি রয়েছেন। দেখতে হয় সেখানেই যাব আমি।'

বিপন্ন দৌড়ে ওপরে উঠে এল, 'তুমি আবার চাকরের সামনে আমাকে অপমান করছ?'

'বেশ করেছি। তুমি ফুর্তি করতে যাবে আর আমি তোমাকে পুজো করব?'

'ঠিক আছে। ভালই হল। যেটুকু বন্ধন ছিল আজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমার নামে তুমি বদনাম দেবে তা আমি সহ্য করব না। তোমাকে ঘুমে যেতে হবে।'

'ঘুম? তুমি আমাকে ঘুম পাড়াতে চাও? ঘুমের ওষুধ খাওয়াবে নাকি? আমাকে মেরে ফেলার মতলব?' তীব্র চিৎকার ছিটকে বেরিয়ে এল তপতীর গলা থেকে।

'দূর অশিক্ষিত! ঘুম হল একটা জায়গায় নাম। সেখানে আমি বাকি জীবন থাকব।'

'কার সঙ্গে?'

'একা। স্রেফ একা।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'ঠিক আছে, চল, দেখে এসো। কিন্তু একটা শর্ত, কাউকে ঠিকানা দেবে না।'

'কেন?'

'আমি এই জীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমার কাউকে ভাল লাগছে না। তোমাকে না, এ বাড়িকে না, কাউকে না।'

'আমাদের চলবে কি করে?'

'সব ব্যবস্থা রেখেছি। ওই ফাইলে সব হিসেব পাবে। শোনো, আমি ভদ্রলোক বলে তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি, নইলে না বলে কেটে পড়লে তুমি টেরও পেতে না।' বিপন্ন ঘড়ি দেখল। ট্রেন ছাড়তে আধঘণ্টা বাকি। সে ছটফটিয়ে উঠল।

তপতী মুখ ঘোরাল, 'হুট বললেই যাওয়া যায় না। সংসার গুছিয়ে যেতে হবে। কালকের আগে পারব না। তোমার আর কি! এই সংসারটাকে নিজের বলে তো কোনোদিন মনে করোনি।'

ট্রেনে নয়, বাড়তি পয়সা খরচ করে বিপন্ন স্ত্রীকে নিয়ে প্লেনে চেপে বাগডোগরাতে নামল। কাল সন্ধ্যের পর আর কোনো কথা হয়নি। গতরাত্রে একটু বেশি মদ্যপান হয়ে গিয়েছে বিপন্নর। সেই সময় মনে হচ্ছিল দিনটা অন্যদিনের থেকে একদম আলাদা। এই জীবনের যা কিছু স্মৃতি ছেড়ে যাওয়ার সময়ে অমন আলাদা হওয়াটাই স্বাভাবিক। অনুভূতি তাই বেশ নতুন। মানুষ মরে যাওয়ার পরেও প্রিয়জনের হাতে আগুন মুখে নেয়, নিতে বাধ্য হয়, তেমনি তপতীকে নিয়ে এই শেষযাত্রা। বিপন্নর অবশ্য মনে পড়ল না শেষবার কবে তপতী তার সঙ্গে বেরিয়েছে!

ট্যাক্সি থেকে নেমে বিপন্ন জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবে?'

'না।' গম্ভীর মুখে বলল তপতী।

'শালটায় ঠাণ্ডা আটকাচ্ছে?'

তপতী জবাব দিল না।

বিপন্ন দেখল ঘুম শহরটাকে যেন আগের চেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে। সে ভেবে রেখেছিল একদিন হোটেলে থেকে আগেরবার দেখা বাড়িগুলোর তল্লাস নেবে, কোনটে ভাড়া পাওয়া যায়! স্টেশনের কাছেই একটা ভদ্র হোটেলে ওরা উঠল। এখন বিকেল হয়ে এসেছে। সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। বিপন্ন বলল, 'তুমি বিশ্রাম নাও, আমি বাড়ি দেখে আসছি।'

'অসম্ভব!'

'মানে?'

'আমাকে একা রেখে সেই শাকচুন্নির সঙ্গে দেখা করার মতলব তোমার। আগেভাগে গিয়ে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখবে, এ আমি হতে দেব না।'

'বেশ তুমিও চল আমার সঙ্গে।'

তপতী এক পায়ে খাড়া। বেশ ভারি হয়ে গেল বিপন্নর মন। কিন্তু সে নিজেকে বোঝাল তপস্যার পথে মুনি-ঋষিরা এর চেয়েও বেশি প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়েন! হোটেলের ম্যানেজার অবাঙালি। দেখে মনে হয় সজ্জন। বিপন্ন তপতীকে দাঁড় করিয়ে লোকটির সঙ্গে

আলাপ করল। উদ্দেশ্য জানাতে ভদ্রলোক বললেন, 'কটা বাড়ি চান বলুন। আগে হলে মুশকিল হত। আন্দোলনের পর সব খালি পড়ে আছে। আপনার বাজেট কত?'

সেই সন্ধ্যের মধ্যেই একটা দু' কামরার বাংলো ভাড়া পেয়ে গেল বিপন্ন। মাসিক ভাড়া আটশো। বাড়িওয়ালা সেই হোটেলেরই মালিক। স্টেশন থেকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ আর সুবিধে হল বাড়িটি সাজানো। টেবিল চেয়ার থেকে আলমারি পর্যন্ত রয়ে গেছে। আগের ভাড়াটে অন্দোলনের সময় চটজলদি চলে গিয়েছেন বলে কিছুই নিয়ে যেতে পারেননি। পরদিন সকালে বিছানাপত্তর, স্টোভ হাঁড়ি বাসন কিনে গৃহপ্রবেশ করল বিপন্ন। তপতী তার সঙ্গে সবসময় থেকেছে কিন্তু একটা কথাও বলেনি।

হোটেলের মালিকই এক বৃদ্ধা নেপালি মহিলাকে ঠিক করে দিয়েছিলেন। দুবেলা এসে রান্না এবং অন্যান্য কাজ করে দেবে সে। নতুন বাড়িতে খোলা জানালার পাশে বসে পাহাড় দেখতে দেখতে বিপন্ন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'আঃ, এই হল জীবন। তা দেখলে তো, আমার এখানে কোন মহিলা নেই। খালি খালি সন্দেহ কর।'

এই প্রথম তপতী বলল, 'এখানে তুমি বাকি জীবন থাকবে?'

'ইয়েস ম্যাডাম।'

'ঠাকুরঘর নেই, এঁটোকাটার বাছবিচার নেই, এইভাবে?'

'গুলি মারো ওসবের! প্রথম জীবনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'আমার আছে।' •

'তুমি তো ফিরে যাবে বলেই এসেছ। সন্দেহভঞ্জন হয়েছে, চলে যেতে পার।'

'যাবই তো।'

এগারটা নাগাদ রান্না শেষ করে বৃদ্ধা চলে গেল। কলকাতা থেকে আনা ভদকার বোতল খুলল বিপন্ন। তপতী হতভম্ব, 'তুমি এখন মদ খাচ্ছ? এই সময় কখনও খাও?'

'নতুন জীবনে সব কিছু নতুন। ফ্যাচ ফ্যাচ করো না।' বিপন্ন গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'আঃ। আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমোচ্ছে।'

'তুমি নিজের হাতে খাবার বেড়ে খাবে?'

'ইচ্ছে হলে খাব।'

'পারবে?'

'ওঃ, সব পারা যায়!'

তপতী পাশের ঘরে চলে গেল।

একটা নাগাদ বেশ ঢুলু ঢুলু নেশা হল বিপন্নর। চারপাশের কুয়াশার দঙ্গল। সে টলমলে পায়ে দরজায় দাঁড়াল। ইটস নিউ লাইফ, নতুন জীবন।

'স্নান করবে না?' পেছনে তপতীর গলা।

'স্নান? নো স্নান। এখন আমি ঘুমাবো।' ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল বিপন্ন। পড়তেই ঘুম।

ঘুম ভাঙ্গল বিকেলে। বেশ খিদে পাচ্ছে। চোখ মেলে দেখল তপতী গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসে। হাই তুলে বিপন্ন বলল, 'যাই, খাবার গরম করি। তুমি খেয়েছ? আমার জন্যে অপেক্ষা করা কেন?' তিনটে দেশলাই খরচ করে সে স্টোভ জ্বালালো। মাংস গরম করা যায়, কিন্তু ভাত? অবশ্য গরম ভাত খেতে হবেই এমন কোন মানে নেই। যেটুকু পারল করে সব টেবিলে নিয়ে এলে সে, 'এসো। খাবে তো।'

'এ বিকেলে আমি ভাত খাব না।'

'অলটারনেটিভ কিছু নেই। আমি খাচ্ছি।' ভাতে মাংস ঢালল বিপন্ন। প্রথমবার মুখে দিয়ে বুঝল অসম্ভব ঝাল। লঙ্কা খাওয়ার অভ্যেস নেই তার। সব তরকারিতে মিষ্টি দিয়ে দিয়ে অভ্যেসটা পাল্টে দিয়েছে তপতী। দু'গ্রাস গিলে সে হাত গুটিয়ে নিল, 'বড্ড ঝাল দিয়েছে। বলতে হবে বুড়িটাকে।' সে হাত ধুয়ে নিল। নিয়ে হাসল, 'কলকাতায় হলে রাগারাগি করতাম। এখন করলাম না। নতুন জীবনে এসব হবেই।'

তপতী কিছু বলল না।

'তুমি চুপ করে আছ যে?'

'দেখে যাচ্ছি।'

'বাঃ। চমৎকার। কবে যাচ্ছ?'

'এখনও কিছু দেখা বাকি আছে।'

'ও। যাই বলো, আজকের দিনটা একদম আলাদা। কোনো একঘেয়েমি নেই।'

'আজ নেই। পরশু হবে কিংবা তার পরের দিন।'

'দূর! অত ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। বাইরে যাবে?'

'বেড়াতে?'

'হ্যাঁ। মানে, হোটেলে গিয়ে কিছু একটা খেয়ে আসা যাক।'

হোটেলে খেয়ে ফিরতে ফিরতে রাত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল ওরা। এসে দেখল কাজের বুড়িটা জড়োসড়ো হয়ে বসে। দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছিল।

তপতী তাকে আজকের মত ছুটি দিয়ে দিল।

ঘরে ঢুকেই বিছানায় লেপের তলায় ঢুকে গেল বিপন্ন। টেবিলে তখনও এঁটো ভাত মাংস ছড়িয়ে। তপতী জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলোর কি হবে?'

'বুড়িটা চলে গেল, না। যাকগে। কাল ও এসে পরিষ্কার করবে।'

তপতী কথা না বলে টেবিল পরিষ্কার করতে লেগে গেল। মিনিট পাঁচেকের জন্যে তাকে দেখা গেল না। তারপর সে ফিরে এল দু' কাপ কফি নিয়ে।

উৎফুল্ল হল বিপন্ন। হাত বাড়িয়ে কফি নিয়ে বলল, 'গ্রাণ্ড। নেপালি বুড়িটা আর তোমার পার্থক্য কি জান? না বললেও তুমি মনের কথা বুঝে নাও।'

'তাই? ভাবছি কলকাতায় ফিরে গিয়ে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেব।'

'কেন?' থমকে গেল বিপন্ন।

'আমার একটি বউ চাই।' কেটে কেটে বলল তপতী।

'বউ? তোমার? তুমি একজন স্ত্রীলোক।'

'তাতে কি হয়েছে? তোমার দ্বিতীয় জীবনে সব কিছু উল্টো হতে পারে যদি তবে আমার হবে না কেন?'

'যদি কোনো মেয়ে রাজী হয় তাহলে তাকে বিয়ে করবে?'

'নিশ্চয়ই। সে আমার মনের কথা বুঝে নেবে, তার ওপর সব রকম অত্যাচার করতে পারব, রাতদিন সে খেটে যাবে আমার জন্যে, বিয়ে করব না কেন?'

নিশ্বাস ফেলল বিপন্ন, 'তোমার দ্বিতীয় জীবনটা দেখতে লোভ হচ্ছে। আমারটা তো তুমি দেখে গেলে।'

'কাল সকালেই আমি ফিরে যাব।'

'কালই?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ।'

রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে বিপন্ন নিজেকে বোঝাল, তপতী তার প্রথম জীবনের স্ত্রী। এখন কোন সম্পর্ক নেই। এটা ভাবতেই শরীরে রোমাঞ্চ এল। আজকের এই দিনটার সঙ্গে ফেলে আসা জীবনের কোন মিল নেই। এমন ঠাণ্ডাতেও তার ঘুম আসছিল না। সে লেপের তলায় শুয়ে নড়াচড়া করছিল। তপতী ধমকালো, 'কী হচ্ছে?'

'ঘুম আসছে না। হুইস্কি খাই নি তো।'

'খেতে কে নিষেধ করছে?'

'ইচ্ছে হচ্ছে না!'

তপতী হাসল, 'তোমার দ্বিতীয় জীবনটাকে এতক্ষণে ভাল লাগল। প্রথম জীবনে যা যা করতে তা দ্বিতীয় জীবনে করা উচিত নয়। দুপুরে ভদকাও খেও না।'

'ঠিক আছে।' বিপন্ন জড়িয়ে ধরল তপতীকে।

'একি?' অস্ফুটে বলে উঠল তপতী।

'প্রথম জীবনে ইদানীং তোমাকে জড়িয়ে ধরার কথা মনে আসত না। ধরতামও না। দ্বিতীয় জীবনে সেটা নিশ্চয়ই করা যায়। কাছে এসো, বড্ড ঠাণ্ডা।' জড়ানো গলায় বলল বিপন্ন।

ব ঙ্গ আ মা র জ ন নী আ মা র

দোয়েল পাখিদুটোর দিকে তাকিয়ে ইমনের হঠাৎ মনে হল ওরা যে কোন মুহূর্তে ডানা নেড়ে আকাশে উঠে যাবে। তারপর শূন্যে ভাসতে ভাসতে বাংলা একোডেমির চত্বরে গিয়ে বইমেলা দেখে নিতে পারে। মনে হওয়া মাত্র তার বেশ মজা লাগল। মাটিতে দাঁড়ানো মানুষেরা এই বিশাল পাখিদুটোকে জীবন্ত দেখলে দোয়েল বলে ভাবতেই পারবে না, আতঙ্কে ছুটোছুটি করবে।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নিষ্প্রাণ পাখিদুটো এ ওর ডানার ছায়ায় চুপচাপ বসে থাকে। যদি কথা বলতে পারত, কি কথা বলত ওরা?

আজকাল ইমনের মাথার প্রায়ই এইসব উদ্ভট ভাবনা ঢুকে পড়ছে। কোন কিছু দেখলে হঠাৎই তার চেহারাটা অন্যরকম হয়ে যায়। সেদিন একটি ছবি দেখছিল ম্যাগাজিনে। পাহাড়ি উপত্যকায় মেষ-পালকেরা মেষ চরাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের অজান্তে একটা অন্য ছবি তৈরী করে নিল। পাঁচিল ঘেরা চত্বরে একটার পর একটা মেষকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মেষগুলো আনন্দে ঢুকছে। কিন্তু ক্রমশ জায়গাটা ভরাট হয়ে গেল। এ ওর শরীরের সঙ্গে লেপ্টে দাঁড়িয়ে। বেরুবার অন্য দরজাগুলো একদম বন্ধ। তাদের ওপর লেখা আছে, সেশন জট।

ইমনের বয়স তেইশ। রোগা এবং লম্বা। চোখদুটো খুব উজ্জ্বল, সহজেই চোখে পড়ে। গায়ের রঙ শ্যামলা। ইমনের বাবা সাধারণ চাকরি করেন, ঘুষ নেন না। এখনও ওদের বাসায় টিনের ছাদ, উঠোনে কাঁঠাল গাছ। যদিও একটা টিভি কোনমতে কেনা হয়েছে। গাড়ি কেনার স্বপ্ন ওর বাবার নেই। সামর্থ্যও। জ্ঞান হবার পর থেকেই ইমন শুনে এসেছে ওর বাবা উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে যে সব মানুষ শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে তাঁকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। সেইসময়ের একটা খবরের কাগজ বাসায় এখনও সযত্নে মা রেখে দিয়েছেন যাতে বাবার নাম ছাপা হয়েছিল। তখন বাবা ছাত্র ছিলেন। এখন তিনি সাধারণ কর্মচারী। অবসর নেবার সময় হয়ে গিয়েছে। রাজনীতি করেননি কখনও। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক মাস ঘরছাড়া ছিলেন। কিন্তু ফিরে এসে নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে ঘোষণা করেননি। নিজের কথা বাবা কখনও বলেন না। ইমন এসব শুনেছে মায়ের কাছে।

ইমন জানে তার ওপর সবাই অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে। বাবা অবসর নেবার পরই সংসারে ঝড় উঠবে। সেইসময় তার আয় করা খুবই জরুরী। সে যদি পাশ করতে পারত,

একটা চাকরি পেত—! কিন্তু পাশ করলেই তো চাকরি পাওয়া যায় না। মাস্টার্স করে কত ছেলে বেকার। পিওনের চাকরির জন্যে এখন গ্রাজুয়েটরাও লোভীর মত অপেক্ষা করে। তাহলে? দিলারা বলেছিল, 'আপনি ক্যানাডায় চলে যাচ্ছেন না কেন? যদি সেখানে যেতে চান তাহলে আমি আমার আব্বুকে বলতে পারি।'

দিলারা আজিজের বান্ধবী। বইমেলায় রোজ বেড়াতে আসে অথচ বই কেনে না। ওর ব্যাগে অনেকগুলো পাঁচশো টাকার নোট থাকে। দিলারা সুন্দরী, মোমের মত গায়ের রঙ। আজিজের বেশ কয়েকজন বান্ধবী আছে, দিলারা তাদের একজন। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোন অনুষ্ঠানে আজকাল এইসব মোমরঙা সুন্দরীদের খুব দেখা যায়। তদের মুখ চোখ গড়ন এবং রঙ যেন কোন স্বপ্নের জাদুকরের তুলির ছোঁয়ার তৈরী। ইমনের মা অথবা আপা, তার পাড়ার বেশীরভাগ মেয়েদের সঙ্গে এদের একটুও মিল নেই। সেই সব মেয়েরা হয় শ্যামলা, নয় সাধারণ গৌরবর্ণ। দিলারাদের মত টকটকে গায়ের রঙ তাদের নয়। মাঝে মাঝেই মনে হয় এরা স্বপ্নসুন্দরী। একটু বেশী ভাবলেই তার চোখের সামনে আর একটা ছবি তৈরী হয়ে যায়। একজন মানুষের অনেকগুলো আমের বাগান ছিল। এক একটা জায়গায় এক এক জাতের আম। ল্যাংড়া, হিমসাগর থেকে ফজলি। গাছগুলো ঝড় সহ্য করে, বৃষ্টিতে ভেজে, কিন্তু ফাল্গুনেই যে মুকুল ধরে তা বৈশাখের শেষে থোকা থোকা আম হয়ে ঝোলে। বাগানের মালিকের কিন্তু তাদের দিকে লক্ষ্য নেই। সে জানে ওইসব আম পেতে কোন অসুবিধে হবে না। সে সচেতন থাকে একটি ছোট্ট বাগানের জন্যে। সেখানে গাছ অল্প কিন্তু প্রতি পদে তাদের যত্ন করতে হয়। আম পাকার সময় থেকে সতর্ক হতে হয়। পাকলে তুলোর বাক্সে ভরতে হয়। বড় দামী আর দামী বলেই তাদের জন্যে যত্নটাও বেশী। অন্য বাগানের আমরা কাঠের বাক্সে ঢোকার সময় দূর থেকে এই দামী আমদের দেখে আর ঈর্ষান্বিত হয়। ছবিটা এই রকম।

'কি ভাবছেন, একা একা?'

চমকে ফিরে তাকাল ইমন, দিলারা তার পাশে দাঁড়িয়ে।

'কিছু না।' লজ্জা পেল ইমন।

'কিছু একটা ভাবছিলেন। মেলায় যাবেন না?'

'নাঃ। মেলায় গেলে কষ্ট হয়। বই কিনতে পারি না।'

দিলারা তাকাল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আমার জন্যে না হয় আজ কষ্ট করলেন।'

অতএব হাঁটতে হল। দোয়েল চত্বর থেকে মেলার গেটের মুখে পৌঁছাবার রাস্তায় দুপাশে আধুনিক গান আর আবৃত্তির মিলিত শব্দের ঝড় ওদের ওপর আছড়ে পড়ছিল। কয়েক পা হাঁটার পর আর সহজে এগোনো যাচ্ছিল না। মানুষ আর মানুষ। প্রত্যেকেই নবীন যুবক। হয় তারা মেলায় যাচ্ছে নয় মেলা থেকে ফিরছে। এই ভিড়ের স্রোতে মিশে এক পা এক পা করে তাদের এগোতে হবে। দিলারা ইমনের একেবারে কাছে চলে এল, 'কত মানুষ। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ।'

ওরা এগোচ্ছিল। দু'কানে শব্দের ঝড়। হঠাৎ সামনে কয়েকজন যুবক নিজেদের মধ্যে কপট মারামারি শুরু করতেই জমাট ভিড়টা ছিটকে উঠল। দিলারাকে নিয়ে ইমন একপাশে

সরে আসার চেষ্টা করছিল। সামুদ্রিক ঢেউ-এর মত সেই ধাক্কা সামলানো মুশকিল। হঠাৎ দিলারা চিৎকার করতেই ইমন ফিরে তাকাল। একটি তরুণ সেই সময় দিলারার শরীর থেকে হাত সরিয়ে নিচ্ছে। নিজের ঊর্ধ্বাঙ্গ দুই হাতে আড়াল করতে করতে আর্তনাদ করে উঠেছে দিলারা। তার চারপাশে মেলা দেখতে যাওয়া মানুষ কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করছে না। সেই যুবক নির্লিপ্তের মত দিলারার কাছ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল ইমন। যুবকের শার্ট টেনে ধরে চিৎকার করল, 'একি করলি তুই? তোর বাসায় মা বোন নাই? বদমাস, ইতর!' উত্তেজনায় তার গলায় চিরে গিয়েছিল।

যুবকটি ফিরে তাকাল। তার চোখে নাৎসিদের চাহনি। আচমকা ঘুষি মারল সে ইমনের মুখে। ইমন পড়ে গেল ভিড়ের নিচে। এবং তারপরেই পেছনের মানুষের ঠেলায় এগিয়ে আসতে বাধ্য হল তার পাশের মানুষেরা। চেষ্টা করেও অনেকে পা সরাতে পারল না।

ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত ইমনকে যখন দিলারা তুলতে পারল তখন সেই যুবক ধারে কাছে নেই। কিছু ছেলে এগিয়ে এল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। 'সামান্য ক্ষতি' নামের একটি চায়ের স্টলে ইমনকে বয়ে লম্বামত একটি কালো ছেলে পানি এনে দিল দিলারাকে, 'ভাইকে পরিষ্কার করে দেন আপা। আমার নাম রঞ্জু। গতবছর মাস্টার্স করেছি। বেকার। এই স্টল আমার। আর কোন ভয় নেই আপনাদের।'

তারপরের সময়টা খুব স্বাভাবিকভাবে কাটল। রক্ত পরিষ্কার করা, ফার্স্ট এইড দেওয়া ইত্যাদি কাজ যখন শেষ হল তখন ইমন ঝুম মেরে বসে। তার চোখের সামনে তখন আলাদা ছবি। ছবিটাকে দেখতে দেখতে শিউরে উঠল সে। দিলারা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল? কি হয়েছে?'

সম্বিৎ ফিরে পেল ইমন। বলল, 'কিছু না, কিছু না।'

দিলারা বলল 'চলেন, আপনাকে বাসায় পৌঁছায় দিই।'

ইমন তাকাল। তার মুখের এখানে ওখানে প্লাস্টার। মুখ ফোলা। সে মাথা নাড়ল, 'মেলায় যাব।'

'মেলা?' দিলারা জিজ্ঞাসা করল, 'পারবেন?

ইমন উঠে দাঁড়াল, 'অবশ্যই।'

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ইমনের মনে হল তার সব যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। চারপাশে বই আর বই। বাংলা শব্দের বাগান। তার মা তাকে শৈশবে অ আ ই ঈ উচ্চারণ করতে শিখিয়েছিলেন। বাবা তখন মুক্তিযুদ্ধে নিরুদ্দেশ। সেই বর্ণ দিয়ে তৈরী শব্দের মিছিল বই-এর পাতায় পাতায়। দিলারা জিজ্ঞাসা করল, 'কি বই কিনবেন?'

ইমন হাসল, 'কিনব না, দেখব!'

ওরা স্টলগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটছিল। অনেকেই ইমনের বদলে যাওয়া চেহারাটা অবাক হয়ে দেখছিল। হঠাৎ দিলারা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনলেন কেন?'

ইমন বলল, 'কি জানি!'

দিলারা বলল, 'আপনার বন্ধু আজিজ থাকলে চুপচাপ দেখত। আমাকে বাঁচাতে সে আপনার মত আহত হতে চাইত না, তাতে অন্যান্য বান্ধবীদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতো।'

'আপনি সব জানেন?'

'জানি। ওর মধ্যে অন্য গুণ আছে। ও ভাল কথা বলতে পারে। তাছাড়া—।' দিলারা চুপ করে গেল।

'তাছাড়া—?'

'আমার কোন বন্ধু নেই। স্কুলে পড়ার সময় আব্বা আমাকে প্রায় বন্দী করে রাখত। আম্মা বলত শরীরে রোদ লাগালে আমি নষ্ট হয়ে যাব। তাই কারো সঙ্গে মিশতাম না। একাত্তর সালের পর যারা বড়লোক হয়েছে আব্বা তাদের সহ্য করতে পারে না। বলে তাদের আভিজাত্য নেই। কলেজে ওঠার পর আবিষ্কার করলাম আমি বাংলাদেশের মেয়ে অথচ আর পাঁচটা মেয়ের মত নই। এই সময় আজিজ আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। সে সৎ নয় তবু তো বন্ধু।' দিলারা বলল।

হঠাৎ চিৎকার উঠল। দূরের একটি স্টলের সামনে উন্মত্ত যুকদের ভিড়। প্রতিরোধের চেষ্টা হতেই স্টলটা লুট হয়ে গেল। ইমনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'হায় আল্লা!' তারপরেই সে এগিয়ে যাচ্ছিল স্টলটির দিকে। দিলারা তাকে আটকালো, 'না, প্লিজ যাবেন না। ওরা অতজন, আপনি একা। কিছুই করতে পারবেন না।'

'কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? ওরা বাংলাভাষায় লেখা বই লুট করছে!' ইমন পাগল হয়ে গেল।

'একটু শান্ত হন। পুলিশ আছে, আশেপাশে অনেক মানুষ আছে—।'

'কিন্তু কেউ আসছে না। দেখুন, স্টলটার বাতি নিভে গেল, সাইনবোর্ড ভেঙ্গে পড়ল—।'

ততক্ষণে বই নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে হানাদাররা। একটু পরেই সব শান্ত, যেমনটি আগে ছিল।

ইমন বলল, 'আমার এখানে দাঁড়াতে ভাল লাগছে না। আমি বাইরে যাব।'

বাইরে তখন সন্ধ্যা নামছে। বাতাসে হিমের ছোঁয়া। কদিন আগের বৃষ্টি শীতকে আবার টেনে এনেছে। সেই সময় তারা শুনতে পেল কেউ অথবা কারা যেন শহীদ বেদীর লাল সূর্যটাকে পুড়িয়ে দিয়েছে।

ইমন বলল, 'অসম্ভব। হতে পারে না। মায়ের মুখে শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভাষা আন্দোলন না করলে আজ আমরা স্বাধীন হতাম না। তাকে অপমান কেউ করতে পারে না।'

দিলার বলল, 'আজ রাত বারোটায় একুশে ফেব্রুয়ারি। আমি কখনও সেইসময় যাইনি। এখন যাবেন?'

ইমন বিস্মিত, 'সেকি? আপনি কখনও যাননি?'

'না!' মাথা নাড়ল দিলারা, 'আব্বা বলে মেয়েরা নাকি ওই সময় নিরাপদ নয়। তাই আমার যাওয়া নিষেধ।'

'আপনার বাবা ভাষা আন্দোলন করেননি?'

'না। তিনি তখন মুসলিম লীগ করতেন। গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলেন পঞ্চাশ সালে।'

'একাত্তরে, স্বাধীনতা আন্দোলনে—?'

'আমি জানি না। তখন আমি জন্মাইনি।'

ওরা হাঁটছিল। চারধার থমথমে। তবু কিন্তু মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে শহীদ বেদীর দিকে।

ইমন বলল, 'আজিজ থাকলে আমার ভাই-এর রক্তে রাঙানো গানটা গাইত। চমৎকার গায় ও।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সে আজ পর্যন্ত শহীদ মিনারে ফুল দেয়নি। হাততালি পাবার জন্যে গায়।'

'আপনি ওর ওপর রেগে আছেন।'

দিলারা কিছু বলল না।

অনেক মানুষের ভিড় দূর থেকে নজরে এল। সবাই চুপচাপ, যে মৃত মানুষের সমাধির সামনে সমবেত হয়েছেন সবাই। এই সময় দিলারা চিৎকার করে উঠল। অবিকল সেই চিৎকার যা সে ভিড়ের মধ্যে করেছিল। কিন্তু এখন তো তারা হাঁটছে একদম ফাঁকায়। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করতেই দেওয়ালটার দিকে নজর গেল ইমনের। দেওয়ালে দেওয়ালে বাঙালির বুকের রক্ত দিয়ে লেখা যেসব লাইন ছড়ানো ছিল তার ওপর কেউ বা কারা রঙের প্রলেপ দিয়ে মোছার চেষ্টা করেছে। রবীন্দ্রনাথ নজরুল থেকে শুরু করে আজকের কবির কলম থেকে উঠে আসা শ্রদ্ধাঞ্জলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেছে ঘাতকেরা।

দিলারা ডুকরে উঠল, 'দেখেছেন, দেখেছেন—আঃ!'

ইমন কথা বলতে পারছিল না। তার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন লহমায় জমে গেছে। তার চোখের সামনে দেওয়াল নেই, কোন লেখা নেই। ধীরে ধীরে অন্য একটা ছবি তৈরী হয়ে উঠছে। শত শত মুখোশ পরা মানুষ একটি রমণীকে ঘিরে ধরে বলাৎকার করছে। রমণীটি নির্বাক ছিল এতক্ষণ। চূড়ান্ত অত্যাচারের সময় সেই নারকীয় উল্লাসকে ছাপিয়ে হঠাৎ তিনি কেঁদে উঠলেন, 'ওরে, আমি তোদের মা, তোদের মা।' তাঁর মুখ দেখা গেল। সেই মুখ ইমনের নিজের মায়ের অথবা দিলারার এবং শেষ পর্যন্ত মিলেমিশে একুশে ফেব্রুয়ারির।

সেই কল্পিত ছবির দিকে তীরের মত ছুটে গেল বরকত-সালাম-রফিকের সন্তান ইমন, দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে। নিজের জন্যে, নিজেদের জন্যে।

ঈশ্বরের ভূমিকায়

তিস্তা ব্রীজ পেরিয়ে জিপটা ছুটছিল ময়নাগুড়ির দিকে। না ঠিক ময়নাগুড়ি নয়, তার আগেই রাস্তাটা ডানদিকে ঝুঁকে গেছে আচমকা। হাওয়া ঝাপট মারছে মুখচোখে, চাকার তলায় ঢালু পিচের রাস্তা পিছলে পিছলে যাচ্ছে। বুড়ো ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। স্টিয়ারিং দু'হাতের থাবায় চেপে বাবু বসে আছেন। চুল উড়ছে বাতাসে। ঘাড়ের পেশী শক্ত। তবু কবজি দুটো একটু একটু কাঁপছে। মাথা দোলাল বুড়ো, তারপর শক্ত হাতে ওপরের শিকটাতে ধরল। ওর একটা পা জিপের বাইরে বের করা। যে কোন মুহূর্তেই ও লাফিয়ে পড়তে পারে—কিছু বিশ্বাস নেই, যে কোন মুহূর্তেই লাফানো দরকার হতে পারে।

দোমহনীর মোড়টা আসতেই জিপটা প্রচণ্ড শব্দ করে প্রায় কাৎ হতে হতে আবার সোজা হয়ে ছুটতে লাগল। আই বাপ্। চট করে লাফাতে গিয়েও সামলে নিল বুড়ো। ঘসঘসে গলায় বলল, 'একটু ধীরে চললে হয় না বাবু।'

বাবুর কোন সাড়া নেই। সাড়া যে পাবে না তা জানে বুড়ো। এই জিপটা একদিন যাবে—নির্ঘাৎ যাবে। অন্তত তিন তিনবার বেঁচে গেছে এই দুই মাসে। ওলটাতে ওলটাতে ওলটায়নি। রাস্তা ছাড়িয়ে পাশের ধানের ক্ষেত বা চা-বাগানের মধ্যে গিয়ে গোঁ গোঁ করেছে। তারপর থেকে জিপের পেছনের দিকে বসে থাকে বুড়ো। বসে ফেলে-আসা রাস্তার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে একটা পা ঝুলিয়ে। আর বাবু উড়ে চলেন স্টিয়ারিং আঁকড়ে। অথচ ড্রাইভারের সিটে বসে থাকার কথা বুড়োর। তিনশ টাকা মাইনে আর খাওয়া-পরার চুক্তি হয়েছিল তো এই জন্যেই। এর আগে জিপটা ছিল শিলিগুড়ির হরিপদ সাহার কাছে। বুড়োও ছিল, তা প্রায় বছর ছয়ের হবে। এই বাবু যখন দু'মাস আগে নগদ টাকা ফেলে জিপটা কিনে নিলেন, তখন বুড়োকেও নিয়ে নিলেন। পুরোন ড্রাইভার, এ গাড়ির অন্ধিসন্ধি জানে, তাছাড়া হরিপদ সাহা সার্টিফিকেট দিয়েছিল একদম মেসিনের মত হাত। চোখ বন্ধ করে চালাতে পারে। বাবুর বয়স কাঁচা, মুখে এখনও নরম ছাপ, ব্যবসায় নেমে অঢেল টাকা আসছে হাতে। কেমন মায়া লেগেছিল বুড়োর। চলে এসেছিল সটান। শিলিগুড়ি থেকে এই গয়েরকাটায়।

কিন্তু দুদিন যেতে না যেতে বাবু ওকে চালান করে দিলেন পেছনে। 'আমি যখন গাড়িতে থাকব, তখন খবরদার স্টিয়ারিং-এ হাত দেবে না, বুঝলে হে, অবিশ্যি আউট হয়ে গেলে অন্য কথা।' তাই সারাদিন পেছনে বসে থাকে বুড়ো আর ঝিমোয়। আর একদম রাত এগারটার পর সেই অন্য কথার সময় মদো মানুষ শ্রীনিবাসের চায়ের দোকান থেকে বাবুকে গাড়িতে

তুলে তবে স্টিয়ারিং হাতে পায় বুড়ো। মাঝে মাঝে ভাবে বুড়ো, তবে তাকে রেখেছে কেন বাবু, মতলবখানা কি!

তবু আজকে যেন ছুটছে বড্ড বেশী। আশী হবে তো বটেই। ব্যাপারখানা কি! জলপাইগুড়ি শহরে সারাদিন ছোটাছুটি করেছেন বাবু। তারপর এই চারটে বেজে গেলে পি ডবলু ডি অফিসের সামনে যখন জিপে চড়লেন, তখন মুখখানা গম্ভীর। অথচ আসবার সময় তো বেশ ফুর্তিতেই এসেছিলেন। ফুর্তি মানে বাড়ি থেকে বেরবার সময় বাবুর বৌ কি বলতেই বাবু হো হো করে হেসেছিলেন। ব্যবসার কাজে জলপাইগুড়ি যান বাবু, আজও তো তাই গিয়েছিলেন, কিন্তু হলোটা কি! জিপটা বড্ড কাঁপছে। হুস হুস করে উল্টোদিকের গাড়িগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যিস রাস্তাটা চওড়া। বাবুর বৌটা কিন্তু ভারী ভাল। বুড়ো যখন বারান্দায় পিঁড়ি পেতে খেতে বসে বাবুর বৌ তখন সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর খাওয়া-টাওয়া হয়ে গেলে ও যখন উঠে দাঁড়ায় তখন বাবুর বৌ ফিসফিস করে বলে, 'ওঁর হাতে স্টিয়ারিং ছেড়ো না বুড়ো, আমার বড় ভয় করে।' মাথা দোলায় বুড়ো। বাবুর যে বড় কড়া মুখ। সেই সাতটা বাজতেই বাবু জিপে বসে দুবার হর্ন বাজান। প্যান্টের দড়ি বাঁধতে বাঁধতে ছুটে আসে বুড়ো। ড্রাইভারের সিটে বসে আছেন উনি, মুখে সিগারেট। 'আমি—', স্টিয়ারিং-এর দিকে তাকায় বুড়ো।

সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল দিয়ে পেছনটা দেখিয়ে দেন বাবু। দিয়ে ইঞ্জিন চালু করেন। কোনরকমে পেছনে উঠে বসে ও। বসেই চোখ পড়ে, জানলা দিয়ে বাবুর বৌ ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। লজ্জায় ঘেন্নায় নাকি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে বুড়ো। সেই সক্কালে শুরু হয় ব্যাপারটা। প্রথমে মোড়ের শ্রীনিবাসের চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি থামে। বাবু তড়াক করে নেমে ভেতরে ঢুকে যান। তখনও ভাল করে খোলেনি দোকান। রুটের বাসগুলোর প্যাসেঞ্জার নিয়ে আসবার সময় হয়নি। বাবুর সঙ্গে ঐ মদো মানুষটার একটা বোঝাপড়া আছে। কেবিনের পর্দা ফেলে দুটো বিয়ারের বোতল আর একপ্লেট ছোলা দিয়ে যায় নিজের হাতে। দু'নম্বর ব্যবসা এটা। চোখ বন্ধ করে হাঁটু বাজায় বুড়ো গাড়িতে বসে। কিংবা ন্যাকড়া দিয়ে গাড়ির বনেট ঘষে—মুখ দেখা যেত হে এককালে।

বাবুর কোন ছেলেমেয়ে নেই। চার-পাঁচ বছর তো বিয়ে হল—বাবুর বন্ধুরাই গাড়িতে বসে বলে। বৌটা নাকি বাঁজা—বাবুর বন্ধুরা বলে শহরে গিয়ে পরীক্ষা করাতে। বাবু হাসেন, বলেন, 'মাথা খারাপ, শেষে দেখব আমারই এলেম নেই।' বড় কষ্ট হয় মেয়েটার জন্য। মা মা যাকে দেখতে লাগে সে মা হবে না কেন?

হঠাৎ সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল বুড়োর। পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া একটা ভারী লরির বাতাস যেন পাক খাচ্ছে সর্বাঙ্গে। চাপা গলায় ও বলে ফেলল, 'বাবু!'

আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ করে জিপটা থেমে গেল আচমকা। বাবু ব্রেক কষেছেন। থর থর করে কাঁপছে গাড়ি। স্টিয়ারিং থেকে হাত নামিয়ে বাবু বললেন, 'তোমার বয়স কত হল বুড়ো?'

বুকের ভিতরটা এখনও তির তির করছে। বুড়ো চোখ খুলে দেখল প্রায় জলঢাকা ব্রীজের কাছে এসে গেছে ওরা। ম্যাড়মেড়ে বিকেলের আলো দুপাশের ধানগাছগুলোয় নেতিয়ে আছে। বুড়ো বলল, 'আর এট্টু হলেই—।'

'কত বয়স হল?' বাবুর গলা তেমনি গম্ভীর।

'আজ্ঞে ষাট।' কিছু বুঝতে পারছিল না বুড়ো।

ঝুঁকে পড়লেন বাবু। নিচ থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল বের করে গলায় ঢাললেন। তারপর বাঁ হাতে সেটাকে বুড়োর দিকে এগিয়ে ধরলেন, 'একটু মদ্যপান করো।'

আঁৎকে উঠল বুড়ো, 'ছি, ছি, ছি।'

'ছেনালি রাখো! শিলিগুড়ির ড্রাইভার মাল খায় না আমার চোদ্দ পুরুষ বিশ্বাস করবে না। তোমার শালা একদম নার্ভ নেই, একটু পান করো।' কড়া গলায় বললেন বাবু।

'সত্যি বলছি আমি খাই না।' বুড়োর চোখে জল এসে যাচ্ছিল।

'কেন খাও না?' আর এক ঢোঁক খেলেন বাবু।

কি ভাবল বুড়ো। পানসে চোখে লালচে আকাশ দেখল। তারপর বলল, 'আমার বৌ দিব্যি করিয়েছিল, গাড়ি চালালে ওসব খাবে না।'

'তোমার বৌ-এর ছেলেমেয়ে ক'টি?'

'এজ্ঞে দশজন।' বুড়ো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল।

'তা তুমি তো এখন গাড়ি চালাচ্ছ না, নাও গেলো। আমি দিচ্ছি, তোমার বৌ কিছু রাগ করবে না। দশ দশটা বাচ্চা—সাবাস জোয়ান।' হেসে উঠলেন বাবু।

বুঝি জেদ চেপে গেছে বাবুর, 'আঃ, আমি তোমার বৌকে বলব তোমার কোন দোষ নেই, আমি বলেছি, হুকুম করেছি—।'

'সে তো নেই।' বুড়ো দেখল দ্রুত সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

'কোথায় গেল? মরে গেছে নাকি!' বাবুর গলায় বিস্ময়।

মাথা দোলাল বুড়ো।

'যাঃ শালা।' ঘুরে বসে আবার ইঞ্জিন চালু করলেন বাবু। ঝাঁকুনি দিয়ে আবার চলতে লাগল গাড়ি। বিশ-ত্রিশ-আশী। বুড়ো ঘুরে বসতে দেখল আধ বোতল মদ ওর পাশের সিটের ওপর টলতে টলতে শুয়ে পড়ল। চট করে আঁকড়ে ধরল ও, তারপর আড়চোখে সামনের দিকে চেয়ে পায়ের কাছে ফেলে রাখা এক্সট্রা চাকার খাঁজে মুখে আটকে গুঁজে দিলে সেটাকে। বাইরে এখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। হেডলাইট জ্বেলে দিয়েছে বাবু। ধূপগুড়ি পেরিয়ে গেল। দশ দশটা বাচ্চা জন্ম দিতে দিতে সে চলে গেল। ছেলেগুলো এখন কোথায় ঠিকঠাক জানে না সে। ছোটটার বয়স এই বাবুর মতই হবে। মাল খায় কিনা কে জানে। রোগা রোগা আঙ্গুলে মুখ চেপে ধরল বুড়ো। অনেক ভাঁজ পড়ে গেছে। হাতের চেটোর দাগ যত ঘষে যাচ্ছে মুখের ভাঁজ যেন তত বেশী টেকে।

বাঁ দিকে চা-বাগান, ডানদিকে কুলি বস্তি। গয়েরকাটা এসে যাচ্ছে। আর কয় মাইল, তারপর রাতটা নিশ্চিন্ত। বুড়ো মনে মনে পথটা ফুরিয়ে দিচ্ছিল। এখন রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া কম। হাত সোজা রাখো বাবু। মনে মনে বলল বুড়ো। একটা গুনগুনানি শুনতে পেল ও। চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে সামনে তাকাতেই দেখল বাবুর মাথাটা টলছে। আর গান গাইছেন গুনগুন করে। এই প্রথম বাবুকে গান গাইতে শুনল ও। কিন্তু মাথাটা টলছে কেন? সামনের হেডলাইটে অন্ধকার ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ চমকে উঠল বুড়ো। ঠিক মধ্যিখানে রাস্তা জুড়ে একটা মোষের গাড়ি যাচ্ছে। চিৎকার করে উঠল ও, 'বাবু।' সঙ্গে সঙ্গে মাথা সোজা করে বাবু সামনের দিকে তাকাতে তাকাতে স্টিয়ারিং ঘোরাল। আর জিপটা যেন লাফ দিয়ে আকাশে উঠে ছিটকে পড়ে রাস্তার বাঁ দিকে নেমে গেল। নেমে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে ঘাসের জমি পেরিয়ে অন্ধকারে কি সব ফুঁড়ে বেরিয়ে একটা গর্তে কাৎ হয়ে পড়ল।

চারপাশে হৈ হৈ শব্দ, লাফিয়ে মাটিতে পড়া বুড়ো উঠে দাঁড়াতেই মনে হল ওর সর্বাঙ্গে একটা যন্ত্রণা তুবড়ির মত ছড়িয়ে পড়ছে। পেছন দিকে তাকাল ও। একটা খড়ের ঘরের মধ্যে দিয়ে গাড়িটা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। হা ভগবান। ঘরে কি লোক ছিল? চিৎকার করে লোকগুলো আলো হাতে ছুটে যাচ্ছে ঘরটার দিকে। প্রায় টেনে টেনে শরীরটাকে কাৎ হয়ে থাকা গাড়ির কাছে নিয়ে এল ও। গোঙানি আসছে সামনে থেকে। চাপা গলায় ডাকল বুড়ো, 'বাবু!'

গোঙানিটা থামল একটু। 'বাবু!' আবার ডাকল বুড়ো। তারপর দেখতে পেল ড্রাইভারের সিট থেকে অর্ধেক শরীরটা বেরিয়ে বাইরে ঝুলছে।

গোঙাতে গোঙাতে বাবু বলল, 'ব্যথা, বড় ব্যথা, জল একটু জল—।'

জল কোথায় পাবে এখন! বুড়ো হঠাৎ দেখল কেমন চনমনে জ্যোৎস্না উঠেছে হঠাৎ। চারপাশ পরিষ্কার হচ্ছে হঠাৎ। জল নেই কোথাও। ওপাশে ভেঙ্গে পড়া ঘরটায় কান্না উঠছে এবার। কেমন করে যে কি হয়ে গেল। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বুড়ো গাড়ির পেছনে চলে এল। চাকাটা ঠিক আছে—আশ্চর্য বোতলটাও ভাঙ্গেনি। বোতলটা খুলতে খুলতে বাবুর কাছে চলে এল ও। গায়ে হাত দিতেই চটচটে রক্তে হাত মাখামাখি হয়ে গেল বুড়োর। বাবুর মুখ বুকের কাছে তুলে ধরল ও। উত্তেজিত মানুষজনের গলা শুনতে পাচ্ছে সে—এদিকেই আসছে ওরা।

তাড়াতাড়ি, কী ভীষণ মায়ায় বোতলের মুখটা বাবুর মুখে গুঁজে দিল বুড়ো। প্রায় নেতিয়ে পড়া বাবুর মুখটা বাঁ হাতে বুকের কাছে নিয়ে বোতলটা ধরতে ধরতে ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল নিজের দশটা বাচ্চাকে বাঁচাতে এমন করে কোনদিন তাদের মুখে দুধের বোতল ধরেনি সে।

বু কে র বা সা য় সে

কেউ বলে বাতিক, কেউ শখ, তবে অনেকেই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ‘কবে আপনার মাথায় এমন ভাবনা এল?’

কবে এল সুন্দর নিজেই জানে না। যখন প্রথম নিউ মার্কেটের ফুটপাথে প্যাঁচাটাকে দেখেছিল তখন মনে মনে বলেছিল বাঃ। সত্তর টাকায় সেটা কিনে এনেছিল তার দুঘরের বাসায়। মালিবাগের এই ফ্ল্যাটটায় সে উঠে এসেছিল কিছুদিন আগে। সামান্য আসবাব, একা মানুষের চলে যাওয়ার মত যা দরকার তার বেশী নয়। প্যাঁচাটাকে এনে রেখেছিল টেবিলের ওপর। তাকালে মনে হয় একটা চোখ ইষৎ বোঁজা। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে মনে হত দুটো চোখ অন্ধকারে জ্বলছে। যে চোখ বোঁজা তা কি করে অন্ধকারে জ্বলে? মজা লাগত কিন্তু সেই সঙ্গে ভালও লাগত।

প্যাঁচাটা কাঠের। যিনি ওটাকে তৈরি করেছিলেন তাঁর হাত অবশ্যই শিল্পীর। দেখে মনে হয় এইমাত্র উড়ে এসে গাছের ডালে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। সুন্দরের মনে হতে লাগল প্যাঁচাটা বড় একা, ওর সঙ্গী দরকার। আর এই মনে হওয়ার দিনে পুরনো পল্টনের রাস্তায় বিকেল বেলায় একটা ঝকঝকে পেতলের প্যাঁচা পেয়ে গেল। এর গড়ন বেশ শান্ত এবং মিষ্টি। দরাদরি করে কিনে ফেলেছিল। বাসায় এসে আগেটার পাশে রেখে মনে হয়েছিল, বেশ লাগছে। সেই রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে সুন্দর দেখল আগের প্যাঁচাটার চোখ তেমন জ্বলছে না। বরং খুশীখুশী ভাব।

সেই শুরু। তারপর যেখানেই সে গিয়েছে আর যখন প্যাঁচা চোখে পড়েছে, কিনে এনেছে বাসায়। প্যাঁচারা কত রকমের হয়? হুতোম প্যাঁচা, লক্ষ্মী প্যাঁচা, দুধসাদা অথবা বিল্লী ময়লা? কাঠ, পেতল, পোড়ামাটি, থার্মোকোল থেকে শুরু করে হেন জিনিষ নেই যে মানুষের হাতে প্যাঁচার শরীর তৈরি হয় না। হয়তো পাখিদের মধ্যে প্যাঁচার গঠন শিল্পীদের আকর্ষণ করে বেশী, তাই যে যা পেরেছে তাই দিয়ে প্যাঁচাকে জীবন্ত করেছে। আর সেইসবের এক একটা খুঁজে পেতে এনে বাসায় রেখেছে সুন্দর। এদের রাখতে আসবাব বাড়াতে হয়েছে। টেবিল ছাড়িয়ে সেল্ফ এসেছে একের পর এক। দুই দেওয়াল জুড়ে নানান স্তরে তার প্যাঁচারা চুপচাপ বসে থাকে। বন্ধুরা এসে অস্বস্তিতে পড়েন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের চোখ যখনই এই প্যাঁচাদের ওপর পড়ে তখনই অস্বস্তি বাড়ে। সংগ্রহের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার পর সুন্দরের মনে ধীরে ধীরে এদের সম্পর্কে অদ্ভুত মায়া তৈরী হয়েছে। কেউ সমালোচনা বা বিদ্রূপ কথা বললে

তার মন খারাপ হয়। হাত দিতে চাইলে সে তীব্র আপত্তি করে। ফলে তার ঘরে অতিথির সংখ্যা কমে আসে। যে আসে সে অবাক হয়। টিকিট জমানো, মুদ্রা জমানোর মত এই অদ্ভুত হবি নিয়ে তারা আড়ালে কথা বলে।

অফিস থেকে বেরিয়ে বেবি ট্যাক্সিতে এক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছিল সুন্দর। শহীদ মিনারের সামনে দিয়ে গেলেই সে দেওয়ালে লেখা লাইনগুলোয় চোখ বোলায়। মনে হয় মনটা স্নান করে উঠল। আজ সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখতে পেল একজন লোক কিছু বিক্রী করছে। জ্যান্ত পাখি? বেবি ট্যাক্সি থামিয়ে সে কাছে গিয়ে দেখল লোকটা কতকগুলো আজানা পাখি বিক্রী করছে। শরীরের মাংস, রক্ত, মেদ বের করে নিয়ে আদলটা ঠিক রেখে দিয়েছে বিশেষ প্রক্রিয়ায়। একটা ধবধবে প্যাঁচা পেয়ে গেলে সে। দেখলে কে বলবে এ জ্যান্ত লক্ষ্মী প্যাঁচা নয়। কিনে নিয়ে সোজা সে ফিরে এল বাসায়। অন্য প্যাঁচাদের থেকে একটু আলাদা ওকে বসিয়ে দিতেই মনে হল এতদিনে ঘরটা সম্পূর্ণ হল!

মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল সুন্দরের। মনে হল ডানার শব্দ কানে আসছে। যেন স্বপ্নের পাখিরা নীল জ্যোৎস্নায় অবিরত ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে। চোখ খুলল না সুন্দর। স্বপ্নের পাখি কি কখনও প্যাঁচা হয়? ঠিক বুঝতে পারছিল না সে।

পরের দিন ছুটি। ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে সে অবাক। জানলার কাঁচে একটা সাদা পালক পড়ে আছে। এই ঘরের সবকটা জানলা কাল থেকে বন্ধ। পাখির পালক এল কি করে। পালকটা তুলে সে দেখল তার গোড়া শুকনো। যেন অনেকদিনের পুরানো। হঠাৎ তার খেয়াল হতে পালকটাকে নিয়ে এল গত বিকেলে কেনা প্যাঁচাটার কাছে। মিলিয়ে সে অবাক। ওর শরীরের অন্য পালকগুলো আর খসে পড়ে থাকা এই পালকটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ঘরে এসে সে ওটাকে যেখানে বসিয়েছিল, সেখান থেকে জানলা পর্যন্ত কোন ভাবেই পালকটা আপনা থেকে উড়ে যেতে পারে না। উড়ে যাওয়ার মত বাতাস কাল কখনই ঘরে ছিল না। মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে সে প্যাঁচাটাকে ভাল করে দেখতেই শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। কাল সে এটাকে অন্যদের থেকে একটু আলাদা বসিয়েছিল। কিন্তু আজ সেই প্রথম কেনা রাগী প্যাঁচাটার কাছে ও চলে এল কি করে?

সারাদিন সুন্দর ঘর থেকে বের হল না। তার সংগ্রহে প্যাঁচার সংখ্যা একশো সাত। একমাত্র প্রথমটা ছাড়া সবাই কী নিরীহ হয়ে বসে আছে। সারাদিনে ওদের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না। বিকেল নাগাদ তার নিজের চিন্তায় নিজেরই হাসি পাচ্ছিল। এই সব জড় বস্তুকে সে ক্রমশ অন্য মাত্রা দিচ্ছে, মস্তিষ্ক স্থির আছে তো তার?

সেই রাত্রে তাড়াতাড়ি ঘুম এল। হয়তো নার্ভের ওপর ধকল গিয়েছিল বলেই সে ঘুমোতে পারল। মধ্যরাতে সুন্দরের মনে হল ডানায় শব্দ তুলে কেউ যেন তার চারপাশে পাক খাচ্ছে। খুব মরীয়া হয়ে চেষ্টা করেও সফল হচ্ছে না সে। সুন্দর চোখ খুলল। বাইরে বন্ধ কাঁচের

জানলার ওপাশে মায়াময় জ্যোৎস্নায় পৃথিবীটা ছিমছিমে হয়ে আছে। আর তার ঘরের দেওয়াল থেকে দেওয়ালে সেই সাদা প্যাঁচাটা উড়ে উড়ে ধাক্কা খাচ্ছে, খেয়ে চলেছে। যেন মুক্তির জন্যে পাখিটা উন্মাদ হয়ে উঠেছে। ঘোরের মধ্যে উঠে দাঁড়াল সুন্দর। পাশের জানলাটা খুলে দেওয়ামাত্র পাখিটা বেরিয়ে গেল বাইরে। জ্যোৎস্নামাখা আকাশে দুধের সরের মত ভেসে থেকে সে উধাও হয়ে গেল। খুব অবাক নয়, দুঃখিত নয় আবার চেতনা এবং অচেতনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দর বিছানায় চলে এল।

সকাল বেড়ে গেলে ঘুম ভাঙল তার। প্রথমেই স্মরণে এল গতরাতের কথা। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে সে অবাক। সাদা প্যাঁচাটা বসে আছে যেখানে সে গতকাল তাকে দেখেছিল। জানলাটা খোলা, তখনও। অথচ যদি ঘটনাটা স্বপ্ন হয় তাহলে জানলাটার বন্ধ থাকার কথা।

ভূতগ্রস্ত মানুষের মত সুন্দরকে দেখাল কিছুক্ষণ। তারপর সে নিজেকে বোঝাতে লাগল, কখন কোন ফাঁকে সে হয়তো নিজেই জানলাটাকে খুলে রেখেছিল। মৃত এবং সাজানো পাখি কোনভাবেই উড়ে যেতে পারে না। আর যদি যায়, সে পাখি সাদা জ্যোৎস্নায় উড়ে যায় সে আর কখনই ফিরে আসে না।

সেই বিকেলে এক মহিলা এলেন সুন্দরের বাসায়। যার জন্যে ধানমুণ্ডির বাসা তাকে ছাড়তে হয়েছিল, যার জন্যে প্রিয় বন্ধু আশরাফকে চিরদিনের জন্যে ক্ষমা করে নীরবে সে চলে এসেছিল মালিবাগের এই ফ্ল্যাটে। সেই মহিলাটি এখন তার সামনে। বিচিত্র বলেই জীবন এত অদ্ভুত। আশরাফ কানাডায় চলে যেতে চায়। মহিলা যাবেন না। তাঁর সঙ্গে আশরাফের বিরোধ লেগেছে। সুন্দর যদি আরও একটু বড় হয় তাহলে মহিলা কৃতার্থ হবেন। তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন।

আমি আর কত বড় হব? বুকের মধ্যে ডানা ঝটপটানো প্রশ্নটা সে মহিলার ওপর ছুঁড়ে মারতে পারল না। যেন তার চারধারে সব সময় সারি সারি দেওয়াল ও কাঁচের জানলাগুলো বন্ধ। মহিলা তাকে ভাবার সময় দিলেন। তারপর আগ্রহ নিয়ে প্যাঁচাদের দেখলেন, 'আজকাল তুমি এদের নিয়েই থাকো?'

'হ্যাঁ।'

'অদ্ভুত! হঠাৎ প্যাঁচা কেন?'

'জানি না।'

'কটা আছে?'

'একশ সাত।'

মহিলা তবু গুণতে আরম্ভ করলেন। এক দুই তিন, একশ আটে গিয়ে তিনি থামলেন, 'নিজেরটা তুমি কোনদিন যত্ন নিয়ে জানলে না। একশ সাত নয়, একশ আটটা প্যাঁচা তোমার।'

অসম্ভব। সুন্দর খাতা খুলল। যখনই সে প্যাঁচা কিনে এনেছে তখনই তার বিরবণ সে একটার পর একটা লিখে রেখেছে। শেষতম প্যাঁচা ওই সাদাটা। শেষ সংখ্যা একশ সাত। তবু মহিলার জেদে সে গুণতে শুরু করল। না, মহিলার ভুল হয়নি। একটা বেশী হয়ে যাচ্ছে। কি করে হল?

মহিলা চলে গেলেন ভুল ধরিয়ে দিয়ে বিজয়িনীর মত। মাথা খারাপ হয়ে গেল সুন্দরের। একটার পর একটার সঙ্গে খাতায় বর্ণনা মেলাতে লাগল সে। শেষ পর্যন্ত একটা ছোট্ট প্যাঁচাকে সে আবিষ্কার করল। এ কোথা থেকে এল? সেই প্রথম কেনা রাগী প্যাঁচাটার পাশে নির্বিকার মুখে বসে আছে। কোনদিন একে চেনেনি সে। প্যাঁচাটা মাটির। পাঁচ টাকাও দাম হবে না। হঠাৎ সে সাদা প্যাঁচাটার দিকে তাকাল। কাল রাত্রে উড়ে গিয়ে কি একে সঙ্গে করে ফিরে এসেছে? রাগী প্যাঁচটার ওপর চোখ রাখল সুন্দর। আশ্চর্য! আজ ওর দুই চোখই আধ বোঁজা। নেশায় বুঁদ হয়ে যাওয়া অবস্থা।

মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙল তার। আজ শোয়ার সময় সব জানলা বন্ধ করে রেখেছিল সে। দেখল ঘরের সবকটা প্যাঁটা একসঙ্গে উড়ে উড়ে ধাক্কা খাচ্ছে জানলায়। সবাই বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ছটফট করছে। আজ তাদের পালাবদল হয়েছে, তার তেজ বেশ কম। পৃথিবীটা আরও রহস্যময়। প্যাঁচাগুলো ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে যাচ্ছিল প্রথমে ঘরের এখানে ওখানে, শেষে দাঁড়িয়ে ওঠা সুন্দরকে ঘিরে। যেন নির্বাক আবেদন জানিয়ে যাচ্ছিল তাদের স্বপ্নের জ্যোৎস্নায় ছেড়ে দেবার জন্যে। সুন্দর জানলা খুলে দিতেই স্রোতের মত তারা বেরিয়ে গেল। সুন্দর দেখল তার ঘর খালি, শুধু একজন বসে আছে একই ভঙ্গীতে।

সে কাছে এগিয়ে গেল। প্রথম দিনের রাগী প্যাঁচাটা এখন মাথা গুঁজে বসে আছে। তার দুই চোখ বন্ধ। যেন পৃথিবীর কোন কিছু সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। অথবা আগ্রহী হবার মত মন তার চলে গেছে। আবার এমনও হতে পারে তার আগ্রহী হবার মন নিয়ে অন্যান্যরা উড়ে গেছে স্বপ্নের জ্যোৎস্নায়। ওর জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল সুন্দরের।

তার মনে হচ্ছিল নিজের সব কিছু পাখিটা হারিয়েছে একটু বড় হবে বলেই।

মাথার ভিতরে

আমি খুব সুখী মানুষ ছিলাম। অল্পেই যারা সুখ পায় তারা তো সুখী। আমাকে কেউ দুঃখ দিত না। হেনাও। বরং রাগ হলে অথবা নিজের তৈরি অক্ষমতার কারণে আমিই অন্যের দুঃখের কারণ হতাম।

ওই সময় রাত্রে বা দিনে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেই ঘুম আসত। হেনা বলত, তোমার সুইচটেপা ঘুম। আলো বোধহয় তার চাইতে দেরিতে জ্বলে। সে বড়ো সুখের সময় ছিল যখন আমি চাইতাম হেনা আমার সুখ দুঃখের ব্যাপারে সবসময় সজাগ থাকুক। প্রেম ভালবাসা এবং অবশ্যই সহ্যশক্তি নিয়ে।

কিছুকাল আগে আমার মাথার ভেতরে একটা চিনচিনে বেদনা তৈরি হয়েছে। চলতে ফিরতে, মানে যতক্ষণ জেগে থাকি, ব্যথাটা জানান দিয়ে যায়। ব্যথা উপশমের যে সব বাজার-চলতি বড়ি আছে তার একটাও বাদ দিইনি কিন্তু কমার বদলে সেটা বাড়তেই লাগল। ডাক্তার প্রেসার মেপে বললেন আমার বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। তিনি ওষুধ দিলেন অথচ তাতে কোন কাজ হল না।

মাথার ভেতরে বেদনা শুরু হবার দিন সাতেক বাদে রাত্রে আর ঘুমই এল না। রাত্রে ঘুম না এলে, আমার মত সুখী মানুষের যন্ত্রণা বেড়ে যায়। অতএব আমি আর সুখী থাকলাম না।

ব্যাপারটা টিউমার, এমন আন্দাজ করে ডাক্তার এক্সরে করতে বললেন। যেদিন প্লেট নিতে গেলাম সেদিন এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটল। সেই ক্লিনিকের ডাক্তার সন্তর্পণে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বিনীত গলায় বললেন, 'আর একবার এক্সরে করতে হবে।'

আমি বিরক্ত হলাম, একটা কাজ কেন এরা একবারে করতে পারে না? ডাক্তার বললেন, 'আপনার এক্সরে প্লেটে টিউমার নেই। যেটা আছে সেটা যে কি, তা আমি বুঝতে পারছি না বলে আর একবার করব।'

উনি আমাকে আলোর বিপরীতে প্লেটটাকে রেখে দেখালেন। মাথার মাঝখানে কিছু একটা, আমার মনে হল, পোকা গোছের কিছু ডানা মুড়ে বসে রয়েছে। শুয়োপোকা প্রজাপতি হতে যাবার শেষ মুহূর্তে যেরকম আদল নেয়, অনেকটা সেইরকম। জিনিসটা যাই হোক ওটি জন্মাবার পর থেকেই আমার এই দুঃসহ যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। অপারেশন করে ওটাকে বাদ দিলেই আমি সুস্থ হয়ে যাব। ছেলেবেলায় গল্প শুনতাম মাথার ভেতরে কেন্নো ঢুকে পড়ে

ডিম পাড়ে বাচ্চা দেয়। এই এক্সরে প্লেট না দেখা পর্যন্ত ভাবতে পারতাম না আমি মাথার ভেতরে পোকা নিয়ে বাস করছি।

শহরের বড় ডাক্তারও অপারেশনের কথা বললেন।

সারাটা রাত চুপচাপ ভাবলাম। যন্ত্রণা সামলে যতক্ষণ ভাবা যায় আর কি। এই অপারেশন মানে অনেক হাজার টাকা। কেউ মুখে না বললেও বুঝতে পারছি বাঁচার সম্ভাবনা আধাআধি। টাকা খরচ করেও মরে যাওযার কোন মানে হয়। এবং ভোরবেলায় আবার মনে হল এর চেয়ে আত্মহত্যা করা ঢের যুক্তিযুক্ত।

আত্মহত্যার চিন্তাটা আসতেই একটা দারুণ ঘটনা ঘটল। বেদনাটা মন্ত্রবলে উধাও হয়ে গেল যেন। আমার মাথায় আর কোন কষ্ট নেই। আমি মাথাটা টিপলাম। কি হালকা লাগছে। আনন্দে হেনাকে ফোন করলাম। ও গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমার শরীর কি আরও খারাপ হয়েছে? দ্যাখো, আমি তোমার কারণে এমনিতেই প্রচণ্ড টেনশনে আছি। আমার আর টেনশন বাড়িও না।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বলছ তুমি?'

'তোমার মাথার ভেতরে একটা কিছু পাওয়া গিয়েছে যেটা যন্ত্রণা দিচ্ছে। আর এখন তুমি বলছ যন্ত্রণা নেই। মানসিকভাবে তুমি সুস্থ তো?'

'হ্যাঁ। আমি তোমার জন্যে বেঁচে আছি হেনা। তোমার সঙ্গে বাঁচতে চাই। আর আমার অপারেশনের দরকার হবে না।' কথাগুলো শেষ করতেই যন্ত্রণাটা ফিরে এল। আমি কোনরকমে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। এটা কি হল? পোকাটা কি কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছিল? নাকি অসাড় হয়েছিল। যন্ত্রণাটা প্রচণ্ডতর হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁতে চেপে ভাবলাম আত্মহত্যা না করে উপায় নেই। আমি কিভাবে আত্মহত্যা করব? এই ভাবনাটা শুরু হওয়ামাত্র কর্পূরের মত যন্ত্রণাটা উধাও হয়ে গেল।

যেভাবে মানুষ আগুন আবিষ্কার করেছিল সেইভাবেই প্রায়-সত্যটাকে আবিষ্কার করলাম আমি। যখনই আমার মাথায় আত্মহননের ভাবনা আসে তখনই যন্ত্রণা উধাও হয়। যেই বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখি অমনি সেটা ফিরে আসে। যদি ওই পোকাটা আমার যন্ত্রণার কারণ হয় তাহলে বলতে হবে তার বোধশক্তি আছে। আত্মহত্যা করলে তার অস্তিত্ব ধ্বংস হবে। তাই সে ভীত হয়। নিজেকে নিষ্ক্রিয় রাখে। আমার আর কষ্ট থাকে না। কিন্তু যেই সে জানতে পারে আমি বাঁচার স্বপ্ন দেখছি, অমনি সে পুষ্ট হতে চায়, বেদনাও শুরু হয়।

অতএব এখন অবস্থাটা এমন দাঁড়াল, বেদনামুক্ত হতে হলে আমাকে আত্মহত্যার কথা ভাবতে হবে। আজকাল যতক্ষণ জেগে থাকি ততক্ষণ আমার বেদনা থাকে না। ঘুমোলেই সেটা ফিরে আসে। কারণ মানুষ ঘুমিয়ে কিছু ভাবতে পারে না। ঘুম ছাড়া কি মানুষ বাঁচতে পারে?

আত্মহত্যার কথা দিনরাত ভাবতে ভাবতে আমি কাহিল হয়ে পড়েছি। অথচ এটা না ভেবেও আমার উপায় নেই। মানুষ কত রকমের কাণ্ড করে মরতে পারে? বিষ খেয়ে, আগুনে পুড়ে, ব্লেডে হাতের শিরা কেটে, ট্রেনের সামনে লাফিয়ে পড়ে, গলায় দড়ি দিয়ে, বাসের তলায় পড়ে, নদীতে ডুবে গিয়ে। কিন্তু আমার মনে হতে লাগল এর কোনটাই খুব আরামদায়ক নয়। আর যেহেতু আমি খুব সুখী ছিলাম তাই মরার সময় অনর্থক কষ্ট করতে ইচ্ছে হল না। অতএব আমি হেনার কাছে ছুটে গেলাম। গিয়ে বললাম 'হেনা, একটা উপকার কর, যাহোক একটা উপায় বল যাতে আমি সুখে আত্মহত্যা করতে পারি।' হেনা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। যেন এমন অদ্ভুত অনুরোধ সে কখনও শোনেনি। সে হেসে বলল, 'পাগলামো করো না।'

আমি তখন সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম। ওর মনে হল ব্যাপারটা আমার মানসিক। ওর অনুরোধে মনের ডাক্তারদের কাছে গেলাম। তাঁরা আমাকে নিয়ে নানান পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হলেন যে, পোকাটা আমার শত্রুতা করছে। এবার হেনা গম্ভীর হয়ে গেল। আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল। নিজস্ব পুরুষ আত্মহত্যা করবে এটা কোন নারী মেনে নিতে পারে?

কিন্তু আমি কি-ইবা করতে পারি। আত্মহত্যা করব, এ ব্যাপারে আর কোন দ্বিধা নেই।

কিন্তু মুস্কিল করল এই হেনাই। এই নারী আমায় ভালবেসেছিল। এক সময় ওকে অনেক পুরুষ কামনা করেছিল। রাজেন্দ্রাণীর মত হেনা আমার দাওয়ায় এসেছিল।

আত্মহত্যা করলে আর হেনাকে দেখতে পাব না, এই ভাবনাটা আমি সহ্য করতে পারছি না। অতএব শেষ পর্যন্ত হেনাকেই বললাম একটা উপায় বের করতে যাতে আমি সুখে আত্মহত্যা করতে পারি। অথচ হেনা বলল, 'পাগলামি করো না।' রাত্রে একা শুয়ে হঠাৎ মনে হল, আমি কি চাইছি হেনাও আমার সঙ্গে আত্মহত্যা করুক? আমি না থাকলে হেনাও থাকবে না এমন চিন্তা কি আমার অবচেতনে এসেছে? লজ্জায় পড়ে গেলাম। হেনাও যদি তাই ভেবে থাকে? হেনা মারা গিয়েছে, ওর সুন্দর শরীর চিতায় জ্বলছে, দৃশ্যটা কল্পনা করতেই কুঁকড়ে উঠলাম। এ আমি সহ্য করতে পারব না। মরে গেলেও না। ওকে আমি বিয়ে করতে পারিনি। কিংবা বলা যায় ও আমায় বিয়ে করতে পারেনি। প্রতিবন্ধকতাকে মানতে হয়েছে। শুধু ভালবাসা বেসে যাওয়া ছাড়া আমাদের অন্য জীবন নেই। আর এখন তো বিয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিয়ের পর ওকে বিধবা করে রেখে যাওয়ার মত কাজ আমি করতে পারি না। কিন্তু হেনাকে ছেড়ে আমি থাকব কি করে? চোখ বন্ধ করলেই ওর পদ্মের মত মুখ ভেসে ওঠে।

বিকেলবেলায় ভাবনাটা মাথায় এল। ভাবনা এবং যন্ত্রণা আজকাল বেশ চমৎকার পরস্পরকে মেনে নেয়। আমি একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ কিনে ফেললাম। কোথায় পড়েছিলাম খালি সিরিঞ্জে হাওয়া পুরে ধমনীতে সেই হাওয়া ঢুকিয়ে দিলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে

হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। তেমন দক্ষতার সঙ্গে করতে পারলে কোন ডাক্তারের পক্ষে ব্যাপারটা ধরা অসম্ভব হয়ে উঠবে। মনে হবে হার্ট অ্যাটাকড্ হয়েছে।

সন্ধ্যেবেলায় হেনাদের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম সে নেই। এমন কখনও হয় না। যেখানেই যাক সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে সে। বাড়িতে অপেক্ষা না করে কাছের বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ালাম। যে বাসে হেনা ফেরে সেগুলোর দিকে সাগ্রহে তাকাচ্ছি। এইবার অন্য দুশ্চিন্তা হল। হেনা অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো? আমার কথা ভেবে বেচারা তো সবসময় টেনশনে আছে। আর তা থেকে প্রেসার, মাথা ঘুরে পড়া, কিছু একটা ঘটতে তো পারে।

নটা বাজল তবু হেনার দেখা নেই। এরমধ্যে ওর বাড়ির দরজায় দুবার গিয়ে দেখে এসেছি। এমন হতে পারে আমি লক্ষ্য করিনি আর সে আমারই পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেটা হয়নি। সাড়ে নটা নাগাদ, কি করব বোঝার মত অবস্থাও যখন নেই তখন ট্যাক্সিটা আমাকে ডিঙিয়ে থামল হেনার বাড়ির সামনে। দ্রুত ছুটে যেতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। হেনা একা নামছে না। অন্ধকার ওখানটায় ছড়ানো বলে সঙ্গীকে ঠাওর না করলেও শক্ত সমর্থ যুবক বলেই মনে হচ্ছে। ভাড়া মিটিয়ে হাসতে হাসতে ওরা বাড়ির দিকে যাচ্ছে। যুবকটি কে? আত্মীয়? বন্ধু তো হতেই পারে না। আমি ছাড়া কোন পুরুষকে হেনা বন্ধু হবার সুযোগও দেয়নি যে বাড়িতে আসতে পারে। তাহলে? কুল কুল করে ঘামতে লাগলাম।

অথচ আমি ভেতরে ঢুকতে পারলাম না। এমনকি, হেনার দরজায় নক্ করতেও না। জানলায় আলো জ্বললো। এটা হেনার বসার ঘরের জানলা। যুবক নিশ্চয়ই বসার ঘরে বসে গল্প করছে। কি এমন গল্প?

ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার নারী কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলছে বলে আমি তার কাছে যেতে পারছি না।

আমার চোখের সামনে হেনার বসার ঘরের আলো নিভল। সেই যুবককে একটু এগিয়ে দিয়ে গেল হেনা। আমি স্পষ্ট শুনলাম যুবক বলছে, 'খুব ভাল কাটল আজকের সন্ধ্যে।' হেনা হাসল, 'আমিও রোজ এত টেনশনে থাকি, আজ হালকা ছিলাম।'

যুবক জিজ্ঞাসা করল, 'কবে দেখা হচ্ছে?'

'দেখা যাক।' আলতো হাসল হেনা। তারপর ফিরে গেল নিজের ঘরে। একা ।

শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেলাম আমি। আমার মস্তিকে যেহেতু পোকাটাও নিষ্ক্রিয় ছিল সেইহেতু সাড়া ছিল না। আমি দেখলাম হেনার দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। হায়, এত রাতেও হেনার দরজা ভেজানো। খুব খারাপ লাগল। এত অন্যমনস্ক কেন মেয়েটা। দরজাটা বন্ধ করা উচিত ছিল। একা থাকে, দিনকাল খারাপ।

ঠেলতেই পাল্লা খুলে গেল এবং আমি অন্ধকার ঘরে পৌঁছলাম। আর সেই গভীর অন্ধকার থেকে হেনার হাত উঠে এল, 'আলো জ্বেলো না।'

আমি চমকে উঠলাম। আমিই যে এসেছি বুঝল কি করে হেনা? ও কি আমাকে রাস্তায় দেখেছে? আমার জন্যেই কি দরজা ভেজিয়ে রেখেছিল খিল না তুলে।

'কি হয়েছে তোমার?' প্রায় ভুতুড়ে গলায় জিজ্ঞাসা করলাম।

'কিছু না।' ঠাণ্ডা মাখামাখি ওর স্বরে।

প্রায় হাতড়ে হাতড়ে চেয়ার টেনে বসলাম। এবং বসতেই হেনা বলল 'তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। এবার আমাকে একা থাকতে দাও।'

'কি হয়েছে তোমার, হেনা?'

'কিছুই হয়নি। কিছু একটা হলে তো বেঁচে যেতাম।'

'যেমন?'

'কত কি। অফিস থেকে বের হবার সময় গাড়ি চাপা পড়তে পারতাম, যে লোকটি এসেছিল, সে আমাকে একা পেয়ে রেপ করে যেতে পারত। আজ প্রায় বারো বছর পরে যাকে ফোন করেছিলাম, সে এই রাত্রে আসতে পারত।'

'কাকে ফোন করেছিলে!'

'জয়ন্তকে।'

'জয়ন্ত! হেনা?' চিৎকার করে উঠলাম আমি।

'চেঁচাচ্ছ কেন? জয়ন্ত তো আমার জীবনে প্রথম পুরুষ।'

'কিন্তু তাকে তো তুমি ঘেন্না কর। কি প্রচণ্ড প্রতারণা করেছে সে তোমাকে। বারো বছর ধরে লোকটার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাওনি তুমি!'

'ঠিক। কিন্তু এটাও সত্যি যে আজ ওকে ফোন করেছিলাম।'

'কেন?'

'জানি না। কিছু একটা হোক আমার, সেই জন্যেই হয়তো।'

'এই ছেলেটি কে?'

'পরিচিত। প্রায়ই বলত বাড়িতে আসবে। এতদিন পাত্তা দিইনি। আজ নিয়ে এলাম। রেস্টুরেন্টে খেলাম। কিন্তু বদলে আমার মাথা ধরিয়ে দিয়ে গেল।'

'কি করে?'

'একই কথা বলে। যে কথা একসময় জয়ন্ত বলত, সে কথা তুমি বল সেই একই কথা।' আমি আর পারলাম না। উঠে আলো জ্বাললাম। সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে মুখ ঢাকল হেনা, 'আঃ, বললাম আলো জ্বেল না। আমার মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

আমার বুকের ভেতর অন্য কেউ কথা বলল যেন, 'কখন থেকে? ওষুধ খেয়েছ?'

'ওষুধে কিছু হবে না। এটা ঠিক সেই ধরনের মাথা ধরা নয়।'

'তবে?'

'জানি না। মাথার ভেতরে সারাক্ষণ দ্রিমি দ্রিমি শব্দ। হাঁটতে গেলে মাথা ঘোরে। উঃ, কি অসহ্য যন্ত্রণা।'

'হেনা!'

'কি?'

'তোমার ডাক্তার দেখানো উচিত।'

'কেন?'

'আমারও এমন হয়েছিল।'

'দূর। এখন তুমি যাও।'

'তুমি এমন করো না হেনা।'

'কি করেছি?' হেনা উঠে দাঁড়াল, 'আমি জয়ন্তকে বলেছি যত রাত হোক এখানে আসতে। ও এলে তোমার ভাল লাগবে না।

'জয়ন্ত আসবে?'

প্রস্তাবটা করা মাত্র ও লাফিয়ে উঠেছে। ওর জীবনে যে সব নারী এসেছে আমি এতদিন তাদের থেকে আলাদা ছিলাম। আজ ফোন করা মাত্র এক হয়ে গেলাম।'

'ও এত রাত্রে এলে বাড়ি ফিরবে কখন?'

'না ফিরতে পারলে ফিরবে না।'

'হেনা!'

'আঃ, এমন করো না। আমি তোমার সম্পত্তি নই। বিষ খেতে পার, রেল লাইনে মাথা পেতে দিতে পার, গলায় দড়ি দিতে পার; আত্মহত্যার যে কোন রাস্তা বেছে নিতে পার যখন তুমি, তখন আমিই বা পারব না কেন? তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। প্লিজ চলে যাও।'

'তোমাকে আমার ঘেন্না লাগছে হেনা।' দাঁতে দাঁত চেপে বললাম।

'গুড, এই তো চাই।'

'আর কোনদিন তোমার কাছে আসব না।'

'সেই সুমতি হোক।'

আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। ছিটকে বেরিয়ে এলাম ওর বাড়ি থেকে। প্রচণ্ড ক্রোধ এখন মাথার ভেতর পাক খাচ্ছে। আমার স্থির বিশ্বাস, জেনেশুনে হেনা এই কাণ্ডটি করছে। এ তো স্রেফ আত্মহত্যা। হেনাকে মানায় না। বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি। রাতের শেষ বাসগুলো দ্রুত চলে যাচ্ছে। এই সময় ট্যাক্সিটা এল। দরজা খুলে যে লোকটা নামল তাকে চিনতে অসুবিধে হল না। জয়ন্ত। টাকা গুনে ভাড়া দেওয়ার সময় মনে হল ওর পা'দুটো ঠিক থাকছে না। জয়ন্তকে চিনিয়েছিল হেনাই। রবীন্দ্রসদনের এক অনুষ্ঠানে। দূর থেকে। সেদিন ওর সঙ্গে অন্য নারী ছিল। বিয়ের বাঁধনে ধরা দেওয়ার পাত্র নয় জয়ন্ত, তাই আজও

অবিবাহিত। সব নারীকে সে জয় করতে পেরেছে শুধু হেনা ছাড়া। এখন জয়ন্ত শিস দিতে দিতে হেনার বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। এই এত রাত্রে। ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে লোকটাকে বেদম মার দিই। কিন্তু যার নিজের পায়ের তলায় জায়গা নেই, সে তো কিছুই করতে পারে না। হঠাৎ মনে হল, বারো বছর বাদে ওরা কি কথা বলতে পারে?

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। সব বাস বাড়ি ফিরে গিয়েছে। সব বাড়ির আলো নিভে গিয়েছে। খেয়াল হতেই ধীরে ধীরে হেনার বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোথাও আলো জ্বলছে না। জানলাগুলো অন্ধকার। জয়ন্ত ওখানে আছে? হেনার সঙ্গে? নাকি জয়ন্ত ফিরে গিয়েছে আমি দেখতে পাইনি। বুকের সবকটা পাঁজর যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

প্রায় শেষ রাত্রে বাড়ি ফিরলাম। টলতে টলতে বিছানায় গিয়ে বসতেই টেলিফোন বেজে উঠল। এত রাত্রে কে? কথা বলার শক্তি ছিল না, ইচ্ছাও। কিন্তু যন্ত্রটা বেজেই চলেছে। অলস হাতে রিসিভার তুললাম, কথা বললাম না। আর ওপাশ থেকে ঢেউ-এর মত আছড়ে পড়ল প্রশ্ন। 'ওঃ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কোথায় ছিলে?'

হেনা। আমি জবাব দিলাম না।

'কথা বলছ না কেন? আমি পনের মিনিট পর পর ফোন করছি তোমাকে? হ্যালো। কথা বল। আমি আর পারছি না।' কেঁদে উঠল হেনা।

'কি পারছ না!'

'আত্মহত্যা করতে।'

'জয়ন্তবাবু কোথায়?'

'আমি ঢুকতে দিইনি।'

'মানে?'

'তুমি চলে যাওয়ার পর মনে হয়েছিল, আমার ম'রে যাওয়াই উচিত। তোমার মাথার পোকার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তুমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছ। আর তার রাস্তা আমাকেই বলে দিতে বলছ। আমি এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারিনি। পরিচিত ছেলেটিকে নিয়ে রেস্টুরেণ্টে খেয়েছি, বাড়িতে নিয়ে এসেছি আর বমি পাক খেয়েছে শরীরে। জয়ন্তকে ফোন করেছিলাম রাগে অপমানে জেদে। নিজেই খাল কেটে কুমির ডেকে নিয়ে এলাম। ও এল মদ খেয়ে। ওর গলা কানে আসামাত্র আমার বমি পেয়ে গেল। বেসিনে সেটা উগরে দিয়ে হাঁফাতে লাগলাম। ও শব্দ করতে করতে বিরক্ত হয়ে চলে গেল। তুমি রেল লাইনের তলায় মাথা দিতে চাওনি কারণ সেটা বীভৎস ব্যাপার। তুমি সুখে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলে। জয়ন্তকে দরজা খুলে দিলে আমারও সুখ থাকত না আত্মহত্যায়। শোন, আমি আত্মহত্যা করতে চাই।' হেনার গলা থেকে কান্না মুছে গেল।

'আমিও। সেই জন্যে আমি একটা সিরিঞ্জ কিনেছি। বাতাস টেনে নিয়ে সেটা ঠিকঠিক জায়গায় ঢুকিয়ে দিলেই হৃৎপিণ্ড অচল হয়ে যাবে। সুখে মৃত্যু আসবে। আমি তৈরি।'

'চমৎকার। কিন্তু একটু অপেক্ষা করবে। প্লিজ।'

'কেন?'

'আমরা একসঙ্গে আত্মহত্যা করব।'

'কি করে?'

'একটু আলো ফুটুক। আমি তোমার কাছে আসছি।'

বুক হালকা হয়ে গেল। বালিশে মাথা রাখলাম। এবং কি আশ্চর্য, অনেক, অনেক দিন বাদে ঘুমিয়ে পড়লাম। পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘুম গড়াতে লাগল। সেটা থেমে গেল সকাল ছটায় কলিং বেলের শব্দে। ঘুম ভেঙে হতভম্ব হলাম। পোকাটা আমাকে ঘুমোতে দিল কেন? ঘুমন্ত অবস্থায় তো আমি আত্মহত্যার কথা চিন্তা করতে পারি না। আবার কলিং বেলের আওয়াজ হতেই টলতে টলতে উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। ঝড়ো চেহারা নিয়ে হেনা ঢুকল। দরজা বন্ধ করল। এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ধীরে ধীরে খাটের কাছে গিয়ে সিরিঞ্জটা বের করলাম, 'এসো।' হেনা এগিয়ে এল।

'হৃৎপিণ্ডে বাতাস চাই, ধমনী দিয়ে শিরা দিয়ে বুদ বুদ পৌঁছালেই—।' হাত থেকে সিরিঞ্জ টেনে নিয়ে ছুড়ে দিল হেনা। 'তার জন্যে এটার কি দরকার? তুমি আমাকে জড়িয়ে ধর, গ্রহণ কর, সারাজীবনের জন্যে।'

'আমরা আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম হেনা।' ওর আলিঙ্গনে আমি ডুবে যাচ্ছি।

'করছি তো। দুজনে দুজনের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ নিয়ে সারাজীবন একসঙ্গে থাকব। সুখের এমন আত্মহত্যা আর কিছুতেই তো হবে না গো! তুমি সুখে মরতে চাওনি, বল?' আমি মরলাম।

মা নু ষ লী লা

এখন রাগী মেঘেরা নিরুদ্দেশে। একটু আগে নিজের মুখে আগুন পুরে গোল সূর্যটা পৃথিবীর নিচে নেমে গেলে গাছেরা যে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে তাতে মাটির গন্ধ নেই। তবু পদ্মপাতা নধর কিশোরীর মতো নৃত্য শুরু করে দেয় বিলের জলে। হাওয়ারা বয়ে যায়, কোথায় যায়? তখন নির্মেঘ শরীরে আকাশ নীলের ফিনকি দেখে। সদ্য লাফিয়ে ওঠা ঘষা আধুলির মতো চাঁদকে তার অসহ্য লাগে। তাকে এ-দিগন্ত থেকে সে-দিগন্তে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টায় তৎপর হয় আকাশ। তার শরীর থেকে স্বেদ ঝরে পড়ে বিদু বিন্দু, ঝরে পড়ে পৃথিবীর বুকে। আর সেই পতনের সময় শিশির হয়ে যায় তারা। আর সেই শিশিরের স্বরে বাতাস কেঁপে ওঠে, ঘাসেরা উদ্বাহু হয়। পদ্মপাতা তাকে টেনে নেয় বুকে। নিয়েই দেখে শিশিরবিন্দু নিটোল মুক্তো হয়ে ট্র্যাপিজের খেলায় মেতেছে। সেই দুলুনি সামলে রাখা দায়। অনিবার্য পরিণতির কথা জেনেই নিচের বিলের জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তোলে, দে দোল দোল, দে দোল দোল। আর সেই আহ্বানে পদ্মপাতার মায়া মাখা নিটোল শিশির ডুব দেয় বিলের শরীরে। তখন তার অস্তিত্বে আকাশের গন্ধ নেই, পতনপথে ছড়িয়ে থাকা কাঙালেরা সব নীল শুষে নিয়ে নিবর্ণ করে দিয়েছে তাকে। এখন সে গহিন বিল যার শরীরে লবণ মিশবে না কোনদিন।

এ বড় মজার খেলা। এই খেলায় মজে থেকে যদি এক জীবন থেকে অন্য জীবনে চলে যাওয়া যেত! সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, যায়নি কে বলল? এক জীবনে সে কি অন্তত দুই জীবন বেঁচে থাকেনি! অবশ্য বেঁচে থাকা শব্দ দুটোর ঠিকঠাক মানে কি তাই এখন আর স্পষ্ট নয়। ওই যে আকাশে কেউ আচমকা আলোর নখ দিয়ে একটা আঁচড় কাটল, চোখের সামনে রেখাটা বেঁচে উঠল এবং তার পরই মিলিয়ে গেল, ওর কি মরণ হল? চোখ-কান বন্ধ করলেই সে এখন পাতার পতনশব্দ শুনতে পায়, শব্দ যখন থেমে যায় তখন কি সেই শব্দের বেঁচে থাকা শেষ? এসব ভাবতে গিয়ে সে দেখেছে, মাথার ভেতরে ভাবনারা স্কুলের বাচ্চাদের মতো হইহই করে ওঠে, পারলে মারামারিও শুরু করে দেয়। তখন বড় যন্ত্রণা, বড় কষ্ট। তার চেয়ে চেয়ে দেখা, শুধু দেখে যাওয়ায় এক ধরনের মুক্তি আছে, নিজের কাছ থেকে মুক্তি। যে মুক্তির অন্বেষণে সে চলে এসেছে পরিচিত মুখের মিছিল ছেড়ে এই নিরালায়। পুঁথির পাতায় পঞ্চাশ পার হওয়া মানুষদের কথা লেখা থাকে, যারা বনে চলে যেত। শেষ আশ্রয়। বনে গিয়ে তারা কি করত, তেমন কাহিনী তার পড়া নেই। সবাই নিশ্চয়ই আশ্রম খুলে তপস্যায় বসে যেত

না! সেই মানুষগুলো কি করত বনে বনে? সে আছে দিব্যি আরামে। বিলের ধারে কাঠের বাড়ি। বিলের চারপাশে গহিন বন। কাঠের বাড়িটি যাঁর ছিল, তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। যৌবনে মানুষ সাধ করে সম্পত্তি বানায়। ঘরবাড়ি, বাগান, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, কত কি! বার্ধক্য এলে দেখে, শুধু মায়া বুকে নিয়ে সে একা বসে আছে। স্ত্রী যদি চলে যায় আগে, পুত্ররা যদি দূরদূরান্তে, কন্যা যদি বিদেশে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, তা হলে ভালবাসার দুই-তৃতীয়াংশের ওপর অধিকার হারিয়ে যায়। যে এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে, বাড়িঘর বাগান অথবা বাগানবাড়ি জুড়ে, তা চেপে বসে বুকের ওপর। তখন হাঁসফাঁস করে মানুষ। এই কাঠের বাড়ির বৃদ্ধ মালিক তাই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন হস্তান্তর করার জন্যে। যখন কেউ ছেড়ে দিতে চায় তখন সে দর কষাকষি করে না। কিনে নেওয়া সহজ হয়েছিল সেই কারণে।

এক জীবন থেকে আর এক জীবনে চলে যাওয়া সংসারী মানুষরা স্বাভাবিক চোখে দেখে না। তোমরা যেমন আছ থাকো আমি চললাম বললেই কাঁধে কান ঠেকিয়ে আচ্ছা বলবে, তেমন মানুষ সংসারে থাকে না। তাদের যা কিছু প্রয়োজন তা মিটিয়ে দিলেও সন্দেহের চোখে দেখে, তুলকালাম করে। অথচ সব মিটিয়ে দিয়ে যদি তাদের চোখের সামনে মরে যাওয়া যায় তাহলে বোধহয় কষ্টের সঙ্গে স্বস্তি খুঁজে পায় তারা। কষ্টটা বড়জোর শ্রাদ্ধ পর্যন্ত, লোকটা ভাল ছিল, কর্তব্যে কোন গাফিলতি করেনি ইত্যাদি বাক্য বলে বলে ক্লান্ত হয়ে বলা বন্ধ করে। তখন দেওয়ালে টাঙানো ছবিতে ধুলো জমলেও কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু তাই বলে তরতাজা শরীর নিয়ে মানুষটা একটু একা একা থাকবে বলে চলে যাবে কোথাও, এ কেমন কথা!

অতএব ছলনার আশ্রয়। ছবি আঁকার নাম করে এখানে আসা। সঙ্গে চিটেগুড়ের মতো ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তাদের জননী। দুদিনেই হাঁপিয়ে উঠল তারা। এই জঙ্গল আর বিলের জলে বিন্দুমাত্র আনন্দ খুঁজে পেল না তারা। দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। কাছেপিঠে শহর নেই। মাইল আটেক দূরে যে গঞ্জ সেখানে এখনও লবেঞ্চুস বিক্রি হয়। সে বুঝে গেল ওরা আর ভুলেও এদিকে আসতে চাইবে না। ওদের গর্ভধারিণী সব দেখেশুনে বললেন, 'এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব। তোমার তো হতে কিছু বাকি নেই তাই এই বাড়ি কিনেছ!' কিন্তু আর বাধা এল না। তবে মাঝে মাঝে ফিরে যেতে হবে। একজিবিশন তো কলকাতায় অথবা বোম্বেতে করতে হবেই। করলেই লাখ লাখ টাকা। ইচ্ছে যখন হয়েছে, তখন এই পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় বসে ছবি আঁকো। যখন অন্য কোন মতলবের হদিশ পাওয়া যায় না তখনই মানুষ উদার হতে পারে। ওরা ফিরে গিয়েছিল পাততাড়ি গুটিয়ে।

চলে যাওয়ার পর সে উদ্দাম নেচেছিল। দুই হাত আকাশের দিকে তুলে সেই নৃত্যের পর চৈতন্যদেবকে অনুভব করেছিল সে। এমন নৃত্য তিনি নাচতেন, কারণ বাঁধন ছেড়ার আনন্দ পাওয়া যায়। শরীরের সঙ্গে মনেও বেশ ঝাঁকুনি লাগে।

দিনের আলোয় পেট ভরানোর জন্যে পরিশ্রম করতে হত মানুষকে। আলো নিভতেই কিছু করার নেই, তখন ঘুমিয়ে পড়লে অনেক চিন্তা থেকে নিস্তার পাওয়া যেত। সেই যে আদিম অভ্যেস তা এখনও চলছে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা চলে যাওয়ার পর সেই জ্যোৎস্নায় রাতটা জেগেছিল সে আনন্দে। আর তার ফলে আর এক নতুন জগৎ তার সামনে ভেসে উঠেছিল। অতএব সে অভ্যেসটাকে বদলে নিল। যতক্ষণ পারে দিনের বেলায় ঘুমিয়ে নেয়। মুশকিল হল, নৈঃশব্দ্য ঘুমের আয়ু কমিয়ে দেয়।

তার একটা সাইকেল আছে। এটা সে কেনেনি, এ বাড়ির মালিকানা হস্তান্তরের পর এখানেই আবিষ্কার করেছে। বেশ পুরনো সাইকেল কিন্তু এখনও মজবুত এবং চালু। সপ্তাহে একদিন সেটা চালিয়ে বনের পথ ধরে গঞ্জে যায় সে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনে। এখন প্রয়োজনের তালিকা ছোট হয়ে গিয়েছে তার, একটুও অসুবিধে হয় না। গঞ্জের মানুষ কথা চালাচালি করতে ভালবাসে। এ কেমন লোক যে শহরের আকর্ষণ ছেড়ে চলে এসেছে নির্জন বিভুঁই-এ? অপার কৌতূহল তাদের। সে হেসে বলেছে, 'বানগ্রস্থে এসেছি ভাই। শাস্ত্রেই বলেছে পঞ্চাশের পর বনে যেও।' কথাটা কানে গিয়েছিল দারোগাবাবুর। জিপ চালিয়ে হাজির হয়েছিলেন পাখিপাখালিদের সন্ত্রস্ত করে। কে তিনি, কোথায় বাড়ি, কেন এসেছেন জানার পরও তাঁর মুখ পরিষ্কার হয়নি। তবে ফিরে এসেছিলেন দিন সাতেক বাদে। উজ্জ্বল মুখে বলেছিলেন, 'আমি ভাবতেই পারিনি আপনি সেই লোক! বলবেন তো! বাংলাদেশের এত বড় শিল্পী হয়েও এইখানে আপনি, কোন অসুবিধে হলে সঙ্গে সঙ্গে বলবেন আমাকে।'

সে বলেছিল, 'বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম। আমি ভারতবর্ষের নাগরিক, পশ্চিমবাংলায় থাকি। আর অসুবিধে, এখানে যত কম মানুষ আসে তত ভাল।'

'ও! শিল্পীরা বোধহয় একা থাকতে ভালবাসেন। তবে আপনার একজন হেল্পিং হ্যাণ্ড থাকা দরকার। এই রান্নাবান্না ফাইফরমাশ খাটার জন্যে—।'

'প্রয়োজন হলে বলব।'

'অ। ঠিক আছে। তবে যদি কোন সপ্তাহে গঞ্জে না যান তাহলে বুঝব শরীর খারাপ, সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব। বুঝলেন না, আপনার কিছু একটা হয়ে গেলে ওপরতলায় জবাবদিহি করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। হয়তো ঠেলে দেবে সুন্দরবনের ভেতরে।'

সেই থেকে সপ্তাহে একদিন যাওয়ার অভ্যেসটা চালু রেখেছে সে। গঞ্জে যায় হাটবারে। সাইকেল বোঝাই করে ফিরে আসে। একবেলা ফুটিয়ে নিয়ে দু বেলায় খায়। খাওয়াটার সময় তার নিজের মতো করে নিয়েছে। সন্ধে নামার আগে আর দিন ফোটার সময়।

প্রায় মাস তিনেক হয়ে গেল, এখনও তুলিতে হাত দেয়নি সে। কাগজটা একদম সাদা হয়ে রয়েছে এখনও। এখানে ধুলো কম। কলকাতায় এভাবে খোলা ফেলে রাখলে সাদার গায়ে ধুলো জমত। জমতে জমতে রঙটা বিটকেলে হয়ে যেত।

আসলে এখন তার আঁকতে একটুও ইচ্ছে করে না। কলকাতায় নিশ্বাস ফেলার অবকাশ ছিল না। বছরে অন্তত তিরিশটা ছবি তৈরি করতে হবে একজিবিশনের জন্যে। তার ওপর ধনী খদ্দেরদের অর্ডার। তিন বছরের মধ্যে ছবি দিতে পারব না বললেও অপেক্ষা করতে চাইত। মাথায় কিছু আসছে না, তবু এঁকে যেত। আঁকতে আঁকতে কিছু একটা ঠিক বেরিয়ে আসত। বছর কুড়ি তিরিশ আগে কলকাতার শিল্পীদের এই অবস্থা ছিল না।

এখানে এসে এই যে ছবি না আঁকার ইচ্ছে, তাতে বড় আরাম বোধ করে সে। ভেবেছিল, যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন না হয় কাজ শুরু করা যাবে। কিন্তু রাতগুলো তাকে বিপাকে ফেলল। যখন চাঁদ থাকে না, ঘুটঘুটে অন্ধকার আর ঝিঁঝি পোকারা বন্ধ হয়ে যায় তখন একটু একঘেয়েমি আসে। কাঠের বারান্দায় জলের ওপর বসে শুধু ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনে যাওয়া। সেই শব্দ বন্ধ হয় যখন হাওয়ারা আসে না। গাছেরা ভূতের মতো স্থির হয়ে থাকে। চারপাশ নিশ্চল। যেন ক্যানভাসে কালো দোয়াত উপুড় হয়ে আছে।

কিন্তু রাত যখন একটু এগোয়, জোনাকিরা বিলের ওপর উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়, তাদের ছায়া মুছে যায় জলের শরীরে তখন আকাশ থেকে নক্ষত্রেরা এক অদ্ভুত মায়াবী আলো পাঠায় এখানে। যে আলো রাতের কালোকে ফিকে করে দেয় অনেকটা। গাছের পাতা দেখা যায় না কিন্তু আদল বোঝা যায়। সেই সময় হাওয়া বইতে থাকে। তার চোখের সামনে একটার পর একটা ছবি আঁকা হয়, সেই ক্ষণিক একজিবিশনের একমাত্র দর্শক সে। বুক ভরে যায় এবং তখনই মনে হয়, কিছুই আঁকা হল না এ জীবনে।

এক জীবনের আয়ু কত বছর? রবীন্দ্রনাথ একাশি বছর বেঁচেছিলেন। একাশি বছর পর্যন্ত স্রষ্টা ছিলেন তিনি। একজন মানুষ যতদিন সৃষ্টি করতে পারেন, ততদিনই তিনি জীবিত। দারুণ প্রতিভাবান কোন লেখক অথবা অভিনেতা পঞ্চাশ বছর বয়সে হঠাৎ যদি সব কাজ বন্ধ করে শুধু কথা বলে যান, তাহলে আশি বছর বয়স হলেও, তিনি পঞ্চাশেই মারা গিয়েছেন। তা, ধরে নেওয়া যেতে পারে সক্ষম স্রষ্টা একাশি বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেন এদেশে। এই হিসেব ধরলে তার হাতে আর তিরিশ বছরও নেই। তিরিশ বছর মানে তিরিশটা বর্ষা, তিরিশটা শরৎ। পেছন ফিরলে নিজের তিরিশ বছর কম শরীরটাকে স্পষ্ট দেখতে পায় সে।

তিরিশ বছর পর সে পৃথিবীতে থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন এখন নেই, পিকাসো বা দালি নেই। অথচ এঁরা একসময় দারুণভাবে বেঁচে ছিলেন। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো অথবা অজন্তার শিল্পীরা কি ভেবেছেন? বিম্বিসার অশোক? সবাই চলে যেতে হবে বলে, কিন্তু যাওয়ার জায়গাটা জানে না। বলার সময় মনে হয়, ইচ্ছে করে চলে গেল। উনি চলে গেলেন! ন্যাকামি! কেউ যায় না, যেতে চায় না, শুধু ফুরিয়ে যায়। উনি চলে গেলেন না বলে বলা উচিত ফুরিয়ে গেলেন।

ঘুম ভাঙলে সে দেখল আজও রোদ টানটান। ঘড়িতে সাড়ে তিনটে বাজে। এখন বেলা ছোট হয়ে আসার কথা। সূর্য লাটাই গোটায় সাত তাড়াতাড়ি। তবে এত রোদ কেন? তারপর

খেয়াল হল, সে জানলা দিয়ে বিলের জলের দিকে তাকিয়েছে। আকাশের রোদ আর বিলের বিচ্ছুরণ একাকার হয়ে জোরালো চেহারা তৈরি করেছে। হাই তুলতে তুলতে সে কাঠের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জল এখন ঝকমক করছে। রোদের গন্ধে কি বিলের জল সূর্যের স্পর্শ পায়? এই ছবি যদি সে আঁকত তাহলে দর্শককে সে কি করে বোঝাতো? তাদের দুনিয়ায় অরিজিন্যাল ছবির কদর, প্রিন্টের মূল্য শুধু রেফারেন্স হিসেবে। আজ মনে হল এই যে প্রতিনিয়ত প্রকৃতি ছবি এঁকে চলেছে তার অনুকরণ করা মানে প্রিন্ট তৈরি করা। যে শিল্পী এখনকার বিলের ছবি এঁকে দর্শককে অন্তত রোদের গন্ধ পাইয়ে দিতে পারেন, তিনি মরে গেলেও বেঁচে থাকবেন।

তার মনে পড়ল টোপটার কথা। লম্বা সুতোয় বড়শি আর তাতে টোপ পরিয়ে কাঠের রেলিং-এ প্রান্ত বেঁধে ও-প্রান্ত জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল ভোর সকালে, ঘুমাতে যাওয়ার আগে। মাঝে মাঝে বোকা কোন মাছ ধরা দেয়। আজ সুতোয় টান দিতে জলের মধ্যে কেউ খলবলিয়ে উঠল। অর্থাৎ গেঁথেছে। একটু টানতেই বেশ ভারি মনে হল। জলের মধ্যে এতক্ষণ স্থির হয়ে থাকা সেই প্রাণী দ্রুত ছোটার চেষ্টা করল। সুতোয় টান পড়ল তৎক্ষণাৎ। অনেক কসরত করে যে মাছটাকে ওপরে তুলে নিয়ে এল তাকে কখনই দেখেনি সে। অদ্ভুত নীল আভা গায়ে। ওজনে দেড় কেজির বেশি। না রুই অথবা কাতলা। চোখ দুটো বড্ড করুণ। এখনও পেটটা নামছে উঠছে, লেজ নড়ছে প্রতিবাদে। ওর গায়ে নীল মায়া ছড়ানো। এই মাছ কাটা যায় না। খুব যত্ন করে বড়শিটা খোলার চেষ্টা করল সে। একটু রক্ত বের হল। তুলোয় ডেটল নিয়ে লাগিয়ে দিলে কেমন হয়? ঘরে ঢুকল সে আর তৎক্ষণাৎ মাছটা লাফ দিল। শূন্যে উঠে ছিটকে পড়ল বিলের জলে। শব্দ পেয়ে দৌড়ে এল সে। নীল মাছটাকে জলের ওপর দুবার পাক থেকে দেখা গেল তারপর ডুবে গেল নীচে। মাছটা এভাবে না পালালেও পারত। ওকে জলে ফিরিয়ে দিতেই তো সে চেয়েছিল। তার নজর পড়ল কাঠের বারান্দায়। সেখানে বেশ কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে। নীল মাছের লাল রক্ত। কি মনে হতে ঘর থেকে একটা সেলোফেন কাগজ নিয়ে এসে রক্তের ফোঁটাগুলো তুলে নিল সে। এখন এই রক্ত কার কেউ বুঝতে পারবে না। কাগজটাকে রেখে দিল টেবিলে। কলমদানি চাপালো এক প্রান্তে।

স্টোভে ভাত সঙ্গে তিন চার রকমের সিদ্ধ। দুবেলার জন্য। আর একটু ঘি। চমৎকার খাওয়া হয়ে যায়। ভাতে ফ্যান থাকলে আরও জমজমাট। খাওয়া চুকিয়ে বাকিটা ভোরের জন্যে রেখে দিয়ে বইটা নিয়ে বসল বারান্দায়। এটা তার গীতা, তার বাইবেল।

গীতবিতানের পাতা ওলটালে মনের মধ্যে ছবি কথা বলে। অনাবিল শান্তি এসে পৃথিবীটাকে দখল করে নেয়। ভারি ভাল লাগে তখন। শব্দে শব্দে লাইনে লাইনে কত না নবীন আভাস— এই আভাসগুলি পড়বে মালার গাঁথা কালকে দিনের তরে/তোমার অলস দ্বিপ্রহরে। তিনশো বিরাশি পাতায় চোখ আটকে গেল। কি ফুল ঝরিলে বিপুল অন্ধকারে/গন্ধ ছড়ালো ঘুমের প্রান্তপারে।। প্রথম লাইনটিতে যে বিপুল অন্ধকার তাতে অফুরান রহস্যের ছোঁয়া। সেই

রহস্যময় অন্ধকারে ঝরে যাওয়া ফুলের কথা ভাবতে কোনও অসুবিধে হয় না তার। কিন্তু গন্ধ ছড়ালো ঘুমের প্রান্তপারে ব্যাপারটা কি? ঘুমের প্রান্তপার সবকিছু এলোমেলো করে দেয়। বুকে থম লাগে। সে চোখ বন্ধ করে ভাবে। অদ্ভুত ঘোর লাগে। তারপর যখন চোখ খোলে, তখন সামনের জলে রোদের প্রতাপ মুছে গেছে। এই গানটির সুর কিরকম ছিল? অনেক চেষ্টায় সে মনে করতে পারল না। সে লাইন দুটো আবৃত্তি করল। কেমন একটা সুর আসছে ভেতরে। এখানে বিশ্বভারতী নেই। ছড়ি হাতে কারও দৌড়ে আসার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। সে সুরে গাইল। গাইবার চেষ্টা করল। আহা, বেশ লাগছে, কথাগুলো যেন সুরে বসে যাচ্ছে। ভুল সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে, তাকে খুন করলে মার্জনা পাওয়া উচিত। কিন্তু এখন তো সে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে না। রবীন্দ্রনাথের লাইন যখন নিজের লাইন হয়ে যায় তখন বুকে যে গান বাজে তাই উগরে দিচ্ছে। কী যে তার রূপ দেখা হল না তো চোখে,/জানি না কি নামে স্মরণ করিব ওকে। ওকে, ওঁকে নয়। তাহলে সেই না দেখা অনামী সম্মানীয় কেউ নয়, বন্ধু বলে ভেবে নেওয়া যাচ্ছে। আসলে এই যে পাতায় পাতায় জীবনের সেই পরম বন্ধুর অন্বেষণ যে এসে ফিরে গেছে বিরহের ধারে ধারে তাকে যদি সে ছবিতে আঁকতে চেষ্টা করত? অনেক অনেক দিনের মতো তার আজও মনে হল, কিছুই তো হল না। ভালো তো গো বাসিলাম ভালবাসা পাইলাম এখনো তো ভালবাসি—তবুও কী নাই! কিছুই তো হল না!

আসলে গীতাবিতান খুলে বসলে যে শান্তি তা কখন বিষাদে পৌঁছে যায়, টের পাওয়া যায় না। নিজের জন্যে একটা তিরতিরে কষ্ট তৈরি হয়ে যায়। সেই কষ্টে যতখানি ব্যথা ঠিক ততখানি আনন্দ। সে চোখ মেলে দেখল বিলের জল কালো হয়ে গেছে। ওপাশের জঙ্গলের আড়াল আকাশ ছুঁয়েছে বলে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে না। কী রকম গভীর শোক ওড়নার মত চারপাশে নেতিয়ে আছে। এই ছবিটা যদি আঁকা যেত? ওই গাছের আড়ালে থাকা, না-দেখতে পাওয়া সূর্যটাকে, ওই ঝুপ ঝুপ নেমে আসা অন্ধকারকে আর জলের নিঃসঙ্গ স্থিরতাকে দেখে কেউ যদি শোকে বিদ্ধ হত তাহলে সেই ছবি আঁকা সার্থক হত। ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা শব্দ বাজল। একতারার। এখানে একতারা বাজায় কে? এই প্রাকৃতিক জলসার আসরে একতারার অনুরণন চমৎকার মিলেমিশে যাচ্ছে।

বিলের মায়া ছেড়ে সে ঘরে ঢুকে পড়ল। দুটো বড় ঘর পেরিয়ে এপাশের বারান্দায় আসতেই চক্ষু চড়কগাছ। দুটি প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে। দুজনের পরনেই গেরুয়া আলখাল্লা। একজনের হাতে খঞ্জনি আর একজনের একতারা। তাকে দেখতে পেয়েই একতারাধারী নরম হাসল। তার সাদা গোঁফদাড়ি অনেকখানি হওয়া সত্ত্বেও হাসিটা স্পষ্ট। তারপরেই গান বাজল গলায়, 'বৃন্দাবনে রসরাজ ছিল/রসের তাক না বুঝে ধাক্কা খেয়ে/নদেতে এল।' গলাটি চমৎকার, তবে একটু সরু এই যা। সঙ্গিনীর বয়স বোঝা মুশকিল। গান শুরু হয়ে যাওয়া মাত্র তিনি চক্ষু বুজেছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শরীরে নৃত্যের ছন্দ আনছেন খঞ্জনি

বাজিয়ে। ওই তিনটে লাইন ঘুরে-ফিরে গাওয়া শেষ হলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের আগমনের কারণ?'

'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ রস কি জিনিস বুঝতে পারেননি, তাই নবদ্বীপে লীলা করতে এসেছিলেন।'

'কৃষ্ণ তো ভগবান, তিনিও রস বুঝতে পারেননি?'

'বৃন্দাবনের কৃষ্ণের পিতামাতার কামনায় রজবীজে জন্ম হয়নি। তাই তাঁর স্বভাব ছিল কামনাশূন্য। কাম না থাকলে প্রেম তো আলুনি। সেই প্রেমে সহজসাধন হয় না। সেই কারণেই তাঁকে রজবীজে জন্ম নিতে হল নবদ্বীপে। এবার দেহধর্মে কামনা কানায় কানায়। সেই কামনাকে অতিক্রম করতে নিল সন্ন্যাস। কামনা না জড়ালে সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য বাড়ে কি করে? অন্ধকার থাকলে তবে তো আলো জ্বালার প্রয়োজন।' তারপরেই একতারাধারী গান ধরল,

'ওরে আমি কটিতে কৌপীন পরবো।

করেতে করঙ্গ নেবো।

মনের মানুষ মনে রাখবো।'

বিদ্যুতের ছোঁয়া পেল সে। মনের মানুষ মনে রাখবো। কি সহজ কথা অথচ এই কথাটা বলা কি কঠিন। বিড়বিড় করল সে, মনের মানুষ মনে রাখবো। বাঃ।

বৃদ্ধ হাসলো, 'তা তোমার এই নবদ্বীপে একটু জায়গা দেবে না আমাদের?'

ওই একটা লাইনের চারটে শব্দ যেন চার দেওয়াল হয়ে দাঁড়াল তার সামনে। এই একাকী থাকার আনন্দ বানচাল হয়ে যাবে জেনেও মুখে না বলতে বাধল। তবু সে বলল, 'দেখুন, আমি এখানে একা থাকি। একাই থাকতে চাই।'

'থাকো না যত খুশি একা। ঘুরতে ঘুরতে গঞ্জে এসেছিলাম। সেখানকার মানুষ বলল তোমার কথা। তুমি নাকি একা একা ছবি আঁকো। ভাবলাম এত কাছে এসে একজন সাধককে না দেখে অন্য পথে চলে যাব! তা কি হয়?'

'সাধক? আমি সাধক? পাগল!'

'সব পাগলই সাধক নয় কিন্তু সাধককে যে পাগল হতে হয়। পৃথিবীর এত জায়গা থাকতে এমন নির্জনে যে ছবি আঁকে তাকে তো সাধক বলবই। দেখাবে তোমার আঁকা ছবি?' বৃদ্ধর আঙুল একতারার তারে টোকা দিচ্ছিল। সন্ধ্যের নূপুর বাজছে যেন।

সে খুব মজা পেল, 'আসুন। দেখে যান।'

ওরা পায়ে পায়ে ভেতরে এল। শূন্য ক্যানভাসে ঘনছায়া মাখামাখি।

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল, 'কালোয় যদি মৃত্যু, সাদায় তাহলে মুক্তি। প্রস্তুতি চলছে। ভ্রূণ জন্ম নিলেই তো হাত-পা-মাথা পায় না। তাকে সময় দিতে হয়। তাই তো?'

হঠাৎ সে ঝাঁকুনি খেল। বলল, 'আপনাদের মতলব কি বলুন তো? আজ রাত্রের জন্যে একটা আস্তানা চাই, তাই তো? ঠিক আছে, এই ঘরে থাকুন, ভোর হলেই বেরিয়ে যাবেন।

আমি দিন ফুরোবার আগে রাতের খাবার খেয়ে নিই তাই আপনাদের কিছুই খাওয়াতে পারব না আজ। খুব জরুরি কোনও প্রয়োজন ছাড়া আমাকে ডাকবেন না।'

ভেতরের ঘরে চলে এল সে। হঠাৎ মনে হল নির্দয় হওয়া উচিত ছিল। গঞ্জে ভাল ঘর পায়নি বলেই এখানে চলে এসেছে। আর গঞ্জের লোকগুলোও অদ্ভুত, তার কথা না বলতে পারলে যেন স্বস্তি পায় না। যাক গে, একটাই তো রাত। ভেতরের দরজা বন্ধ করল। বাইরের ঘরে তেমন কোনও সম্পত্তি নেই যে নিয়ে উধাও হবে। অবশ্য রাত নেমে গেছে, এখন কেউ জঙ্গলে পা রাখতে সাহসী হবে না।

হ্যারিকেনটা জ্বাললো সে। ওই ঘরে একটা বড় মোমবাতি আছে। দরকার হলে ওরাই জ্বেলে নেবে। দেশলাই আছে তো? না থাকলে নিশ্চয়ই চাইবে। সে বিলের ওপর কাঠের বারান্দায় চলে এল। আহা, রাত্তির এসে গিয়েছে। সে বিলের দিকে তাকাল। সেই আহত মাছটা এখন কি করছে? ওর উপকার করতে গিয়েছিল সে। ওষুধটা যদি সহ্য করতে পারত তাহলে ওর ক্ষত শুকিয়ে যেত। ওরকম নীল মাছ সে কোনকালে দ্যাখেনি। হঠাৎ মনে হল, পায়ের তলায় জলের নিচে কিছু ঘুরছে। ওপরের জলে কোন আলোড়ন নেই কিন্তু সে যেন প্রাণীটির চলাফেরা শুনতে পাচ্ছে। আশ্চর্য! সে এতদিন অনেক নীরব শব্দ শুনতে পেত, খসে পড়া গাছের পাতার সঙ্গে স্থির হাওয়ার সংঘর্ষ তার কানে আসে এখনও। কিন্তু জলের নিচে মাছের ঘোরাফেরায় যে আওয়াজ তা তার কানে পৌঁছলো কি করে? ওটা কি? সেই মাছটা ফিরে এসেছে নাকি? শব্দটা মিলিয়ে গেল। আকাশে এখন অনেক নক্ষত্র। জীবনানন্দ দাস নক্ষত্রের জলের স্বাদ পেয়েছিলেন। কিরকম কিলবিলে হয়ে যায় মনটা। মনের মানুষ মনে রাখবো। দুর্দান্ত।

হঠাৎ তার নজরে এল আকাশের এক কোণে একটু কালচে ছোপ লেগেছে। লম্বা গাছগুলোর মাথা ডিঙিয়ে সেই কালচে ছোপ একটু একটু করে বড় হচ্ছে। গতকাল যা ছিল পরিষ্কার, আজ তা মেঘে ঢেকে যাবে একটু পরেই। তার মন খারাপ হয়ে গেল। আকাশ মেঘের আড়ালে চলে গেলে রাতের কোন আকর্ষণ থাকে না। সে দিনে ঘুমায় রাতে জাগে সেই জাগাটা বড্ড যন্ত্রণাদায়ক হয়ে যায় এমন হলে।

ওপাশে কোনও সাড়াশব্দ ছিল না। হঠাৎ কিছু পোড়া গন্ধ নাকে এল। কি পুড়ছে? সে রেলিং-এর এক প্রান্তে চলে এসে ঝুঁকে পেছনে তাকাল। ধোঁয়া বের হচ্ছে যেন বিলের ধার থেকে। তারপরেই খেয়াল হল, হয়তো উনুন জ্বালিয়েছে রাতের রান্নার জন্যে। ওই ঝোলাদুটোর মধ্যে সব সঞ্চয় থাকে বোধহয়। বৃদ্ধর আর কি, সঙ্গে সঙ্গিনী নিয়ে ঘুরছে, খাওয়াটা ঠিক সময়ে পেয়ে যায়। কিন্তু বাইরে আগুন যেন সাবধানে জ্বালানো হয়, গাছগাছালি পুড়লে আমি সহ্য করব না।

চেয়ারে এসে বসতেই গান কানে এল। 'দয়াল গুরু হে তোমা বই কেউ নাই/আমি খেতে শুতে আসতে যেতে/তোমারই গুণ গাই।' কণ্ঠটি ভাল, মন্দ লাগল না শুনতে। তারপরেই

মনে হল বুড়ো ঘরে আরাম করছে আর সঙ্গিনী হাত পুড়িয়ে রান্না করছে। এমন অবস্থায় গান তো বের হবেই। গান চলছিল, 'অন্তিমকালে যেন তোমার স্বরূপ বুঝে যাই।' হঠাৎ নজরে এল তেড়ে আসছে মেঘের পাল। তাতার দস্যুর মতো কালো তলোয়ার ঘুরিয়ে আকাশের দখল নিয়ে নিচ্ছে। অথচ হাওয়া নেই কোথাও। এটা খারাপ লক্ষণ। চারপাশে এখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সে অস্থির হয়ে উঠল। সটান ঘর পেরিয়ে দরজা খুলল। ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কোলে একতারা নিয়ে গান থামাল বৃদ্ধ। সঙ্গিনী ঘরে নেই।

'প্রচণ্ড বৃষ্টি আসছে, এই সময় আপনার ওই গান মোটেই লাগছে না।'

'কেন? বৃষ্টিকে কি তোমার ভয়?'

'না, বৃষ্টির একটা আলাদা মেজাজ আছে। আলাদা শব্দ।'

'তুমি আগে শব্দের পেছনে ছোট, তারপর গান খোঁজ?'

'শব্দ ছাড়া গান হলে জমে না।'

'কিন্তু শব্দের আগে যে আছে নৈঃশব্দ্য। তুমি লালনের সেই গানটা শুনেছ সাধক? 'যখন নিঃশব্দ শব্দেরে খাবে।' সুরে গাইল বৃদ্ধ।

আবার থম লাগল বুকে। ঠিক তখনই একটা সসপ্যানের কানা পাতা দিয়ে ধরে সঙ্গিনী ঘরে ঢুকল। মোমবাতির আলোয় বোঝা গেল তার বয়স বেশী নয়। কিন্তু বড্ড শীর্ণা, মুখ ঘামে চকচকে। সে সসপ্যান নামিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। ভঙ্গিতে ক্লান্তি স্পষ্ট। টাপুর টুপুর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। অদৃশ্য গাছের পাতায় পাতায়, বিলের জলে বৃষ্টি পড়ার শব্দ প্রথমে খইয়ের মত ফুটছিল, ধীরে ধীরে সেটা একাকার হয়ে গেল।

বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল সে, 'আপনি বাউল?'

বৃদ্ধ হাসল, জবাব দিল না। আবার জিজ্ঞাসা করল সে, 'আপনি কি ফকির?'

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল, 'না সাধক। আমি শুধু সংসার করিনি। ঘুরে বেড়াই, মানুষ দেখি আর সারাদিনে একবার পঞ্চতত্ত্ব খাই।'

'পঞ্চতত্ত্ব মানে?'

'চাল ডাল আর তিন রকমের আনাজ একসঙ্গে সেদ্ধ।'

'ওকে তো খিচুড়ি বলে।'

'খিচুড়িতে বাসনা থাকে। নুন ঘি হলুদ। খাবে নাকি আমাদের পঞ্চতত্ত্ব?'

'না। আমার আহার হয়ে গেছে। ইনি আপনার কে?'

'পথ চলার আনন্দ।'

'কিন্তু আপনি সংসার করেননি অথচ আনন্দের জন্যে স্ত্রীলোকের দরকার হয় কেন?'

'যে কারণে শিশুর জননীকে দরকার হয়। আচ্ছা তুমি ওই গানটা শুনেছ? ওই যে, ভগলিঙ্গে হলে সংযোগ/সেই তো সফল সেরা যোগ। মানে জানো?'

'মৈথুনের কথা বলা হয়েছে।'

বৃদ্ধ খুব হাসল। হেসে বলল, 'ঠিক বলেছ। মৈথুন। গুরুবাক্য লিঙ্গ হলে শিষ্যের কাম যোনি। দাও হে, উদর পূর্ণ করি।'

সে দেখল ওদের খাওয়া। সাদা সেদ্ধ গলা ভাতের সঙ্গে ডাল আলু লাউ আর বেগুন। প্রত্যেকেই নিজের সত্ত্বা নিয়ে ছিল, আঙ্গুলের চাপে একাকার হল।

খাওয়া শেষ করে বৃদ্ধ বলল, 'ভারি জমেছে বৃষ্টিটা। তুমি গান জানো?'

'আজ্ঞে না।'

'তা কি কখনও হয়। যে সৃষ্টি করে, সে গান গাইতে বাধ্য হয়। কেউ শব্দে গায় কেউ নিঃশব্দে। ওই যে রবিঠাকুরের সেই কথাটা—একা গাইলে গান হয় না, দুজনে মিলে গাইতে হয়। গলার গান আর মনের গান মিলেই তো পুরো গান।'

'আপনি রবি ঠাকুরের গান জানেন?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। বলল, 'আজকাল সব কথা একাকার হয়ে যায়। লালন থেকে কুবির সরকার, এঁর কথা ওঁর মধ্যে, তার সঙ্গে রবি ঠাকুরও আছেন। এই যে তোমরা বল--বাউল, দরবেশ, আউল, সহজিয়া, ন্যাড়া, সাহেবধনী, এসবই তো রবি ঠাকুর সেজে বসে আছেন।' কথা বলছিল আর একতারাটি টুং টাং শব্দ তুলছিল। হঠাৎ গলা তুলল, 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,/ তাই হেরি তায় সকল খানে।।'

সে অবাক হল। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব গান তার মনস্থ। কিন্তু এই গানটি বড় একটা কেউ গায় না। গান শেষ হলে সে বলল, 'ভাল লাগল। এবার আপনারা বিশ্রাম করুন। বাইরের দরজাটা বন্ধ রাখবেন। চোরটোর সেই কিন্তু বুনো জন্তু আছে। আর হ্যাঁ, কাল সকালে আমি ঘুমাতে যাওয়ার আগেই যেন আপনারা চলে যান।'

সে ফিরে এল ভেতরের বারান্দায়। তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। মাঝে মাঝে হিংস্র আগুনের নখে আকাশটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে মেঘের ক্রোধ। ওই ভয়ঙ্কর শব্দ ছাপিয়ে কোনও প্রাণের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে না। শব্দ বাজছে চতুর্দিকে। বিলের চারপাশে ভূতের মতো দাঁড়ানো গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে ঝাঁকাচ্ছে ঝড়ো বাতাস। সঙ্গমের মুহূর্তে যে সর্বনাশের আনন্দ তার সঙ্গে এই সময়ের বড় বেশি মিল। গুরুবাক্য লিঙ্গ যদি শিষ্যের কাম যোনি। বাঃ। চমৎকার। সে চেয়ে চেয়ে দেখছিল আর এক সঙ্গমের রূপ। হঠাৎই তার মনে এল এই দর্শনে ক্লান্তি আসে। এইসময় না আকাশ না পৃথিবী কেউ তার নিজস্ব খেলা খেলতে পারে না। উদ্দেশ্য প্রকট হলে লাবণ্য কমে যায়।

এক সময় সব শান্ত হল। মেঘেরা চলে গেল বহুদূর কোন যক্ষদেশে। যাওয়ার সময় তারা শান্ত ভেড়ার মত গেল। একটু একটু করে আকাশে নক্ষত্ররা ফিরে এল। যেন এতক্ষণ দাপট দেখছিল তারা উইং-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে। আকাশে মায়াময় আলোর ঘোর লাগল। সেটা ছলকে এল পৃথিবীতে। গাছপালাদের শরীর এখন বড় ক্লান্ত। শুধু বিলের জল নতুনভাবে

ভরাট। সে মাছেদের চলাফেরা শুনতে পেল। তাদের মধ্যে সেই আহত মাছটি কি আছে? নাকি কাল সকালে সে পেট উল্টে ভেসে উঠবে! উঠলে নিজেকে খুনি মনে হবে তার।

রাতটা ফুরিয়ে গেলে সে ভেতরে এল। এখন তার অনেক কাজ। প্রাতঃকৃত্য সারা, রান্না চাপানো, খাওয়া শেষ করা এবং দিনভর ঘুমানো। কচি আলো ফুটছে পুব আকাশে। সে পাশের ঘরের দরজার দিকে তাকাল। এবার ওদের চলে যাওয়া উচিত। যারা চৈতন্যে নিবেদিত, খাওয়ার বদলে যারা সেবা করে, খিচুড়ি যাদের কাছে পঞ্চতত্ত্ব, তাদের আর ঘরে থাকা কেন? সে দরজা খুলল।

বৃদ্ধ শুয়ে আছে কাল যেমন দেখেছিল। তার মাথার পাশে বসে ভাঙা পাখায় হাওয়া করছে সঙ্গিনী। সে বলল, 'ওঁকে উঠতে বলুন। বেলা হচ্ছে, এই বেলায় বেরিয়ে পড়ুন।'

সঙ্গিনী মাথা নিচু করল, হাত স্থির হল।

এবং তখনই সে লক্ষ করল বৃদ্ধের মুখ স্বাভাবিক নয়। লালচে এবং ঈষৎ স্ফীত। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু হয়েছে নাকি ওঁর?'

সঙ্গিনী জবাব দিল না, তার হাত আবার পাখা দোলাতে লাগল, এবার ধীরে।

সে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে কপালে হাত রাখতেই বুঝল বৃদ্ধের ধুম জ্বর এসেছে। হাতের স্পর্শে বৃদ্ধ তার ঘোলাটে চোখ মেলল, 'ও সাধক! যাওয়া হল না গো। শরীরটা বইবার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি যদি চাও কোনওমতে আকাশের তলায় গিয়ে শুতে পারি।'

সে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে বাধালেন?'

'বেধে গেল। বিনা মেঘে বরষে বারি।' ম্লান হাসল বৃদ্ধ।

'তা এভাবে পড়ে থাকলে তো চলবে না, ওষুধ খেতে হবে। আমার কাছে জ্বরের ট্যাবলেট আছে, তাই খান এখন। না কমলে গঞ্জের ডাক্তারকে খবর দিতে হবে।'

রান্না শেষ করে বিলের জলে স্নান সেরে খেতে বসে একবার ওদের কথা মনে এসেছিল কিন্তু পাত্তা দেয়নি। ওর সঙ্গিনী নিশ্চয়ই গঞ্জের রাস্তা চেনে, ওই পথ ধরেই তো এসেছে, জ্বর কমলে তারই খবর দেওয়া উচিত ডাক্তারকে। ডাক্তার মানে হোমিওপ্যাথির গুলি আর জল দেওয়া ডাক্তার। তার এখনও প্রয়োজন পড়েনি। সঙ্গে সব রকমের চলতি রোগের ওষুধ নিয়ে সে এখানে এসেছে। খেয়েদেয়ে সে শুয়ে পড়েছিল। আজ আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই বলে রোদ উঠেছে খুব।

বিকেল তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙতেই বৃদ্ধের কথা মনে পড়ল। সে দরজা খুলে দেখল বৃদ্ধ সেইভাবে শুয়ে আছে, আর সঙ্গিনী তেমনি একই ভঙ্গিতে বাতাস করে যাচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'জ্বর কমেছে?'

সঙ্গিনী জবাব দিল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কথা বলতে পারেন না?'

'পারি।' খুব দুর্বল কণ্ঠস্বর।

'তাহলে চুপ করে আছেন কেন?'

'বুঝতে পারছি না।'

'ওঁকে কিছু খাইয়েছেন?'

'ওষুধটা।'

'খাবার দাবার দিয়েছেন?'

'এখান থেকে উঠতে পারছি না।'

'নিজে কিছু খাননি?'

এবার জবাব এল না। সে বৃদ্ধের কপালে হাত রাখল, পুড়ে যাচ্ছে। এবার বৃদ্ধ চোখ মেললো না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন?'

বৃদ্ধ অস্ফুটে কিছু বলল। জড়ানো গলা।

সে সঙ্গিনীকে বলল, 'এখনই গঞ্জের ডাক্তারকে ডেকে আনা দরকার। ঠিক আছে, আপনি এখানে থাকুন, আমিই যাচ্ছি। চারপাশে লক্ষ রাখবেন, চোর ছ্যাঁচোড় যদিও নেই, তবু বলা যায় না।' জামা পরে সে সাইকেল বের করল। প্যাডেল করতে করতে মনে হল যত্ত উটকো ঝামেলা তার কাঁধে এসে নামে। কালকে এল সুস্থ মানুষ আর আজকে নেতিয়ে কাদা। এদের ভালোয় ভালোয় বিদায় না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

গঞ্জের ডাক্তার লোকটি ভাল। সব শুনে কাঠের বাক্স সঙ্গে নিয়ে নিজের সাইকেলে চেপে বসলেন। পুরোটা পথ একটাও কথা বললেন না। বৃদ্ধের নাড়ি দেখলেন মন দিয়ে। তারপর বাক্স খুলে ওষুধ বের করলেন। তিনদিনের ওষুধ। না কমলে আবার আসবেন। মাত্র দশটি টাকা দক্ষিণা। তবে আউল বাউল ফকিরদের কাছ থেকে ওষুধের দামটুকু নেন। যে টাকা বের করছিল কিন্তু ভদ্রলোক নিষেধ করলেন, 'উনি সুস্থ হলে ওঁর কাছ থেকেই নেব। আচ্ছা, চলি।'

সে একটু এগিয়ে দিতে এসে জিজ্ঞেস করল, 'অসুখটা কি বলুন তো?

'জ্বর। সেটা ইনফ্লুয়েঞ্জা অথবা নিমোনিয়া হতে পারে। ম্যালেরিয়া নয়, তাহলে কাঁপুনি থাকত। তবে তার সঙ্গে বার্ধক্যজনিত উপসর্গগুলো আছে। চিন্তা করবেন না, তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। আপনি তো শুনেছি একা থাকেন?' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। আচ্ছা, নমস্কার।' সে হাতজোড় করতে ডাক্তার চলে গেলেন। এটা না করে তার উপায় ছিল না। এর পরই মানুষ ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে।

ঘরে ফিরে সে বলল, 'শুনুন, ডাক্তার বলে গেল চিন্তার কোন কারণ নেই। একজন মানুষ অসুস্থ হয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু আর একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। বুঝতে পারছেন?'

'আমাকে কি করতে হবে?'

'আপনি স্নান খাওয়া করুন। স্বাভাবিক হয়ে ওঁর সেবা করুন।'

'একটা দিন নাই বা খেলাম। উনি কাল ভাল হয়ে গেলে রাঁধবো।

'ওষুধ খাইয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওঁর মুখ গলা হাত পা ভিজে গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিন।'

'দিয়েছি।'

'আপনি যান স্নান করে আসুন, আমি ততক্ষণ এখানে বসছি।'

সঙ্গিনী তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে তার বোঁচকা নিয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, বিয়ের পর স্ত্রী এভাবেই তার সেবা করত অসুখ হলে। একটু একটু করে কখন কি হয়ে গেল! এখন অসুস্থ হলে ওষুধ খাওয়ায় আর ঘুমোতে বলে। মাথার পাশে অষ্টপ্রহর যদি বসে থাকত তাহলে তারও স্বস্তি হত না এতটুকু।

বৃদ্ধ বলল, 'আঃ।'

সে এগিয়ে গেল, 'কষ্ট হচ্ছে?'

'কে? সাধক? করিলে তাঁর সাধনা/সকলই যাইবে জানা/হবে না আর আনাগোনা/এ ভব সংসার সংকটে।' জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে বলল বৃদ্ধ, 'সংকট, বড় সংকট।'

'আপনি ঘুমান। ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ পড়েছে। ঠিক হয়ে যাবে।'

'জল। একটু জল।'

সে দেখল বৃদ্ধর মাথার পাশের গ্লাসে জল আছে। তাই তুলে নিয়ে ঠোঁটের সামনে ধরল। সামান্যই জল খেল বৃদ্ধ। তারপর বলল, 'কোটি জন্মের যায় পিপাসা/বিন্দুমাত্র জলপানে।' তারপরই আচ্ছন্ন হয়ে গেল আবার আগের মতো।

সে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। এরকম অসুস্থ অবস্থায় প্রায় ঘোরের মধ্যেও বৃদ্ধ এ কি কথা বলল? কোটি জন্মের পিপাসা এক বিন্দু কোন জলে মিটে যায়?

শব্দ কানে যেতে চমক ভাঙল। সে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল সঙ্গিনীর চুল ভেজা। মুখ চকচকে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি এখন খাবো। আপনি ইচ্ছে করলে খেতে পারেন। দেবো আপনাকে?' প্রশ্নটা করেই তার খারাপ লাগল। এভাবে বলা ঠিক হয়নি।

সঙ্গিনী উত্তর দিল না। আবার পাখা নিয়ে বৃদ্ধের পাশে গিয়ে বসল।

সে চলে এল নিজের ঘরে। খাবার বেড়ে তৃপ্তি করে গেল। তারপর একটা বাটিতে কিছু ভাত আর সেদ্ধ, একটা প্লেটে কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে মাটিতে নামিয়ে রাখল। রেখে বলল, 'লড়াই করতে হলে শরীরকে শক্তি জোগাতে হয়। ভাত আপনার জন্যে, আর বিস্কুট ওঁকে খাইয়ে দেবেন।'

কোন প্রতিক্রিয়া হল না। সে ফিরে এল নিজের ঘরে।

আজ অনেকদিন বাদে তার সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হল। সিগারেটের নেশা তার নেই। কখনও সখনও ইচ্ছে হলে খায়। দুটো নতুন প্যাকেট তোলা ছিল। তার একটা ভাঙল। সিগারেট ধরিয়ে জলের ওপর কাঠের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। এখন বিকেল কিন্তু ছায়া ঘন হয়নি। হঠাৎ সে দেখল, একটা বড় পাখি তীব্রগতিতে জলের দিকে নেবে এসে কিছু তুলে

নেওয়ার চেষ্টা করেও বিফল হল। পাখিটা ওপরে উঠে গিয়ে পাক খেল কয়েকবার। আবার নামল শিকারের সন্ধানে। এবং তখনই তার চোখে পড়ল মৃত মাছের শরীর। মরে উল্টে ভাসছে একপাশে। এটা নিশ্চয়ই কালকের আহত মাছটা। শরীর কিরকম সিরসির করে উঠল। যাঃ, মাছটা শেষপর্যন্ত মরে গেল! মন খারাপ হয়ে গেল তার।

চিল অথবা বাজপাখি কিংবা ঈগলও হতে পারে এমন ধরনের পাখিটার এবার সঙ্গী জুটেছে। দুজনে একের পর এক মাছটাকে ঠেলছে ছোঁ মেরে মেরে। প্রায় দশ-বারো বারের চেষ্টায় ওরা মাছটাকে জলের কিনারায় নিয়ে যেতে পারল। অত ভারী মাছ ওরা তুলতে পারবে না বলেই কায়দাটা করল। এবার প্রায় জলে নেমেই মাছটাকে ওরা টেনে তুলল ডাঙায়। সঙ্গে সঙ্গে বেপরোয়া হয়ে ঠোকরাতে লাগল শরীরটাকে। মাঝে মাঝে ঘাড় কাত করে ওরা তাকে দেখছিল।

সে ভেতরে ঢুকল। কাল যে কাগজে মাছের রক্ত তুলে রেখেছিল সেটাকে বাইরে বের করে আনল। কালচে দাগ হয়ে গেছে রক্তের ফোঁটাগুলো। জলে ভাসিয়ে দিল সে। মাছটা যদি ধৈর্য ধরতো তাহলে হয়তো বেঁচে যেত ওষুধ পড়লে। নীল রঙের মাছ এই বিলে আর কটা আছে কে জানে!

একটু একটু করে সন্ধ্যা নামল। আজ আকাশ পরিষ্কার। নক্ষত্রেরা সম্রাটের মতো যে যার জায়গায় চলে এসেছে। একটু বাদেই ধুন্দুমার কাণ্ড হবে সেখানে। গাছের ডালে ডালে দিনের পাখিরা তুমুল চিৎকার শুরু করে দিয়েছে সারা রাতের জন্যে চুপ করে থাকার আগে। এই সময় চমৎকার একটা গন্ধ বেরিয়ে আসে জঙ্গলের শরীর থেকে, সে ঘ্রাণ নিল।

এখন আকাশ ছবি আঁকা শুরু করবে। তার সঙ্গে যোগ দেবে জোছনা, গাছগাছালি, হঠাৎ উড়ে যাওয়া নাম না জানা রাতের পাখি এবং এই বিলের জল। সেই অনির্বচনীয় সৃষ্টি দেখতে দেখতে নিজের জন্যে বড় কষ্ট হয় তার। কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই/কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই। কিছুই তো হল না।

তখন কত রাত জানা নেই, শব্দ কানে আসতেই সে সজাগ হল। এতক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে বোধহয় তার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছিল, ধাতস্থ হয়ে ঘরে ঢুকতে যা একটু দেরি। শব্দ হচ্ছে ওদিক থেকে বন্ধ দরজায়। হ্যারিকেন জ্বালালো সে। দরজা খুলতেই সঙ্গিনী সরে দাঁড়াল, মোমবাতিটা জ্বলে জ্বলে শেষ, প্রাণ সলতেয় রেখেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

'উনি কেমন করছেন!' আর্তনাদের স্বর সঙ্গিনীর গলায়।

সে হ্যারিকেন তুলে বৃদ্ধের পাশে যেতেই চমকে উঠল। মুখ বেঁকে গেছে বৃদ্ধের।

একটা হাত মুঠো করে কিছু বলার চেষ্টা করছে। চোখ বিস্ফারিত। সে দুবার প্রশ্ন করেও জবাব পেল না। জবাব দেওয়ার কোন ক্ষমতা বৃদ্ধের নেই।

'কখন থেকে এরকম হয়েছে?'

'একটু আগে থেকে।'

'আমায় ডাকেননি কেন?'

'ডেকেছিলাম।'

তার নিজেরই মনে হল, কি বোকার মতো কথা। সে ডাক্তার অথবা ঈশ্বর নয় যে সময়ে ডাক পেলে কিছু করতে পারত। তবে এটা সামান্য কোন রোগ নয়। হয় হার্ট অ্যাটাক, নয় স্ট্রোক। এখন কি করা যায়? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই নীল মাছটার কথা, যার শরীর আজ পাখিগুলো ঠুকরে খেয়েছে। বাকিটা এতক্ষণে শিয়ালের পেটে চলে গেছে। ওই মাছটাকে সে বাঁচাতে পারত। শুকিয়ে গেলে রক্তের রঙ কালো হয়ে যায়।

'আপনি ভয় পাবেন না, আমি ডাক্তারকে ডেকে আনছি।'

কোন শব্দ শুনল না সে সঙ্গিনীর মুখে। সাইকেল বের করে চলল সে জঙ্গলের পথে। তাড়াতাড়ি যাওয়ার চিন্তা ছাড়া কোন কিছু সে ভাবতে পারছিল না। এমন কি একটা বটগাছ কুঁজো বুড়োর মতো তারার আলো মেলে উবু হয়ে বসে আছে তাও সে দেখতে পেল না।

গঞ্জ নিঝুম। কোথাও মানুষের শব্দ নেই। দরজার কড়া নাড়তে হল কয়েকবার। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। 'ও আপনি! কি ব্যাপার?'

যা যা দেখে এসেছে জানিয়ে দিল সে।

'এই অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো দরকার। ওখানে ওষুধপত্র এবং অক্সিজেন পাবে। আমার হোমিওপ্যাথি ওষুধে যে কাজ হবে তেমন কথা বলতে পারছি না।'

'কিন্তু শহর তো অনেক দূর!'

'তা বটে। ঠিক আছে, চলুন।'

পুরোটা পথ দুটো সাইকেল পাশাপাশি এল, কোন কথা বিনিময় হল না।

বৃদ্ধকে পরীক্ষা করে ডাক্তার ওষুধ দিলেন। পর পর দুবার। তারপর পাশেই বসে থাকলেন। মাঝে মাঝে নাড়ি দেখছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভোর হয়ে গেল।

ডাক্তার এবার বেরিয়ে এলেন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি চা খাবেন?'

'আমি তো চা খাই না।'

'ও। কি বুঝলেন?'

'বাঁ দিকটা অবশ হয়ে দিয়েছে। বাকশক্তিও নেই। তবে এ যাত্রায় মৃত্যু হবে না।'

'তার মানে—?'

'হ্যাঁ। জীবন্মৃত হয়ে থাকবেন।'

'কোন প্রতিকার নেই?'

'আছে। সেটা কলকাতায় নিয়ে গেলে হতে পারে। তবে—।'

'তবে?'

'ওঁর যা বয়স তাতে টানা-হ্যাঁচড়া করে কোন লাভ নেই। যদি দ্বিতীয় বার আক্রমণ হয় আজকালের মধ্যে, তাহলে উনি ওঁর বৈকুণ্ঠে চলে যেতে পারবেন।'

'যদি না হয়?'

'তাহলে বলব ওঁর যেমন কষ্ট হবে আপনাদেরও তেমনি। আচ্ছা চলি।'

'আপনারা দক্ষিণা—।'

'বলেছি তো। বাউলদের কাছে আমি শুধু ওষুধের দাম নিই।'

'কিন্তু উনি তো—।'

'আর একজন বাউল এসে দিয়ে যাবেন তাঁর গান শুনিয়ে।' ডাক্তার তাঁর সাইকেলে উঠে বসলেন। ভোরের নধর আলো মাখতে মাখতে চলে গেলেন।

সে ফিরে এল এই ঘরে। সঙ্গিনী কাঁদছিল।

সে নিজের ঘরে চলে এল। কান্নার আওয়াজ এই ঘরেও পৌঁছেছে। হঠাৎ তার মনে হল সঙ্গিনীর সঙ্গে বৃদ্ধের সম্পর্ক কতটুকু, কতদিনের? ওরা কি স্বামী-স্ত্রী? সে বাউল ফকিরদের সম্পর্কে কিছুই জানে না। কিন্তু যে কান্না কানে আসছে তা বুকের গভীরে কষ্ট না জমলে কাঁদা যায় না।

এখন সে কী করবে? বৃদ্ধ যদি পঙ্গু হয়ে এই বাড়িতে পড়ে থাকে তাহলে তার কী করণীয়? ওকে তো জোর করে বের করে দেওয়া সম্ভব নয়। আবার বৃদ্ধকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করানোর উদ্যোগ নেওয়াটাও বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। হঠাৎ তার মনে হল আজ অথবা আগামীকালের মধ্যে বৃদ্ধের দ্বিতীয়বার আক্রমণ হোক।

পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল। ওর কথা যেটুকু সে শুনেছে তাতে লোকটার মৃত্যু একটু শ্রদ্ধাজনকভাবে হোক, এমনটা তার মনে হল। আর মৃত্যু হলে সে অনেক দায় থেকে বেঁচে যাবে। অবশ্য, ধরতে গেলে এখনও তার তেমন কোন দায় নেই। এক রাত্রের জন্যে ওরা আশ্রয় চেয়েছিল, সে দিয়েছে। এবার বের করে দিতে কোনও অসুবিধে নেই। যদি লোকটা অসুস্থ না হতো তাহলে বের করে দিত। কলকাতায় নিয়ে চিকিৎসা করালে বৃদ্ধ বেঁচে গেলেও যেতে পারে। চিকিৎসার খরচ যাই হোক তার পক্ষে বহন করা অসম্ভব নয়। লোকটা খুব সুন্দর কথা বলে। শুনলে মনে গেঁথে যায়।

এখন তার প্রাতঃকৃত্য সেরে খাওয়া-দাওয়ার সময়। কিন্তু মন পড়ে আছে বাইরের ঘরে। কিছুক্ষণ অস্বস্তিতে কাটলো। তারপর সে চলে এল বাইরের ঘরে। সঙ্গিনী তেমনই বসে হাওয়া করে যাচ্ছে। সে বলল, 'এখন আর হাওয়া করে কি হবে? ওর শরীরটা একবার ভাল করে ভেজা গামছায় মুছিয়ে দেবেন। দিনে একবার। নইলে ঘা বের হবে। বাকি সময় মনে করে ওষুধ দেওয়া আর খাওয়ানো। জিভ যদি নাড়তে না পারে গলা ভাত খাওয়াতে হবে। বুঝলেন?'

সঙ্গিনী মাথা নাড়লো।

'আপনি কি চান ওঁকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাই?'

'যদি বাঁচে—।' ফিনফিনে আওয়াজ ভেসে এল।

'দেখি, ডাক্তার কি বলে।' সে ঢোঁক গিলল। কি দরকার ছিল প্রশ্নটা করার।

'আমি এখন রান্না চাপাবো। আপনাকে আর আলাদা করে উনুন জ্বালতে হবে না।'

কথাটা শোনা মাত্র সঙ্গিনী উঠে দাঁড়াল।

'কি হল?'

'আমি যদি কাজটা করে দিই।'

'তার মানে আপনি আমার রান্নাও রাঁধবেন?'

সঙ্গিনী জবাব দিল না। মুখ নিচের দিকে।

'বেশ বেশ। আমার খাটুনি বাঁচবে। আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কোথায় কী আছে। তার আগে আপনি একটু পরিষ্কার হয়ে নিন। বাসি কাপড়ে আছেন তো!'

সঙ্গিনী আসার আগে সে চা বানিয়ে নিল। সঙ্গিনী চা খায় না যখন তখন তার জন্যে বানাবার দরকার নেই। আরাম করে যখন চা খাচ্ছে তখন সঙ্গিনী এসে দরজার পাশে নতমস্তকে দাঁড়াল। সে তাকে তার রান্নার সরঞ্জামগুলো দেখিয়ে দিল। সে পঞ্চতত্ত্ব খাবে না। সেদ্ধ হলেও তার নুন এবং ঘি চাই। দেখিয়ে দিয়ে সে বিছানায় যাওয়ার বদলে বেরিয়ে পড়ল। এখানে আসার আগে সে জীবনে কখনও রান্না করেনি। আজ মুক্তি পেয়ে খুব ভাল লাগছিল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা গান বাজল বুকে। অথচ তার সুরটাকে কিছুতেই সে মনে করতে পারল না। পারলেও ঠিকঠাক গাইতে পারত না। গান গাওয়ার সময় কিভাবে যেন সুর সরে যায়। দুঃখ আমার ঘরের জিনিস। খাঁটি রতন তুই তো চিনিস/তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস এ মোর অহংকার।

শেষপর্যন্ত সে নিজের সুরে গানটা গাইল। গাইবার পরেও মন থেকে তার খুঁতখুঁতুনি গেল না। তোমায় সোনার থালায় সাজাবো আজ দুখের অশ্রুধারে। বাহবা। কি লাইন! আরও কয়েক জন্ম জন্ম নেবার পর বাঙালি এমন লাইন লিখতে পারলেও পারে!

খেতে বসে চমৎকৃত। যা বলেছিল তাই রান্না হয়েছে কিন্তু তেমনটি হয়নি। এতদিন যা খেয়েছে তা থেকে অনেক গুণ ভাল। হঠাৎ মনে হল তার স্ত্রীও এমন ভাল রান্না করতে পারত না। পাশের ঘরে পাথর হয়ে শুয়ে থাকা বৃদ্ধ সত্যি ভাগ্যবান। সে হেসে ফেলল। এটা কোন ব্যাপার নয়। পৃথিবীর সেরা রাঁধুনিরা সবাই পুরুষ। তাহলে তো ছেলেদের সঙ্গে থাকতে হয়!

খাওয়া শেষ করে সে পাশের ঘরে এল, 'ওঁকে খাইয়েছেন?'

'না। খেলো না।'

'একটা দিন যাক। ওষুধ কাজ করুক। ঠিক খাবে।'

সঙ্গিনী চুপ করে রইল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি খেয়েছেন?'

কোন উত্তর নেই।

'খেয়ে নিন। আমি একটু গঞ্জে যাচ্ছি।'

সঙ্গিনী কেঁপে উঠল। তার মুখে উদ্বেগের ছাপ পড়ল।

'আপনার কোনও ভয় নেই। কিছু হবে না।' সে প্রবোধ দিল।

সঙ্গিনী তখনও চুপচাপ।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনারা কি স্বামী-স্ত্রী? বাউলদের ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না।'

সঙ্গিনী এরও জবাব দিল না।

'কতদিন আপনারা একসঙ্গে আছেন?'

'দু-বছর।'

'মাত্র! বেশী দিন তো নয়। আপনাদের বয়সের ব্যবধান তো অনেক?'

'মনের ব্যবধান ছিল না।'

শোনা মাত্র চমকে উঠল সে। এ কি উত্তর! তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে ঈর্ষা করতে শুরু করল সে। এমন কথা যে মেয়ে বলতে পারে তার জগৎ আলাদা।

সাইকেল চালিয়ে সে গঞ্জে চলে এল। দামি ফল এখানে পাওয়া যায় না। গ্রামে যা ফলে তাই আসে। আম কাঁঠাল লিচু রুগীর জন্যে নিয়ে যাওয়া যায় না। সে ডাক্তারের কাছে গেল। সারারাত ওই পরিশ্রমের পরও ডাক্তার চেম্বার খুলে বসেছেন। বেশ ভিড় ইতিমধ্যে। তাকে দেখতে পেয়ে ডাক্তার উঠে এলেন, 'কেমন আছেন উনি?'

'একই রকম?'

'দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয়নি?'

'এখনও নয়।'

'তাহলে কি জন্যে এলেন?'

'কলকাতায় নিয়ে গেলে সেরে যাবে?'

'সেখানকার চিকিৎসা ওঁকে এর চেয়ে ভাল করবে এটুকু বলতে পারি। তাছাড়া এসব কেস সেরে উঠতে প্রচুর সময় লাগে। সেইসঙ্গে ভাল সেবা দরকার। অর্থেরও প্রয়োজন।'

'যদি শেষপর্যন্ত কলকাতায় নিয়ে যেতে হয় তা হলে আপনার সাহায্য পাব?'

'নিশ্চয়ই। তবে সেটাও তো দিন পনের কুড়ি আগে নয়। এখন ওঁকে নড়াচড়া করা চলবে না।'

গঞ্জের বড় ব্যাপারী জগন্নাথ রায়ের দোকানে যেতেই সে বুঝতে পারল বাউল যে অসুস্থ এ খবর সবাই জেনে গিয়েছে। তার ওখানে গিয়ে অসুস্থ হয়েছে বলে বেশ মজা পাচ্ছে এরা। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা তো অনেক খবর রাখেন, এই বাউলের ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজনের খবর দিতে পারেন?'

জগন্নাথ বললেন, 'না বাবু। ফি বছর বাউল ঠাকুর একবার গাঁয়ে আসেন। এ বছর আসার সময় সঙ্গিনীকে নিয়ে এলেন। আমি তো তিরিশ বছর ধরে দেখছি ওঁকে, কখনও মেয়েছেলে সঙ্গে দেখিনি। তার ওপর একেবারে মেয়ের বয়সী মেয়েছেলে।'

বাড়ি ফিরে দেখল বৃদ্ধ তেমনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে, সঙ্গিনী পাশে বসে আছে পাথরের মতো। সে বলল, 'কুড়ি দিন আগে ওঁকে এখান থেকে নড়ানো যাবে না। ওঁর বাড়ির লোকজনদের এবার খবর দিতে হয়। তারা কোথায় থাকে বলুন।'

'আমি জানি না।'

'বাঃ। আপনাদের সম্পর্কটা কি?'

সঙ্গিনী চেয়ে রইল, মুখ ফেরালো না, জবাবও দিল না।

'শুনলাম এক বছর আগেও আপনাকে ওঁর সঙ্গে দেখা যায়নি।'

'উনি আমার আশ্রয়দাতা। সম্পর্ক একটা কিছু, যেমন ভাবলে ভাল লাগে, তেমন।'

কথা বাড়ালো না সে। স্নানটান সেরে খেতে বসে মনটা ভাল লাগল। ইতিমধ্যে কিছু ভাজাভুজি হয়েছে। স্বাদটা বদলে গেল। খেয়েদেয়ে বারান্দায় দাঁড়াতেই সন্ধে নামল। কিন্তু আজ আর শরীর তার বইছে না। গতকাল বিকেল থেকে এখন পর্যন্ত তো একটানা জেগে রয়েছে। অনেকদিন পরে সে আজ রাত্রে বিছানায় গেল। এক ঘুমে রাত কাবার।

দিন দশেক কেটে গেছে। এর মধ্যে বৃদ্ধকে নিয়ে প্রচুর ঝামেলা হয়েছে। তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে যেতেও থেমে গেছে। তিন বার ডাক্তারকে ডেকে আনতে হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন দ্বিতীয় আক্রমণ হয়ে গেছে। এখন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আর কোন লাভ নেই।

বৃদ্ধ এখন শুয়ে থাকেন। তাঁর শরীরে একভাবে শুয়ে থাকার জন্যে ঘা বেরিয়েছে। সঙ্গিনী তাঁকে যতই পরিচর্যা করুক সেটা আটকাতে পারেনি। ডাক্তার এক ধরনের পাউডার দিয়েছেন কিন্তু তাতে তেমন কাজ হচ্ছে না। এখন বৃদ্ধকে একলা রেখে কাজকর্ম করতে সঙ্গিনী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যেমনভাবে শিশুকে দোলনায় রেখে মা কাজ করে। ঘর পরিষ্কার, রান্নাবান্না সব কাজ সঙ্গিনী এখন নিজের হাতে করে। শুধু সেদ্ধ অথবা ভাজা নয়, তরকারি এবং ঝোলও রান্না হচ্ছে এ বাড়িতে। বৃদ্ধের জন্যে স্যুপ জাতীয় কিছু, যা চামচে খাওয়াতে হয়।

আজ বেলা এগারটায় সে বড়শিতে টোপ পরিয়ে সুতো জলে ফেলল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সুতোর অন্য প্রান্তে আলোড়ন। সন্তর্পণে ওপরে তুলে নিয়ে এল সে মাছটাকে। পাঁচশো গ্রামের একটা স্বাভাবিক কাতলা। সে ভেবেছিল আর একটা নীল মাছ উঠে আসবে বুঝি। বড়শি ছাড়াতে বেগ পেতে হল। শব্দ পেয়ে সঙ্গিনী এসেছিল দরজায়, জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি মাছ খান?'

'খাই। আপনি খান না?'

'কখনও খাইনি। আগে যার সঙ্গে ছিলাম সে-ও খেতো না।'

'আগে যার সঙ্গে ছিলেন, তিনিও কি বাউল ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো এটাকে ধরে কোন লাভ হল না।'

'তা কেন? আপনি কেটেকুটে দিন আমি রান্না করে দেব।'

তাই হল। খাওয়া দাওয়া শেষ করে সে সিগারেট ধরালো। আকাশ পরিষ্কার। হঠাৎ তার খেয়াল হল, আগে যেসব শব্দ সে শুনতে পেত আজকাল সেগুলো যেন উধাও হয়ে গিয়েছে। তার কান-মন অন্য ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত যে সেইসব অনুভূতির কথা খেয়ালই নেই। হঠাৎ নিজেকে অন্যরকম মনে হল তার। সে আকাশের দিকে তাকাল। সাদা মেঘেদের অলস উড়ে যাওয়ার কোন ছবি নেই।

ঝুপঝুপ শব্দ হল বিলের জলে। কে ওখানে? কৌতূহলী হয়ে সে ঘরের জানলায় চলে এল। তখনই সঙ্গিনী জল থেকে উঠে এল ডাঙায়। পরনে একটা লম্বা গামছা যা শরীরটাকে আব্রু দিতে পারছে না। বেশ ভরাট শরীর। নুয়ে পড়ে যখন শরীর মুছছে তখন অদ্ভুত আলোড়ন উঠল বুকে। যখন বৃদ্ধের সঙ্গে এসেছিল তখন ছিল অতিশয় শীর্ণ, এই কয়েক সপ্তাহেই কি করে এমন ভরন্ত হয়ে উঠল! কেউ যে তাকে আড়াল থেকে এখানে লক্ষ করতে পারে সে ব্যাপারে কিছুমাত্র সচেতন না থাকায় সঙ্গিনী নিজের অঙ্গকে এমন এক একটি ভঙ্গিমায় নিয়ে যাচ্ছিল যে তার মনে হল প্রকৃতি এমন ছবি কখনও আঁকতে পারেনি।

সে ক্যানভাসটাকে টেনে আনল জানলার পাশে। দীর্ঘকাল পরে প্রথম আঁচড় কাটলো। কিছুক্ষণ পরে আবার যখন তাকাল তখন বিলের ধার শূন্য। মেয়েটি পোশাক পরে ফিরে এসেছে পাশের ঘরে। এখন ও খাবে। তারপর ঘুমাবে। আজকাল সঙ্গিনী দুপুরে ঘুমায়।

সারাদিন ধরে যন্ত্রণা। ছবিটা মনে এসেও আসছে না। বিকেলে সে যখন বারান্দায় তখন সঙ্গিনী চায়ের কাপ নিয়ে এল। চা দিয়ে চলে গেল না।

'একটা কথা বলব?'

'হ্যাঁ।'

'গন্ধটা বেড়ে যাচ্ছে। ওঁর শরীরের ঘা-গুলো কমছে না। পোকা হলেও হতে পারে।'

'ওষুধ লাগাচ্ছেন না?'

'কাজ হচ্ছে না তেমন! বিশল্যকরণী পাতার রস লাগিয়েছি আজ।'

'দেখুন।'

'গন্ধ বেশী বাড়লে আপনি তো এ ঘরে থাকতে পারবেন না।'

'আমার যে না থেকে উপায় নেই। ওঁকে যদ্দিন বাঁচিয়ে রাখা যায়—।'

'যেদিন মরে যাবেন?'

'সেদিন পথে নামবো। আমি খঞ্জনি বাজাতে জানি। আবার কোন গানের মানুষের সঙ্গিনী হয়ে যাব। এটাই নিয়ম।'

'আপনি আগে যার সঙ্গে ছিলেন তিনি কি মারা গিয়েছেন?'

'না। সে আমাকে বিক্রি করতে চেয়েছিল। ইনি তখন আশ্রয় দিলেন।' তারপর সে হাসল, 'আপনার মন এতদিনে ছবি আঁকতে চেয়েছে?'

'ও হ্যাঁ, ঠিক আসছে না।'

'অত বড় পেট এঁকেছেন, পৃথিবীটা খেয়ে নিতে পারে।'

সে চমকে তাকায়। ক্যানভাসে যে আঁচড় কেটেছে সে, তাতে পেট আঁকার কোন চিন্তা ছিল না। দ্রুত ঘরে ফিরে এল। ছায়া নেমেছে ঘরেও। কিন্তু এবার মনে হল, তাই তো, একটা পেটের আদল এসে গেছে। কোন নারীর পেট। গর্ভবতী জননীর।

'মাতৃগর্ভের কথা আপনার মনে আছে?'

'অ্যাঁ। না, না তো।'

'উনি কার যেন একটা গান গাইতেন, মন রে সেই দেশের কথা এখন ভুইলা গিয়াছ/ উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে সে দেশে বাস কইরেছ।' সঙ্গিনী চলে গেল পাশের ঘরে। সে আলো জ্বালালো। ক্যানভাসের সামনে দাঁড়ালো তৈরি হয়ে।

যখন সঙ্গিনীর ডাক কানে এল তখন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, 'খাবার খাবেন না?'

'এখন থাক, আপনি খেয়ে নিন।'

সঙ্গিনী জবাব না দিয়ে ফিরে গেল। তারপরেই খঞ্জনির আওয়াজ কানে এল। সেই সঙ্গে সঙ্গিনীর গলায় বাজছে, 'তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি যীশু, তুমি কৃষ্ণ।'

সেই খঞ্জনির সঙ্গে কণ্ঠের মিল তাকে আরও উদ্দীপ্ত করল।

যখন ভোর হল তখন কাঠামো তৈরি, এবার মাটি রঙ দেবার পালা। সে উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'শুনুন, এদিকে শুনুন।'

সঙ্গিনী আসতে সময় নিল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

'কেমন লাগছে? কি মনে হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছি, কিন্তু চিনতে পারছি না।'

'ঠিকই। একজন নারী দরকার। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, আপনাকে সামনে দেখে আঁকি।'

'আমাকে? কিন্তু এখন তো পারব না।'

'সে কি! এটুকু উপকার করতে পারবেন না?'

'আমি করলে সবটুকু করার কথা ভাবি, এটুকুতে মন ওঠে না। সেটা নিতে পারবেন?'

'আপনি দিলে, নেব না কেন?'

'তাহলে অপেক্ষা করতে হবে। মাঝরাতে ওঁর প্রাণবায়ু বৈকুণ্ঠে চলে গেছে। এখন ওঁর শরীরের সৎকারের প্রয়োজন। সেটা না হওয়া পর্যন্ত ওঁর পাশে থাকা আমার কর্তব্য।'

সে চমকে উঠল। বৃদ্ধ মারা গিয়েছে। দৌড়ে পাশের ঘরে গেল সে। তেমনি শুয়ে আছে বৃদ্ধ। হঠাৎই মনে হল এখন নিঃশব্দ শব্দরে খাবে।

'আপনি আমাকে ডাকেননি কেন?'

'আপনি সাধানায় ছিলেন। আর এসেই বা কি করতে পারতেন!'

ডাক্তার, গঞ্জের মানুষ, থানার দারোগা, সবাইকে জানিয়ে শেষ কাজ শেষ করতে দিন গড়িয়ে গেল। তারপর প্রশ্নটা উঠল সঙ্গিনী কোথায় যাবে? দশ ক্রোশ দূরে একটি গোপালের মন্দির আছে, সেখানে আশ্রয় পেতে পারে সে। তারপর যেখানে ইচ্ছে চলে যাক। ডাক্তারও এই কথায় সায় দিলেন। সামনের সপ্তাহে সেই মন্দির চত্বরে মেলা বসবে। অনেক বাউল আসবেন। তখন জলের মাছ জলে মিশে যেতে পারবে।

কথাটা তাকে বলা হল। সে তখন পড়ন্ত সূর্যের দিকে মুখ করে বসেছিল। প্রস্তাব শুনে সে মাথা নাড়ল। সোজা চলে এল ঘরের দরজায়, 'এখন আমার আর বাধা নেই। আপনি আমার ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন, আঁকতে পারেন।'

সে দূরে দাঁড়ানো মানুষজনের দিকে তাকাল। ওরা সবাই অবাক হয়ে শুনছে তাদের কথা। হঠাৎ ডাক্তার এগিয়ে এলেন, 'সাত দিন তো। এতদিন যখন এখানে নিরাপদে ছিল বাকি সাতদিনও থাকবে। তাছাড়া বাউলের স্মৃতি চারপাশে, এখানে থাকলে মন শান্ত হবে। চলুন আপনারা, রাত নামতে দেরি নেই।'

সবাই চলে গেল। যাওয়ার আগে কারও কারও চোখে যে চকচকে দৃষ্টি ফুটলো, তা তার বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

সে ফিরে এল ক্যানভাসের সামনে। পেছনে সঙ্গিনী।

সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করল, 'আমি খঞ্জনি বাজানো ছাড়া আর কিছু জানি না। আমাকে কি করতে হবে বলে দিন।'

'আজ আর আঁকার ইচ্ছে হচ্ছে না। বড্ড ক্লান্ত লাগছে।'

'তাহলে খাবার দিই?'

'দিন।'

খাবার খেয়ে সে দেখল সঙ্গিনী নিজের জন্যে কিছু নেয়নি। সে হেসে বলল, 'আপনার কি অশৌচ চলছে?'

'না তো! ও, খাইনি বলে মনে হল? আসলে এত দুর্গন্ধ ছিল শরীরটায়, মনে হচ্ছে সেটা আমার শরীরে ঢুকে গেছে। অত নির্মল মনের মানুষের শরীরে কেমন করে অমন দুর্গন্ধ হয়!' সঙ্গিনী ছবিটার সামনে চলে গেল, 'একটা কথা বলব?'

'বলুন।'

'আপনার ছবির যে মেয়ে তার মধ্যে এত কাম কেন?'

'কেন, মেয়েদের কাম নেই?'

'না। কোন মেয়ের মনের মূলে কাম থাকে না। পুরুষই তাদের মধ্যে কামনা জন্মিয়ে দেয়। আপনার এই মেয়ে যদি নিষ্পাপ সঙ্গীহীনা হয় তাহলে এর মধ্যে কামনা থাকবে না। এর গর্ভ স্ফীত, কিন্তু সেখানে সন্তান নেই। এই জন্যেই ও পৃথিবীর সব আনন্দকে শরীরে ধরেছে। তাই না?'

সে কিছুই বলতে পারল না। সঙ্গিনী হাসল, 'যতদিন মানুষটা বেঁচে ছিলেন ততদিন আমাকে আপনার প্রয়োজন ছিল, তাই না?'

'তা কেন?'

'তা হলে আজ নিতে পারছেন না কেন?'

সে উঠে দাঁড়াল। কাছে এগিয়ে বলল, 'কারণ আমি বাউল নই।'

'কিন্তু আপনি সাধক!'

'সাধক হবার সাহস আমার বুকে নেই। আমি নক্ষত্রের জল দেখতে পাই কিন্তু সাধনার সঙ্গিনীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে পারি না। চারপাশের বেড়াগুলো ডিঙিয়ে যেতে পারি না।'

'তাহলে আমি চলে যাব?'

'আমার কোন উত্তর নেই।'

ভোর হল। সে নমস্কার করল। তারপর খঞ্জনি বাজিয়ে গৌরাঙ্গের গান গাইতে গাইতে চলে গেল।

অসাড় হয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ আহত পশুর মতো সে দৃষ্টিটাকে ছিঁড়ে ফেলল টুকরো টুকরো করে। ঘর গোছালো। স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দরজায় তালা দিয়ে।

স্ত্রী অবাক। ছেলেমেয়েরাও। ছবি আঁকতে গিয়েছিল যে ফিরে এল শূন্য হাতে। টেবিলে গোছা গোছা চিঠি। একজিবিশনের তারিখ এগিয়ে আসছে। ছবি চাই, অনেক ছবি। যেগুলো টাঙিয়ে দিলেই বিক্রি হবে অনেক টাকায়। পালাবার কোনও পথ নেই। এখানে এই দামি ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে কোন সবুজ দেখা যায় না। তবে আকাশ দেখা যায়। কলকাতার নোংরা হয়ে থাকা আকাশ।

আশ্চর্য! ছবি বের হচ্ছে তার হাত থেকে। একটার পর একটা। একশ সন্তানের জননীর মুখে এক ফোঁটা কামনার চিহ্ন নেই। গান্ধারীরা আগুনের মতো পবিত্র হয়ে উঠছে তার হাতে। আর যা কিছু অন্ধকার তা জমা হচ্ছে পৃথিবীর ধৃতরাষ্ট্রদের চোখে।

ম্লা ন-অ ম্লা ন

নিরাপদ বসুকে এই কাহিনীর নায়ক বলা যাবে না। অথচ যা কিছু ঝামেলা ওকে নিয়েই। নিরাপদ অবশ্য ঝামেলা বলে স্বীকার করে না। সে যথেষ্ট ঝামেলা-এড়ানো ভদ্রলোক। ওর স্ত্রী হৈমন্তী যদিও এই স্বভাবটার জন্যে ওকে ব্যক্তিত্বহীন মানুষ বলে মনে করে। নিরাপদ এসব শুনতে দুঃখ পায়। কিন্তু ইদানীং স্ত্রীর কথাবার্তা সে উপেক্ষা করতে শিখে গিয়েছে। নিরাপদ একজন সরকারি চাকুরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া হিসেবে ফল ভাল করেছিল। চাকরিতে ফাঁকি দেয়নি। তাই পঞ্চাশ বছরেই ততটা ওপর তলায় ওঠা সম্ভব উঠেছে।

হৈমন্তী খুব গোছানো মেয়ে। স্বামীর যা আয় তাতেই সে সংসারটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছে। চাহিদা তো অনেক থাকে কিন্তু সেটা পাওয়া যাচ্ছে না বলে দিনরাত অশান্তি করে না। চল্লিশের এপাশে এসেও হৈমন্তী এখনও আকর্ষণীয়, যাকে বলে সুন্দরী, ঠিক তাই।

আর এখানেই তার যা কিছু কষ্ট। নিরাপদ পঞ্চাশেই কেমন বুড়ো বুড়ো হয়ে গিয়েছে। অফিস আর বাড়ি ছাড়া কিছুতেই উৎসাহ নেই। সুন্দরী স্ত্রী যে তাকে তেমন আকর্ষণ করে তা আর আজকাল বোঝা যায় না। হৈমন্তী-নিরাপদের মেয়ের নাম অদিতি। বয়স আঠারো-উনিশের মাঝামাঝি। লম্বা, দারুণ দেখতে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। পাড়ার ছেলেদের জ্বালায় হৈমন্তীর রাত্রে ঘুম নেই। টেলিফোন বাজলেই অদিতিকে কেউ না কেউ ডাকবে। লেটার বক্সে প্রেমপত্রের বন্যা বয়ে যায়।

ভরসা এই মেয়েটা এসব পাত্তা দেয় না। হৈমন্তীর রাগ, নিরাপদ একটুও চিন্তিত নয় মেয়ের ব্যাপারে। কখন কোন উটকো ছেলের সঙ্গে মজে গেলে সারাজীবন কপাল চাপড়াতে হবে। সারা সময় মেয়েকে সেকথা শোনায় হৈমন্তী।

এই নিরাপদকে অফিসের কাজে একবার দিল্লীতে যেতে হয়েছিল। দিল্লীতে হৈমন্তীর দিদি থাকেন। কোন অসুবিধে হয়নি। ফেরার সময় কলকাতার টিকিট পাওয়া গেল না। সেকেণ্ড ক্লাশ স্লিপারে সে বেশী স্বচ্ছন্দ।

ভায়রাভাই রাজধানীর চেয়ারকারের টিকিট ম্যানেজ করে দিল। বড়লোকী পরিবেশ একদম সহ্য হয় না নিরাপদর। এয়ার কণ্ডিশন্ড মানে সেই রকম ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল তার। কিন্তু সিটে বসে দেখল তার মত পোশাক ও চেহারার অনেক যাত্রী যাচ্ছে। সে সাইড ব্যাগ থেকে আগাথা ক্রিস্টির একটা বই বের করে চোখ রাখল হেলানো চেয়ারে মাথা রেখে। আগাথা ক্রিস্টি ওর খুব প্রিয় লেখিকা। গাড়ি চলল। ভেতর থেকে গতি বোঝার উপায় নেই,

ধুলো নেই। নিরাপদর ভাল লাগল। এই সময় বেয়ারা গোছের একটি লোক এসে সামনে দাঁড়িয়ে সেলাম করল। চমকে উঠে বসল নিরাপদ। তারপর লোকটিকে লক্ষ্য করে বুঝল সেলামটা তার পাশে বসা যাত্রীর জন্যে।

বেয়ারা খুব বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'সাব্, কফি চাহিয়ে?'

'কফি? হোলে মন্দ হয় না।'

'ঠিক হ্যায় সাব।' বেয়ারা চলে গেল।

নিরাপদ অবাক। কম্পার্টমেন্টের কাউকে এ প্রশ্ন করেনি বেয়ারা। এই লোকটি কি এমন তালেবর যে তাকেই খাতির করতে হবে! কিন্তু এ প্রশ্ন মনে এলেও মুখে কিছু বলল না নিরাপদ। সেটা তার স্বভাবে নেই। নিজেকেই বোঝাল, নিশ্চয়ই রেলের কোন বড় কর্মচারী। সে আড়চোখে তাকাল। বছর পঁয়ত্রিশেকহবে। রোগা, ফর্সা, চশমা পরা। একধরণের চেহারার বয়স চট করে অবশ্য আন্দাজ করা যায় না।

কফি এল। আরাম করে খেলো লোকটা পাশে বসে। কম্পার্টমেন্টের অনেকেই এই খাওয়াটা দেখছে। সবার চোখেই বিস্ময়।

পাশাপাশি বসেও কথা হচ্ছিল না। আগ বাড়িয়ে কথা বলার স্বাভাব নেই নিরাপদর। সে বই-এ দৃষ্টি রেখেছিল। বেয়ারাটা আবার এল কাপ প্লেট নিতে। জিজ্ঞাসা করলে, 'সাব, আপনি কি আলাদা কোন মেন্যু ডিনারে খাবেন?'

লোকটি বলল, 'না, না। যা সবাইকে দিচ্ছ তাই আমাকে দিও।'

নিরাপদ নিশ্চিত হল লোকটি রেলের অফিসার। তার অবশ্য রেলের অফিসারের সঙ্গে আলাপ রাখার প্রয়োজন নেই। কালেভদ্রে কলকাতা থেকে সে বের হয়।

'ওটা কি আগাথা ক্রিষ্টি?'

চমকে উঠল নিরাপদ। দ্রুত মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আমার খুব প্রিয় লেখক। কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিষ্টি থেকে আমাদের ফেলুদা, হাতে পেলে পৃথিবী ভুল যাই আমি।'

নিরাপদ হাসল। অথবা বলা যেতে পারে, হাসবার চেষ্টা করল।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিল্লীর লোক নন নিশ্চয়ই?'

'না, না, আমি কলকাতায় থাকি। কাজে এসেছিলাম। সরকারি কাজে।'

'প্রায়ই আসেন?'

'না। হঠাৎই আমাকে আসতে হল।'

'কোন ডিপার্টমেন্ট আপনার?'

নিরাপদ সেটা জানাল। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'যাক, খুব দুশ্চিন্তা ছিল, আমার পাশে যদি কোন উটকো লোক বসত তাহলে সারাটা রাত মুখ বন্ধ করে থাকতে হত। আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না!'

'আমি নিরাপদ বসু। আপনি?'

'অম্লান মিত্র।'

ভদ্রলোক কি করেন, রেলের অফিসার কিনা তা জানা গেল না। জিজ্ঞাসা করতেও সঙ্কোচ হচ্ছিল নিরাপদর। নিজের ওপর এই কারণেই তার ক্ষোভ হয়। হৈমন্তী রেগে যায় এই কারণে। ডিনার এল। ভদ্রলোক বেয়ারাকে বললেন, খাবার দেওয়ার আধঘণ্টা বাদে আবার যেন কফি দিয়ে যায়। এবার দুকাপ।

না, লোকটা খারাপ নয়। রাত্রে ঘুমোবার আগে অনেক কথা হল। সকালেও। নিরাপদর অফিস এবং বাড়ির ফোন নম্বর নিলেন ভদ্রলোক। নিজের ফোন নম্বর দিলেন না। বললেন, 'টালিগঞ্জের নাম্বার শুনছি পাল্টে যাবে। গিয়ে দেখব হয়তো এরই মধ্যে পাল্টে গিয়েছে। আপনাকে পরে জানিয়ে দেব।'

এই লোকটির কথা বাড়িতে ফিরে হৈমন্তীকে বলেনি নিরাপদ। বললেই হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করত, 'একটা লোককে সব জানিয়ে দিলে অথচ সে কি করে কোথায় থাকে তা জানলে না?' খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু নিরাপদ বোঝাতে পারবে না যে তার মনে হয়েছিল লোকটি নিজের সম্পর্কে বেশী কথা বলতে চায় না। তাই জিজ্ঞাসা করতে তার ভদ্রতায় লেগেছিল। তাছাড়া একজনের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছে এবং সেখানেই শেষ, তাই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা করে কি হবে। হৈমন্তীকে একথা বলা মানে ঝামেলা পাকানো। হৈমন্তীকে খুশী করার জন্যে ও রোজ সকালে বাজারে যায়, গ্যাস বুক করে, তাগাদা দেয়, রেশনের দোকানে যায়, শুধু কেরোসিনের লাইন দেয় না। সেটা হৈমন্তীই নিষেধ করেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বস্তির লোকেদের সঙ্গে স্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে চায় না সে। কিন্তু ইলেক্‌ট্রিক বা টেলিফোনের বিলটা ওর পকেটে গুঁজে দেয়। ডাবল সিলিণ্ডার থাকায় গ্যাস ফুরাবার আগেই দ্বিতীয় সিলিণ্ডার পাওয়া যায়। হৈমন্তীর সমস্যা থাকে না। এবার দিল্লী থেকে এসে শুনল যে কোন মুহূর্তে আগের গ্যাস শেষ হয়ে যাবে কিন্তু দোকানে বলা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সিলিণ্ডার পাওয়া যাচ্ছে না! বলছে সাপ্লাই নাই। পাড়ার দোকানে গ্যাস সাপ্লাই না থাকলে নিরাপদ কি করতে পারে? হৈমন্তী অবশ্য কাজের মেয়েকে দিয়ে অনেকটা কেরাসিন তুলিয়ে রেখেছে।

একদিন অফিস থেকে ফিরে নিরাপদ দেখল লোডশেডিং। মেজাজ খারাপ হয় না আজকাল। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রথম প্রথম ফোন করত অদিতির তাড়নায়। শুনত কেবল ফল্ট। আজকাল করে না। মোমবাতি জ্বলে, গরমে পচতে হয়। আজ টেলিফোন বাজল।

হৈমন্তী কথা বলে জানাল অম্লান মিত্র নামে একজন তাকে ডাকছে।

নিরাপদ ফোন ধরল। অম্লানের গলা পাওয়া গেল, 'কি মশাই, চিনতে পারছেন? আমি অম্লান। রাজধানীতে আলাপ হয়েছিল।'

নিরাপদ শুকনো হাসল, 'হেঁ হেঁ। কেমন আছেন।'

'ফার্স্টক্লাশ। আপনাদের পাড়ায় এসেছিলাম। ভাবলাম যোগাযোগ করি। কি করছেন?'

'কিছু না।'

'তাহলে আপনাদের ওখানে ঢুঁ মেরে আসি। ঠিক কোথায় যেন বাড়িটা?'

নিরাপদ মোটামুটি বুঝিয়ে দিল।

টেলিফোন রেখে সে কিন্তু কিন্তু করে হৈমন্তীকে বলল, 'অম্লানবাবুর সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। খুব বড় অফিসার।'

'কোথাকার।'

'রেলের বোধহয়।'

'বোধহয় মানে? উনি বলেন নি?'

নিরাপদ অস্বস্তিতে পড়ল, 'সেই রকম মনে হল।'

'আশ্চর্য! একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল, টেলিফোন নাম্বার দিলে অথচ সে কোথায় কাজ করে জানলে না! কি করে সরকারি চাকরি কর? কি বললেন?'

'এ পাড়ায় এসেছিলেন। তাই ঘুরে যেতে পারেন।'

'এই অন্ধকারে? নিষেধ করলে না?'

'কেউ যদি আসতে চায় নিজে থেকে তো মানা করব কি করে?'

'আমি লোডশেডিং-এর মধ্যে চা-ফা খাওয়াতে পারব না।'

মিনিট দশেক বাদে অম্লান এল। এসেই বলল, 'একি দাদা। অন্ধকারে বসে আছেন?'

নিরাপদ বলল, 'কি করব, উপায় তো নেই।'

'উপায় নেই হয় নাকি? আপনার টেলিফোন কোথায়?'

নিরাপদ অবাক হলেও টেলিফোন দেখিয়ে দিল। মোমবাতির আলোয় ডায়াল ঘোরাল অম্লান। নিরাপদ শুনল অম্লান বলছে, 'হেলো, চিফ ইঞ্জিনিয়ার আছেন?'

'ও, অম্লান বলছি। আমি এখন তিনশো-বাইশ সার্কুলার রোডে আছি। এখানকার ফেজটা অন করে দিতে বলুন। ধন্যবাদ।'

রিসিভার রেখে দিয়ে অম্লান বলল, 'এই গরমে কোন ভদ্রলোক থাকতে পারে?'

নিরাপদ অবাক। সে একেবারেই হতভম্ব হয়ে গেল যখন এর মিনিটখানেক বাদেই আলো এসে গেল। চারপাশে উল্লাস শোনা গেল। ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে হৈমন্তী সমস্ত ব্যাপারটা শুনল! আলো জ্বলতে সেও অবাক। নিরাপদ না জিজ্ঞাসা করে পারল না, 'ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাইতে আপনার চেনাজানা আছে বুঝি?'

'ওই একটু আধটু।' অম্লান বসল। এই সময় অদিতি ছুটে এসে জানাল একমাত্র তাদের বাড়ি এবং রাস্তায় এপাশের কয়েকটিতে আলো এসেছে। উল্টো দিকটায় এখনও লোডশেডিং। অম্লান অদিতিকে দেখছিল। হেসে বলল, 'যাতে তোমাদের এই বাড়িতে কখনও লোডশেডিং না হয় সেই ব্যবস্থা করবো?'

'আপনি পারবেন? অসম্ভব।'

'দেখি।' রহস্যের হাসি হাসল অম্লান।

নিরাপদ স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে অম্লানের আলাপ করিয়ে দিল। অম্লান খুবই ভদ্রভাবে কথা বলল। অদিতি টিভি খুলেছিল। ছবি এখনও কাঁপছে। দুবছরের টিভি, মিস্ত্রি দেখিয়ে ঠিক হচ্ছে না। অম্লান বলল, 'এই টিভি দেখবেন না দাদা। চোখ খারাপ হয়ে যাবে।'

হৈমন্তী বলল, 'কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। গ্যারান্টি পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ার পর কয়েকবার মিস্ত্রি দেখালাম। যখন করে দিয়ে যায় তখন ঠিক থাকে তারপর থেকে সেই। আর একটা যে কালার টিভি কিনব তা তো উপায় নেই। যা দাম।'

'আহা কিনবেন কেন বউদি। দুবছর তো বেশীদিন নয়। কোম্পানিকে লিখছেন না কেন? ঠিক আছে, টিভি কেনার রসিদটা আছে?' অম্লান জিজ্ঞাসা করল।

রসিদ পাওয়া গেল। সে সেটা পকেটে রেখে বলল, 'এটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। দেখি কি করা যায়।

অনেকক্ষণ গল্প করে চা খেয়ে চলে গেল সে। এর মধ্যে হৈমন্তী জানতে পেরেছে বিয়ে থা করার সুযোগ হয়নি এখনও ওর। টালিগঞ্জে বাড়ি। বাড়িতে মা আছে। সরকারি চাকরি করে। কিন্তু কোন ডিপার্টমেন্ট তা বের করতে পারে নি হৈমন্তী। অম্লান বলেছে, 'বউদি মাপ করবেন, এটা বলতে অসুবিধে আছে।'

তাজ্জব ব্যাপার। সেদিনের পর আর লোডশেডিং হচ্ছে না এ বাড়িতে। প্রতিবেশীরা এতে অবাক। ঈর্ষান্বিত অনেকেই! হৈমন্তী বলল, 'সত্যি ভদ্রলোক খুব ইফ্লুয়েন্সিয়াল।'

হৈমন্তীর ভাই এসেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন করে। বলল, 'সত্যি দিদি, এই কারণে তোমরা এত সহজে টুপি পরো।'

হৈমন্তী চটে গেল, 'আজে বাজে কথা বলিস না।'

ভাই বোঝাল, 'ধরো, আমার সঙ্গে খুব জানপয়চান আছে ইলেকট্রিসিটির ইঞ্জিনিয়ারের। এপাড়ায় এসে জানলাম তোমার বাড়িতে লোডশেডিং। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে তাকে অনুরোধটা করলাম। তারপর তোমার বাড়িতে এসে যেন প্রথম লোডশেডিং দেখছি এমন অভিনয় করে লোকটাকে দ্বিতীয়বার ফোন করলাম। ব্যাস, আলো এসে গেল। আর তুমি ভাবলে, বাপস, লোকটার কি ক্ষমতা।

হৈমন্তী এতটা বোঝেনি। এবার বুঝে বলল, 'যাক বাবা, আমাদের তো আর লোডশেডিং হচ্ছে না, সেইটেই উপকার।'

কিন্তু দিন তিনেক বাদে টিভি কোম্পানী থেকে টেলিফোন এল। তাঁরা পুরোন টিভি ফিরিয়ে নিয়ে নতুন সেট দিয়ে দিতে চান। আজ বিকেলে তাঁদের লোক সেটা পৌঁছে দেবে। হৈমন্তী হতভম্ব। গ্যারান্টি কার্ডে এক বছর সময়সীমা ছিল। তবু এটা সম্ভব হল কি করে? সে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল নিরাপদকে। নিরাপদ ছুটে এল বাড়িতে। কোম্পানির লোক বিকেলবেলায় এসে পুরোন সেট নিয়ে গেল নতুন সেট বসিয়ে। তারা জানাল ওপর-তলার

হুকুমে কাজটা করা হচ্ছে। নতুন সেট অনেক বেশী আধুনিক এবং দামের তফাৎ তিন হাজার টাকা।

হৈমন্তী বলল, 'নাঃ, ক্ষমতা আছে বটে অম্লানের। তবে গায়ে পড়ে এত উপকার করেছে, এটা আমার ভাল লাগছে না।'

নিরাপদ বলল, 'তুমি বড্ড সন্দেহবাতিক।'

'হয়তো। কিন্তু আমার মন সায় দিচ্ছে না।'

তাহলেও আত্মীয়স্বজনরা ব্যাপারটা জানল। অনেকেই অম্লানের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। হৈমন্তী ঠেকিয়ে রাখে। দিন দশেক বাদে ছুটির দশ মিনিট আগে নিরাপদ দেখল তার সামনে অম্লান, 'এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম দাদাকে নিশ্চয়ই অফিসে পেয়ে যাব।'

নিরাপদ টিভিটার জন্যে তাকে অনেক ধন্যবাদ দিল।

অম্লান বলল, 'এ কিছু নয়। আসলে আমরা অনেকেই নিয়ম জানি না। কোন কোম্পানি চাইবে না বিক্রির দুই বছরের মধ্যে তাদের জিনিষ খারাপ এটা বাজারে চালু হোক। নিজেদের মান বাঁচাতে ওরা পাল্টে দেবে।'

নিরাপদ অম্লানের সঙ্গে বের হল। সামনের গাড়িতে তাকে নিয়ে উঠল অম্লান। গাড়ির ওপর লাল আলো। ড্রাইভার নেই। অম্লানই চালাল। ডালহৌসী এলাকায় অত স্পীডে গাড়ি চালাতে কাউকে দ্যাখেনি নিরাপদ। মাথার ওপর লাল আলো থাকায় মোড় পার হবার সময় সেপাইরা সেলাম ঠুকছে।

নিরাপদ বাকশক্তি রহিত। নিরাপদ কোনমতে অনুরোধ করল আস্তে চালাতে। অম্লান হাসল, 'আস্তে চালাতে কোন মজা নেই দাদা।'

'কিন্তু আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।' আর্তনাদ করল নিরাপদ।

গাড়ির গতি কমাল অম্লান। নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার গাড়িতে লাল আলো কেন হে? শুনেছি মন্ত্রীমশাই, জাজ ছাড়া লাল আলো কোন সাধারণ নাগরিক জ্বালাতে পারে না।'

অম্লান গম্ভীর হল, 'তাহলে আমাকে অসাধারণ নাগরিক মনে করুন।'

বাড়িতে পৌছে দিল অম্লান। নিরাপদ তাকে নেমতন্ন করলে চা খেয়ে যেতে। ওপরে এল ওরা। অদিতি দরজা খুলল। অম্লান তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ? লোডশেডিং-এর কষ্টটা নেই তো?'

অদিতি হাসল, 'না নেই। থ্যাঙ্কস।' সে ভেতরে চলে গেল।

নিরাপদ দেখল ওর চলে যাওয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে অম্লান। সেই সময় হৈমন্তী ভেতর থেকে আসছিল। অম্লানের বিহ্বল দৃষ্টি দেখে সেও লজ্জা পেল। জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

সম্বিত এল যেন, অম্লান বলল, 'কিছু না। কেমন আছেন?'

'ভাল।' হৈমন্তী স্বামীর দিকে তাকাল, 'সর্বনাশটা হল।'

'কি ব্যাপার?' নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল।

'গ্যাস ফুরিয়ে গিয়েছে। দোকানে গিয়েছিলাম। বলল, দিন দশেক লাগবে।'

হৈমন্তী চিন্তিত, 'আগামী পরশু মেয়ের জন্মদিন। সবাইকে আসতে বলেছি, কি হবে।'

অম্লান জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের ডাবল সিলিণ্ডার নেই?'

নিরাপদ জবাব দিল, 'ডাবল সিলিণ্ডারেই এই দশা।

অম্লান মাথা নাড়ল, 'এটা কোন প্রব্লেমই নয়।'

হৈমন্তী রেগে গেল, 'প্রব্লেম নয় মানে? কেরোসিন পাওয়া যায় বাজারে?'

'যায়। দাম বেশী দিতে হয়। কিন্তু বউদি, চিন্তা করবেন না, আপুনি গ্যাসই পাবেন। কাল সকালে আপনাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেব।'

অম্লানের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল নিরাপদর। যে ইলেক্‌ট্রিক এনে দিতে পারে, টিভি সেট পাল্টাতে পারে সে হয়তো গ্যাসও পারবে। একটু বাদে নিরাপদর শ্যালক অবিনাশ এল। তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল অম্লানের। অবিনাশ ট্রেড ইউনিয়ন করা মানুষ। সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'আপিন কি চাকরি করেন মশাই।'

অম্লান হাসল, 'আমি যে চাকরি করি সেটা সাধারণকে বলা যাবে না।'

'কেন?'

'নিষেধ আছে।'

'আপনার বাড়ির ঠিকানা?'

'টালিগঞ্জে থাকি, এটুকু জানলেই চলে না?'

'না, চলে না। আপনি কেমন লোক মশাই? হুট করে ট্রেনের আলাপ সম্বল করে ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছেন অথচ নিজের পরিচয় কাউকে জানাচ্ছেন না? এটা কোন ভদ্রতা?'

নিরাপদ শালাকে সামলালো, 'আহা, নিশ্চয়ই ওঁর অসুবিধা আছে।'

'অসুবিধে না ধান্দাবাজি। আপনাকে ফাঁসাবে এই লোকটা।'

অম্লান হাসল, 'আপনি আমাকে অপমান করছেন। এখানে এখন আপনি আমাকে যা ইচ্ছে করতে পারেন, গায়ের জোরে আমি পারব না। কিন্তু এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আপনাকে কোন কারণ না দেখিয়ে কয়েকমাস জেলের ভাত খাওয়াতে পারি। আচ্ছা বউদি, বলুন তো, আমি কি আপনার কোন ক্ষতি করেছি?'

'তা নয়।' আমতা আমতা করল হৈমন্তী।

'আপনার খুব ক্ষমতা, না?' অবিনাশ তেজী গলায় বলল।

'খুব না, সামান্য।'

'আমি একটা ফ্ল্যাট বুক করেছিলাম গড়িয়ায়। নাইনটি পার্শেন্ট টাকা জমা দেওয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রমোটার এখন এক্সট্রা এক লাখ চাইছে। এটা সমস্ত রীতিনীতি ভদ্রতার বাইরে। প্রমোটার এখন বেশী দাম পাচ্ছেন বাইরে থেকে। বলছেন হয় আমাকে এক্সট্রা টাকাটা দিতে

হবে নয় উনি আমার জমা দেওয়া টাকা ফেরত দিয়ে দেবেন। কেস করে কোন লাভ হবে না। কারণ সবাই জানে প্রমোটার ফ্ল্যাট একেবারে সাদা টাকায় বিক্রি করে না। কিছু উপায় হতে পারে?'

অম্লান নিরাপদর দিকে তাকাল, 'দাদা, আপনি কি চান কিছু হোক?'

নিরাপদ নিজের মাথায় হাত বোলালো, 'হওয়া খুব শক্ত। এক, পাড়ার ছেলেরা যদি লোকটাকে চাপ দেয় তাহলে—।'

অবিনাশ মাথা নাড়ল, 'সেটা আর সম্ভব নয়। লোকটা ওদের হাত করে ফেলেছে।'

অম্লান আবার হৈমন্তীকে জিজ্ঞাসা করল, 'বউদি আপনি কি চান?'

হৈমন্তী একটু গদ্গদ গলায় বলল, 'দেখুন না, চেষ্টা করে।'

অম্লান অবিনাশের কাছে ঠিকানা, প্রমোটারের নাম ধাম চাইল। তারপর আগামীকাল কিছু করা যাবে বলে চলে গেল। অদিতি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখল লাল আলো লাগানো গাড়িতে ওঠার আগে অম্লান ওপর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল।

পরদিন দুপুরে অফিসে অবিনাশের ফোন পেল নিরাপদ। সে খুব উত্তেজিত হয়ে বলল তাকে থানা থেকে ডেকে পাঠিয়েছে আজ বিকেল পাঁচটায় ফ্ল্যাট নিয়ে কথা বলার জন্যে। প্রমোটার বোধহয় থানাকেও ম্যানেজ করছে। জামাইবাবু যদি সঙ্গে আসেন তাহলে সে সাহস পায়। নিরাপদ স্ত্রীর ভাই-এর দুর্দিনে সঙ্গী হল।

দারোগার সামনে বসেছিলেন প্রমোটার এবং এক ভদ্রলোক। অবিনাশ নিজের পরিচয় দেওয়া মাত্র দারোগা তাকে বসতে বললেন। প্রাথমিক আলোচনায় পর প্রমোটার যখন জিনিসপত্রের বাজারদর বেড়ে যাওয়ার গল্প শোনাচ্ছে তখন দারোগা স্পষ্ট বলে দিলেন, 'মাসখানেকের মধ্যে যদি আপনি অবিনাশবাবুর হাতে ফ্ল্যাটের চাবি না তুলে দেন তাহলে ভীষণ বিপদে পড়বেন। আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবেন না।'

প্রমোটার ভদ্রলোক প্রতিবাদ করতে চাইলেন কিন্তু দারোগা কোন কথা শুনতে চাইলেন না। এবার প্রমোটার প্রস্তাব দিলেন একটু আলাদা করে তার সঙ্গে বসে কথা শুনতে। দারোগা সেটাকেও নাকচ করলেন। এবার প্রমোটারের সঙ্গী ভদ্রলোক কথা বললেন বেশ গম্ভীর গলায়। দারোগা শুনলেন। হেসে বললেন, 'অজিতবাবু, পলিটিক্যাল প্রেসার দিয়ে কোন লাভ হবে না। অর্ডারটা এসেছে এত ওপরতলা থেকে, যেখানে আপনারাও পৌঁছাতে পারবেন না।' এর পরে প্রমোটার দারোগাকে লিখিতভাবে জানালো যে তিনি এক মাসের মধ্যে ফ্ল্যাটের চাবি অবিনাশকে দিয়ে দেবেন।

নিরাপদ তো বটেই অবিনাশেরও মাথা খারাপ হয়ে গেল। এ সবই অম্লানের জন্যে হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হল না। লোডশেডিং দূর করা বা টিভি সেট পাল্টানো খুব দারুণ ব্যাপার নয় কিন্তু ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়া?

নিরাপদ বাড়িতে ফিরে শুনল হৈমন্তী বেরিয়ে গিয়েছে।

অদিতি বলল, দুপুরে অম্লানকাকু ফোন করেছিল। ভবানীপুরের এক গ্যাস ডিলারের কাছে গিয়ে নিরাপদর নাম বললেই নাকি সিলিণ্ডার পাওয়া যাবে। নিরাপদ হতভম্ব। সেই দোকানে তাদের নাম লিস্টে নেই।

বললেই দেওয়া যায় নাকি? কিন্তু হৈমন্তী ফিরে এল একটি কুলিগোছের লোকের সঙ্গে যার হাতে সিলিণ্ডার। পুরোনটা নিয়ে নতুনটা দিয়ে সে চলে যাওয়া মাত্র হৈমন্তী যেন সাতমুখে কথা বলে উঠল, 'তুমি জানো অম্লান কে?'

'কে?' ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞাসা করল নিরাপদ।

'ডেপুটি গভর্ণর অফ ওয়েস্টবেঙ্গল। ভাবতে পারো?'

'যাঃ।'

'হ্যাঁ গো। আমি সেই ডিলারের কাছে গিয়েছিলাম। তোমার নাম শুনে উনি একটি চিরকূট বের করলেন। ওপরে ওপরতলার এক সাহেব লিখেছেন যে পশ্চিবঙ্গের ডেপুটি গভর্ণরের ইচ্ছা অনুযায়ী তোমাকে যেন একটা গ্যাসের সিলিণ্ডার এখনই দিয়ে দেওয়া হয়।' হৈমন্তী বসে পড়ল।

'ডেপুটি গভর্ণর? এরকম পোস্ট তো পশ্চিমবাংলায় আছে বলে শুনিনি।'

'আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।'

নিরাপদ বিড় বিড় করল, 'একবার অজয়বাবুর আমলে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার পোস্ট তৈরী হয়েচিল, ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট মাঝে মাঝে হয় কিন্তু ডেপুটি গভর্ণর?' সে উঠে টেলিফোন গাইড দেখে রাজভবনে ফোন করল। রাজভবন জানাল অম্লান মিত্র নামে কাউকে তারা চেনে না। নিরাপদ পরিচিতজনদের ফোন করল। সবাই হাসাহাসি করল ডেপুটি গভর্ণর নামে কোন পোস্ট আছে শুনে। অথচ হৈমন্তী জোর দিয়ে বলছে সে ওই শব্দ দুটো কাগজে দেখেছে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় জনাদশেক আত্মীয়স্বজন এল এ-বাড়িতে অদিতির জন্মদিন উপলক্ষ্যে। হৈচৈ হচ্ছে। অবিনাশের ছোটভাই বিকাশ থাকে বিরাটিতে। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে রাত করতে চাইল না। সে যখন আটটা নাগাদ বের হচ্ছে তখন অম্লান এল লাল আলো জ্বালানো গাড়ি চালিয়ে। এসে বলল, 'দাদা, অদিতির জন্মদিনে আমাকেই বাদ দিলেন? তবু অযাচিতের মত এসে পড়লাম।'

অবিনাশ তাকে দেখে খুব খুশী। হৈমন্তীও। সে বলল, 'আপনার ঠিকানা জানা ছিল না বলে নেমন্তন্ন করতে পারিনি। খুব খুশী হয়েছি এসেছেন বলে।' তার সঙ্গে বিকাশেরও আলাপ করিয়ে দেওয়া হল।

বিকাশ চলে যাচ্ছে শুনে ব্যস্ত হল অম্লান, 'সেকি, এখন তো সবে সন্ধ্যে, এখনই চলে যাচ্ছেন কেন?'

বিকাশ বলল, 'ফ্ল্যাটে তালাচাবি দিয়ে এসেছি। খুব চুরি হচ্ছে এখন ওপাড়ায়। তাই বেশী রাত করতে চাই না।'

'এটা কোন প্রব্লেম নয়। ঠিকানাটা বলুন।'

ঠিকানা শুনে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিচু গলায় কিছু বলে এসে অম্লান হাসল, 'নিন, আড্ডা মারুন। দশটা নাগাদ উঠবেন।'

'কিন্তু—।' বিকাশ আপত্তি করতে যাচ্ছিল।

অবিনাশ বলল, 'আর কিন্তু করিস না। অম্লানবাবু যখন বলছেন তখন মন ঠিক করে আড্ডা মার! কোন ভয় নেই।'

হঠাৎ অম্লান নিরাপদকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, আপনার জমি কেনা আছে?

'জমি? না। ওসব আর হয়ে উঠল না।'

হেমন্তী বলে উঠল, 'একদম বিষয়ী মানুষ নয়। এই ভাড়ার ফ্ল্যাটেই সারাজীবন পচতে হবে।'

অম্লান হাসল, 'তা কেন? আপনি সল্টলেকে পাঁচ কাঠা জমি নিন, স্টেডিয়ামের ঠিক পেছনে। খুব ভাল জায়গা। নেবেন?'

নিরাপদ কিছু বলার আগে অবিনাশ চেঁচিয়ে উঠল, 'সল্টলেকে? ওরে ব্বাস। ওখানে এখন তিনলাখ করে কাঠা।'

নিরাপদ বলল, 'আমাকে বিক্রী করলেও পাওয়া যাবে না।'

অম্লান হাসল, 'তিন লাখ তো ব্ল্যাক। বারো হাজার করে কাঠা পাবেন। নিয়ে নিন দাদা। ষাট হাজার দিয়ে জমিটা কিনে ফেলুন। ওটাই আইনসম্মত দাম। পরে বাড়ি করতে ইচ্ছে না হলে না হয় বিক্রী করে দেবেন।'

অবিনাশ উল্লাসিত, 'নিয়ে নিন জামাইবাবু। বাড়ি না করলে চৌদ্দ লাখ চল্লিশ হাজার এখনই প্রফিট। এত লাভ ভাবা যায় না। জমি এখন সোনা।'

অম্লান বলল, 'ভেবে দেখুন। যদি চান তাহলে একটা চেষ্টা হতে পারে।'

নিরাপদ বলল, 'ভেবে দেখি।'

হঠাৎ অম্লানের যেন মনে পড়ল এমন ভঙ্গীতে সে উঠে অদিতির সামনে এগিয়ে গেল। পকেটে থেকে ছোট প্যাকেট বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, 'হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ।' অদিতি বলল, 'থ্যাঙ্কু।'

বিকাশরা চলে গেল নটা নাগাদ। দেখে বোঝা যাচ্ছিল স্বস্তিতে নেই। নিরাপদই যেতে বলল তাকে। খাওয়া দাওয়া হৈচৈ করতে করতে এদের দশটা বেজে গেল।

এক ফাঁকে অম্লান নিরাপদকে বলল, 'দাদা, আপনারা সবাই ভাবছেন আমি কে অথচ আমি সেটা জানাতে পারছি না। খুব খারাপ লাগে। এবার আমার সঙ্গে আপনাদের দেখা আর ঘনঘন হবে না।'

'সেকি, কেন?' নিরাপদ অবাক।

'আমাকে মাদ্রাজে বদলি করা হয়েছে। এখনও কিছু দেরি আছে যাওয়ার।'

মন খারাপ হয়ে গেল নিরাপদর। লোকটার পরিচয় অস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ওর ব্যবহার তার খুব ভাল লাগে। তাছাড়া অযাচিত উপকারগুলোর কথা ধরলে---! সে বলল, 'আমরা আপনার কাছে শুধু উপকার নিয়ে গেলাম, বদলে কিছুই করলাম না।'

'ছি ছি। আপনি একথা বলেছেন কেন? আমি যা যা করেছি ভালবেসে করেছি। সবাইকে কি খুশী করা যায়? আমার মাকেই খুশী করতে পারলাম না।'

'কেন?'

'মা চান আমি বিয়ে করি, সংসারী হই।'

'এতে অসুবিধে কোথায়?'

'মেয়ে কোথায়? তেমন মেয়ে না পেলে বিয়ে করে কি লাভ?'

'কি রকম মেয়ে আপনার পছন্দ?' সরল গলায় জানতে চাইল নিরাপদ।

এইসময় হৈমন্তী পাশে এসে দাঁড়াল। তার কানেও গেছে শেষ প্রশ্নটা। অম্লান হাসল, 'বউদি যদি রাগ না করেন তাহলে বলতে পারি।'

হৈমন্তী হাসল, 'বাঃ, রাগ করব কেন?'

'তাহলে বলি, ঠিক আপনার মত মেয়ে পেলে বিয়ে করতে পারি।'

হৈমন্তী লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করল। নিরাপদ হেসে উঠল। আর তখনই টেলিফোন বাজল। নিরাপদ এগিয়ে গেল সেটা ধরতে। হৈমন্তী বলল, 'আপনি খুব ফাজিল।'

'সত্যি কথা বলেছি বউদি।'

'আমার মত মেয়ের কি অভাব বাংলাদেশে?'

'খুঁজে দিন। আপনাকেই দায়িত্ব দিলাম।'

এইসময় অদিতি এসে দাঁড়াল পাশে, 'মা, দ্যাখো!'

হৈমন্তী দেখল। একটি দামী হাতঘড়ি। সে বলল, 'একি, এত দামী জিনিস কেন আনলেন?'

'অপরাধ হয়ে গেছে?'

হৈমন্তী জবাব দিতে পারল না। হঠাৎ তার মনে সন্দেহটা এল। অম্লান কি অদিতির জন্যে এসব করছে? তার মতই তো দেখতে অদিতি। প্রথমদিন যেভাবে তাকিয়েছিল মেয়ের দিকে, গাড়িতে ওঠার আগে হাত নাড়া, দামী ঘড়ি উপযাজক হয়ে এসে উপহার দেওয়া—এসব কি তারই ইঙ্গিত? অসম্ভব। এই দুজনের বয়সের পার্থক্য অন্তত আঠারো বছরের। ডাবল বয়সী লোকের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পারে না হৈমন্তী। আর অদিতি কিছুতেই রাজী হবে না তাতে। ওর বন্ধুর দাদারাই পাত্তা পাচ্ছে না।

নিরাপদ ফিরে এল টেলিফোন রেখে, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'কেন?' হাসল অম্লান।

'বিকাশ ফোন করেছিল। ও ট্যাক্সি থেকে নেমে দ্যাখে একটা পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে ওদের ফ্ল্যাটের সমানে। ওর পরিচয় পেয়ে তারা জানায় যে অর্ডার পেয়ে এসেছিল ফ্ল্যাট পাহারা দিতে। কোন বিপদ হয়নি। বিকাশ এসে যাওয়ায় ওরা চলে গেছে। বিকাশ আপনাকে ধন্যবাদ দিতে বলেছে।'

অবিনাশ ছিল্। সে বলল, 'অম্লানবাবু, আপনি কে মশাই? আরব্যরজনীর আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের গল্প শুনেছি, এ যে তার মত ব্যাপার।'

অম্লান হাসল, 'প্রদীপের দৈত্য কিনা জানি না তবে এসব করলে দেখেছি একসময় যাদের জন্য করছি তাদের কাছে ভীতিকর দৈত্য হয়ে যাই।' তারপর ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এত পারেন আর এটুকু পারেন না?'

অম্লান হাসল, 'এখানে আমার সঙ্গে প্রদীপের দৈত্যের মিল আছে। পার্থিব জিনিষ আমরা এনে দিতে পারি। কিন্তু দয়ামায়া ভালবাসা পারি না। আপনি তা পারেন।'

'অসম্ভব। আপনার কথা আমি যেটুকু বুঝেছি তাতে কিছুতেই মত দিতে পারছি না।'

'জানতাম।' অম্লান মাথা নাড়ল। তারপর নিরাপদকে বলল, 'চলি দাদা।'

রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে হৈমন্তী তার সন্দেহের কথাটা নিরাপদকে জানাল। নিরাপদ চমকে উঠল। অসম্ভব। অদিতি ওর হাঁটুর বয়সী। হৈমন্তী বলল, 'লোকটা এই মতলবে এসেছিল।'

নিরাপদ অবশ্য একমত হল না। ট্রেনে অদিতির কথা ও জানত না।

দুদিন পরে লোডশেডিং হলে, গ্যাস ফুরিয়ে গেলে, জমি কেনার কথা মনে হলে হৈমন্তী নিরাপদর খুব কষ্ট হত। তাদের মনে হত অদিতিকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। এখন সেটা করে কোন লাভ নেই। অম্লান সম্ভবত মাদ্রাজে চলে গিয়েছে। হয়তো সেখানে কোন দাদা বউদি পেয়ে উপকার করছে। হৈমন্তী সেটা ভেবে ঈর্ষান্বিত হয়।

মৃত্যুদণ্ড চাই

কাল রাত্রেই সর্দি হয়েছিল, সেই সঙ্গে জ্বরো ভাব। মা তখনই একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়েছেন। সকালে বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। বাবা এবং মা আর তামা এ-সময় যন্ত্রের মতো দ্রুত তৈরি হয়। বাবা এবং মায়ের অফিস, আর তামার স্কুল। বাড়িতে তিনটে টয়লেট আছে। অসুবিধে হয় না। আজ ঘুম ভাঙামাত্র মা বলেছিলেন, 'নাঃ, জ্বর নেই। তবে আজ স্কুলে যেও না। আমি ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ রেডি করে রেখে যাচ্ছি। ঠিক সময়ে খেয়ে নিও। মাঝে মাঝে ফোন করব।'

ওঁরা দু'জন একটা গাড়ি নিয়ে স্টেশন পর্যন্ত যান। সেখানে পার্কিং-এ গাড়ি রেখে টিউব ধরেন। বাবার দুটো স্টেশন আগে মা নেমে যান। দু'জনের আলাদা এলাকায় অফিস। ফেরার সময় মা আগে আসেন। বাড়িতে গাড়ি নিয়ে এসে আবার ঘণ্টা-দুয়েক বাদে ফিরে যান বাবাকে টিউব সেটশন থেকে তুলে আনতে। ঠিক আটটায় তামার স্কুল-বাস আসে দরজায়। সে যখন যায় এবং স্কুল থেকে ফেরে, তখন বাড়িটা তালাবন্ধ থাকে।

তামার বয়স পনেরো। গায়ের রং উজ্জ্বল, মুখ-চোখ ভাল। সে মুখ ধুয়ে কিচেনে এল। মাইক্রোওভেনের দিকে তাকাল। এখন কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। তবু একটা গরম পানীয় বানিয়ে নিল। ওদের এই কিচেনে হরেকরকম খাবার সব সময় মজুত থাকে। ইণ্ডিয়ায় গেলে এই কিচেনটার কথা খুব মনে পড়ে। ওখানে ঠাম্মা নানারকম খাবার তৈরি করে দেন বটে, কিন্তু সেগুলো চাইলেই পাওয়া যায় না। তৈরি করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

লিভিং রুমে এসে রিমোট টিপে টিভি খুলল তামা। একটা ক্রাইম ছবি হচ্ছে চ্যানেল সেভেনে। সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারে গুলি ছুঁড়ল অপরাধী। লোকটা পড়ে গেল। অপরাধী পালাল। পুলিশ এবং অ্যাম্বুলেন্স এল, দেখা গেল লোকটা মরে গেছে। পুলিশ অফিসার বললেন, "ওর মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ ও জানত এই এলাকায় কারা ড্রাগ নিয়ে ব্যবসা করে।"

রিমোট টিপে টিভি বন্ধ করল তামা। এটা নিশ্চয়ই অ্যান্টি ড্রাগ বিজ্ঞাপন। এতে কোনও রহস্য সেই। এখন চারপাশে ড্রাগের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন। তাদের স্কুলে ঢোকার রাস্তায় বোর্ডে লেখা আছে 'ড্রাগ ফ্রি জোন।' স্কুলের গেটেও সাইনবোর্ড টাঙানো, 'ড্রাগ ফ্রি স্কুল'। কিন্তু অনেকেই ড্রাগ খায়। লুকিয়ে-চুরিয়ে। যেদিন খায় সেদিন স্কুলে আসে না। মার্থার বাড়িতে

জড়ো হয়। চারজনকে জানে সে। ক্যাথরিন তাকে দলে টানতে চেয়েছিল বলেই জানে। ক্যাথরিন তার অনেকদিনের বন্ধু। বলেছিল, "যেই তুই কিকটা পাবি অমনই মনে হবে পৃথিবীটা কী সুন্দর। কোথাও কোনও প্রব্লেম নেই।'

তামা জিজ্ঞেস করেছিল, "তুই রোজ খাস?"

'নো। সপ্তাহে একদিন। রোজ খেলে নেশা হয়ে যাবে। তখন না পেলে শরীর রিভোল্ট করবে। শরীরের ভেতরটা অকেজো হয়ে যাবে। রোজ কেউ খায়, পাগল!"

"খাওয়ার কী দরকার?"

"ওহ্ নো! ইট্‌স এক্সাইটিং। তুই খুব ভীতু। আঠারো না হলে অ্যাডাল্ট হবি না।"

এটা ওকে খোঁচা দেওয়ার জন্য। বাবা তাকে গাড়ি চালানো শিখিয়েছেন, কিন্তু রাস্তায় বের করতে দেন না। আঠারোর নীচে লাইসেন্স পাওয়া যায় না। ধরলে কড়া শাস্তি। ক্যাথরিন কিন্তু প্রায়ই চালায়। ওর বয়সের তুলনায় শরীরটা বড়। লাইসেন্সের তোয়াক্কা করে না ও। এখনও অবশ্য ধরা পড়েনি। তামাদের ক্লাসে ক্যাথরিন আর তামার রেজাল্ট সবচেয়ে ভাল।

ক্যাথরিন ড্রাগ নিতে শিখেছিল মার্থার কাছে। মার্থা শিখেছে ওর দাদার বন্ধুর কাছে।

ড্রাগ খাওয়া ছেলেমেয়েদের যেসব ছবি ছাপা হয়, তার সঙ্গে ওদের কোনও মিলই নেই। স্কুলে কড়া সার্কুলার দেওয়া আছে, কোনও ছেলেমেয়ে যদি ড্রাগ খাচ্ছে প্রমাণিত হয়, তা হলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। যারা ড্রাগ বিক্রি করে তারা অন্য স্কুলেব পাশাপাশি পার্কে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু ড্রাগ ফ্রি জোনের নোটিশ থাকায় ওদের স্কুলের দিকে কেউ বিক্রি করতে আসে না। স্কুলের পাহারাদাররা ওদের ছাড়বে না। তামা ক্যাথরিনকে জিজ্ঞেস করেছিল ওরা কোথায় ওসব কেনে? ক্যাথি বলতে চায়নি। কিন্তু একদিন স্কুলে যাওয়ার সময় ডিমফিল্ডের মার্কেট প্লেসে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু কালো মানুষকে দেখিয়ে বলেছিল, এদের কাছে চাইলেও পাওয়া যায়।

বাড়িতেও এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। ফর্টি সেকেণ্ড স্ট্রিটের দেওয়ালে যেসব মানুষ সারাদিন সারাসন্ধ্যা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের প্রায়ই পুলিশ ধরে ড্রাগ ব্যবসায় সাহায্য করার অভিযোগে। ওয়াসিংটন ব্রিজ টানেলেও ওদের দেখতে পাওয়া যায়। মা-বাবার সঙ্গে ওই পথে গিয়ে লোকগুলোকে দেখেছে তামা। দেখলেই ভয় লাগে। বাবা বলেন, "শুধু কালোরা নয়, সাদারাও আছে সমান-সমান।" পানামা দখল করে নুরিয়েগাকে যখন ভার্টিকান এমবাসির ভেতর আটকে রাখা হয়েছিল তখন বাবা খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, এ লোকটা পৃথিবীর অন্যতম ড্রাগ-কারবারি। একটা ক্যাসেট বেরিয়েছিল। তখন নুরিয়েগাকে গালাগালি দিয়ে। স্কুলের মেয়েরা তা গাইত। এমনকী ক্যাথিও। অথচ ক্যাথি সপ্তাহে একদিন ড্রাগ খায়। মা ক্যাথিকে চেনে। মাকেও কথাটা বলতে পারেনি সে। আগে যা জানত তাই মাকে বলত। এখন বড় হওয়ার পর সে বুঝে নিয়েছে কোনটা বলা দরকার। মা ক্যাথির ওপর রাগ করবেন। হয়তো স্কুলে ফোন করে বলে দেবেন। স্কুল যদি ক্যাথির শরীর টেস্ট

করে তা হলে সত্যিটা প্রকাশ পাবেই। তা হলেই ওরা ওকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। অতদিনের একটা ভাল বন্ধুকে হারাবে তামা। তাই বলেনি কিছু। ক্যাথি প্রতি সপ্তাহে ওজন নেয়। ওর ওজন কমার বদলে একটু বেড়েছে। ড্রাগ যদি ক্ষতি করত তা হলে ওজন কমত।

টেলিফোন বাজল। এ-বাড়ির প্রতি ঘরে টেলিফোন। কিচেনেও। রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই দূর থেকে গলা ভেসে এল, "হেলো! তামা নাকি? আমি বড়মামা!"

খুশি হল তামা, "হাই! তুমি কেমন আছ?"

"ভাল না। মা-বাবা কোথায়?"

"অফিসে। আমার শরীর খারাপ বলে স্কুলে যাইনি।"

"রাত্রে লাইন পাইনি। আমি খুব প্রব্লেমে পড়েছি অন্তুকে নিয়ে। মাকে বলবি ফোন করতে।"

"কী প্রব্লেম?" জিজ্ঞেস করা মাত্র লাইনটা কেটে গেল।

বড়মামা ফোন করেছিলেন ইণ্ডিয়া থেকে। খুব মজার মানুষ। গত বছর তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। অন্তু বড়মামার ছেলে। চার বছর আগে সে যখন ইণ্ডিয়ায় গিয়েছিল তখন অন্তুকে দেখে তার ভাল লেগেছিল। আমেরিকা সম্পর্কে খুব আগ্রহ অন্তুর। তামার থেকে দু' বছরের বড়।

ইণ্ডিয়ার আত্মীয়দের ভাল লাগে তামার, কিন্তু সেখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। এত ভিড়, এত গরম যে, হাঁপিয়ে ওঠে। ওখানে যাঁরা জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন তাঁদের শরীর নিশ্চয়ই জল, খাবার আবহাওয়ার সঙ্গে একটু একটু করে মানিয়ে নিয়েছে! কিন্তু তামা পারে না। রাস্তায় ট্রাফিক রুল বলতে কিছু নেই। খাবারদাবার ফ্রেশ না নিয়ে এলে ভাল পাওয়া যায় না। মাঝে-মাঝে মনে হত সবাইকে যদি এদেশে সে নিয়ে আসতে পারত, কী মজা হত! বাবা-মা ইণ্ডিয়ায় গিয়ে প্রথম ক'দিন খুব উৎসাহে থাকেন। একটু পুরনো হওয়ামাত্র কেমন ঝিমিয়ে পড়েন।

অন্তুর কী হয়েছে? এমন কী সমস্যা যার জন্য বড়মামাকে অতদূর থেকে ফোন করতে হল? ভেবে পাচ্ছিল না তামা। সে এখন ইণ্ডিয়ায় টেলিফোন করতে পারে। কিন্তু লং ডিসট্যান্স কল করলে বাবা রাগ করবেন। সে মাকে ফোন করে বড়মামার ব্যাপারটা জানিয়ে দিল। তার শরীর এখন ভাল আছে, একটু বাদেই ব্রেকফাস্ট খাবে। মা যেন চিন্তা না করেন।

টিভি দেখতে ইচ্ছে করছে না। সারাটা দিন বাড়িতে একা বসে থাকা, কী বিরক্তিকর ব্যাপার। স্কুলের বাস এসে দাঁড়াল রাস্তায়। জানলা দিয়ে দেখল সে। দু' মিনিট দাঁড়াবে বাসটা। না গেলে চলে যাবে। ক্যাথরিন যে জানালায় বসে সেখানে আজ কেউ নেই। ওই সিটটা ক্যাথির পাকা। তবে কি আজ ক্যাথিও স্কুলে যাচ্ছে না! বাস বেরিয়ে গেল।

ক্যাথরিনের বাড়িতে ফোন করল সে। ক্যাথিই ধরল, "ও, তুই। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।"

"ভয়? কেন?"

"কিছু না। তুই স্কুলে যাসনি?"

"না। শরীর ভাল না। তুই যাসনি কেন?"

"এমনিই।" একটু চুপ করল ক্যাথি, "তামা, তুই আমাকে সাহায্য করবি?"

"নিশ্চয়ই। কী ব্যাপারে বল?"

"আমি তোর কাছে যাচ্ছি।" লাইন কেটে দিল ক্যাথি।

মিনিট পনেরো বাদে ক্যাথি গাড়ি চালিয়ে এল। ওর মায়ের গাড়ি এটা। মা গতকাল নিউ অরলিন্সে গিয়েছেন তাঁর বাবাকে দেখতে। দরজা খুলতেই সোফায় ধপ করে বসে পড়ল ক্যাথি। ওকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। অথচ গতকালও স্বাভাবিক ছিল।

ক্যাথি বলল, "মার্থা আমাকে খুব বিপদে ফেলে দিয়েছে।"

"কী বিপদ?"

"কাল রাত্রে আমাকে একটা প্যাকেট দিয়ে গেছে ব্রাউন সুগারের। আজ সকাল পর্যন্ত রাখতে বলেছিল। আমি আপত্তি করেছিলাম, শোনেনি।" ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করল ক্যাথি।

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তামার। একটা অ্যালার্ম ক্লকের বাক্সের সাইজের প্যাকেট। ব্রাউন সুগার কি জিনিস তা কোনওদিন দেখেনি সে। ক্যাথি বলল, "মার্থা বলেছে এতে নাকি পঞ্চাশ হাজার ডলারের জিনিস আছে। সাধারণ ব্রাউন সুগার নয়।"

"মার্থাকে ফেরত দিয়ে দে।" কোনওমতে বলতে পারল তামা।

"আজ সকালে ওকে ফোন করেছিলাম।"

"কী বলল?"

"ও নেই।"

"নেই মানে? কোথায় গেছে?"

"ওকে কাল রাত্রে কেউ খুন করেছে।"

"সে কী!"

"টিভিতে দেখিসনি? আজ সকাল থেকেই দেখাচ্ছে।" ঘড়ি দেখল ক্যাথি।

"না তো।" বলে তামা টিভির সামনে ছুটল। লোকাল নিউজের সময় এখন। ক্যাথিও ওর পেছনে এল। চ্যানেল অন করে কিছু বিজ্ঞাপন দেখল। তারপর খবর আরম্ভ হল। প্রথমেই, "স্কুল গার্ল মার্ডারড।" হেডলাইন বলে আবার মার্থার খবরে ফিরে এল। মার্থা গতকাল রাত্রে বাড়িতে ফিরছিল। ওদের বাড়ির সামনে আততায়ী দাঁড়িয়ে ছিল। তখন আশপাশে কেউ ছিল না। শুধু উলটো দিকের একটা বাড়ির বৃদ্ধা মহিলা জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি দেখলেন লোকটা মার্থার সঙ্গে কথা বলল। শেষে ঝগড়া করল। দূরত্বের জন্য বিষয়বস্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না। লোকটা মার্থাকে হাত তুলে শাসাল। মার্থা সেটা উপেক্ষা করে চলে যেতে লোকটা পেছন থেকে গুলি চালায়। বৃদ্ধা রিভলভার দেখেছেন। সাইলেন্সার লাগানো ছিল বলে শব্দ হয়নি। শুধু মার্থার শরীর উলটে পড়ে যায়। বৃদ্ধা এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন

যে, চিৎকার করতে তাঁর সময় লেগেছিল। তবে তিনি দেখেছিলেন আততায়ী মার্থা পড়ে যাওয়ার পর তার পোশাকে কিছু সন্ধান করেছিল। সে যে পায়নি এটা তিনি নিশ্চিন্ত। পথের পাশে একটা বাইক দাঁড় করানো ছিল। আততায়ী সেটা চেপে চলে যায়। বৃদ্ধাই পুলিশকে ফোনে জানান। ইতিমধ্যে পুলিশ মার্থা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে যা জানতে পেরেছে তাতে সন্দেহ হচ্ছে সে ড্রাগব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিল। প্রতি সপ্তাহে কিছু মেয়ে দুপুরে ওর বাড়িতে মিলিত হত। এই মেয়েরা কারা তা এখনও জানা যায়নি। জোর তদন্ত চলছে।

এই খবরের সঙ্গে মার্থার বাড়ির বাইরেটা, তার শোবার ঘর, মৃত এবং জীবিত মার্থার ছবি বারংবার দেখানো হচ্ছিল। ওরা দমবন্ধ করে টিভির দিকে তাকিয়ে ছিল। মার্থার পড়ার টেবিল যখন দেখাচ্ছে তখন ক্যাথি চেঁচিয়ে উঠল, "হা ভগবান!"

তামা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"আমার বই। আমার নাম লেখা আছে ওতে। মার্থা পড়তে নিয়েছিল।" মুখে হাত দিল সে, "কী হবে এখন?"

তামা ওর কাঁধে হাত রাখল, 'তাতে কী হয়েছে। বন্ধু তো বই নিতেই পারে।"

"কিন্তু আমিও তো দুপুরে ওর বাড়িতে যেতাম।"

ওরা দু'জন চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ক্যাথি উঠল, "আমি যাচ্ছি। তুই ওই প্যাকেটটা কিছুদিন তোর কাছে রেখে দিবি?"

"আমার কাছে রাখতে চাইছিস কেন?"

"যে মার্থাকে খুন করেছে, সে আমার কাছে আসতে পারে। পুলিশ তো আসবেই। আর এসে যদি ওটা দ্যাখে তা হলে—।" ক্যাথি মাথা নাড়ল।

"এটাকে রাখার কী দরকার? ফেলে দে জলে।"

"না!" দৃঢ় গলায় উচ্চারণ করল ক্যাথি।

"কেন?"

"সহজে পাওয়া যাবে না ওই জিনিস।"

"পাওয়ার কী দরকার?"

"তুই বুঝবি না।"

"তোর নেশা হয়ে গেছে ক্যাথি।"

"হলে হোক, তোর কী?"

"তা হলে আমি এটা রাখতে পারব না। আর রাখলে মাকে বলব।"

"তামা, তুই আমার উপকার করবি না?" কাতর গলা হয়ে গেল ক্যাথির।"

"ওই প্যাকেট আমি রাখতে পারব না। ক্যাথি, তুই এটাকে ফেলে দে।"

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল ক্যাথরিন। ফুঁপিয়ে কাঁদল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "আমি মরে যাব তামা। ওরা যেমন মার্থাকে মেরে ফেলেছে তেমনই আমাকেও মারবে।"

"কারা মার্থাকে মেরেছে?"

"আমি জানি না। তবে মার্থা আমাকে বলেছিল, ওরা খুব দামী জিনিস দেবে। পঞ্চাশ হাজার ডলার দাম। টাকাটা জোগাড় করতেই হবে। আমার কাছে চেয়েছিল। আমি দেব কী করে? আমার পাঁচশো ডলার আছে। মার্থা পাঁচ হাজার জোগাড় করেছিল। তাই দিতে চেয়েছিল লোকগুলোকে। ওরা রাজি হয়নি।"

"ওরা তো তোকে চেনে না।"

"কী জানি! আমার খুব ভয় করছে। যদি মার্থা আমার নাম ওদের কাছে করে থাকে!" ভেঙে পড়ছিল ক্যাথি।

"তুই পুলিশকে সব খুলে বল।"

"না। তা হলে আমার ছবি টিভিতে সবাই দেখবে। ওরাও জানতে পারবে। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। নেশা হোক বা না হোক একদিন তো সপ্তাহে খাই।"

"তা হলে তুই ওটা জলে ফেলে দে।"

"আমি একা আর ওটা নিয়ে যেতে পারব না তামা।"

বন্ধুর কান্না, চেহারা দেখে একটু ভাবল তামা। তারপর এগিয়ে গিয়ে মাকে টেলিফোন করল, "মা, ক্যাথি এসেছে, ওর সঙ্গে একটু বের হব? না, না, জ্বর নেই। বেশি দূরে না, কে মার্টের দিকে। অ্যাঁ, না, ও স্কুলে যায়নি। কেন? এমনিই। এক ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসব। প্রমিস।" রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

দরজা বন্ধ করে তামা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ক্যাথির সঙ্গে। একটু শীত-শীত করছিল। যদিও এখন শীত নেই। জিনসের ওপর সুতির পুলওভার পরেছে সে। দেখতে বেশ সুন্দর লাগছিল। ক্যাথি গাড়িতে উঠে বসতেই তামা বলল, "তোর ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। যদি পুলিশ ধরে তা হলে কিন্তু প্যাকেটটা লুকনো যাবে না।"

"যাঃ। কোনদিন ধরেনি, আজও ধরবে না।"

"না। চল হেঁটে যাই।"

ক্যাথি বিরক্ত হল। এখানে একমাত্র জগিং কিংবা মর্নিং ওয়াকের সময় লোকে ফুটপাত দিয়ে হাঁটে। তা ছাড়া তামাদের বাড়িটা নির্জন গাছগাছালিঘেরা এলাকায় বলে পথে মানুষ দেখা যায় না। পুলিশের ভয়েই ক্যাথি গাড়ি থেকে নামল। ওর ব্যাগেই প্যাকেটটা রয়েছে।

দুই বন্ধুতে পাশপাশি অনেকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে গেল। ক্যাথি অবশ্য মাঝে-মাঝেই মুখ ফিরিয়ে পেছনের দিকে তাকাচ্ছিল। বাঁক ঘুরতেই ওরা লেকটাকে দেখতে পেল। রাস্তার এপাশে লেক, অন্যদিকে কে মার্ট। কে মার্টের সামনে পার্কিং লটে এখন বেশি গাড়ি নেই। তবু কিছু মানুষকে সেখানে দেখা যাচ্ছে। আমেরিকার প্রায় সব বড় শহরে এই কোম্পানির বিশাল ডিপার্টমেন্টাল দোকান রয়েছে। নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত মানুষের যা-যা প্রয়োজন, তা একটা ফুটবল মাঠের আয়তনের ওই দোকানটায় রয়েছে। কে মার্টের উল্টোদিকে হাঁটতে

লাগল ওরা। লেকটার গায়ে একটা ফেন্সিং আছে। একটিও মানুষ লেকের ধারে-কাছে নেই। ওরা ফেন্সিং-এর কাছে চলে এল। তামা বলল, "কেউ নেই। এখান থেকে প্যাকেটটা জলে ছুঁড়ে দে।"

ক্যাথি বলল, "প্যাক না খুলে ছুঁড়ে দিলে এটা ঠিক থাকবে। ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে মোড়া। প্যাকেটটা ছিঁড়ব?"

কোনদিন ব্রাউন সুগার দেখেনি তামা। প্যাক খুললে নিশ্চয়ই দেখা যাবে। সে মাথা নাড়তেই পেছন থেকে গলা ভেসে এল, "এই যে খুকিরা, ওখানে কী করছ?"

চমকে পেছনে তাকাতেই ওদের দম বন্ধ হয়ে গেল। একটা পুলিশের গাড়ি কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। ড্রাইভিং সিটে বসে একজন অফিসার ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। ক্যাথি কাঁধ নাচাল, "লেক দেখছি। লেক দেখাটা কি অন্যায়?"

"মোটেই না। তোমরা কি কারও জন্য অপেক্ষা করছ?"

"না।" তামা মাথা নাড়াল।

"ওকে, ওকে। দেন পুশ্ অফ। কাল ওই পাড়ায় একটি তোমাদের বয়সী মেয়ে খুন হয়েছে। মেয়েটা ড্রাগ খেত। ওরকম একটা ঘটনা আর ঘটুক আমরা চাইনা।"

তামা প্রতিবাদ করল "আমি ড্রাগ খাই না।"

"ইট্স গুড। কিন্তু খুকি, এই লেকে দেখার কিছু নেই।"

অতএব সরে আসতে হল। ওরা যতক্ষণ না রাস্তা পেরিয়ে কে মার্টের দিকে এগিয়ে গেল ততক্ষণ অফিসার নড়লেন না। গাড়িটা বেরিয়ে গেলে স্বস্তি পেল ওরা। তামা বলল, "ভাগ্যিস তুই তোর গাড়িটা ওখানে পার্ক করিসিনি।"

ক্যাথি বলল, "লোকটা মার্থার কথা বলল। আমাকে সার্চ করলেই..........."

"কী করবি এখন প্যাকেটটা নিয়ে?"

"কী করি!" পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে ক্যাথি বিড়বিড় করল। তামা ঘড়ি দেখল। ইতিমধ্যে পঁয়ত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে। মা ঠিক এক ঘণ্টা পরে ফোন করবেন। সে প্রমিস করেছে এই সময়ের মধ্যে ফিরে আসবে।

ক্যাথি বলল, "চল, কে মার্টের লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড বক্সে ওটা ফেলে দিই।"

"যে লোকটা খুলবে সে যদি ড্রাগ খায় তা হলে ফেরত দেবে?"

"না দিলে না দেবে, আমাদের কী!"

"বাঃ, তাতে লোকটার সর্বনাশ হবে। ওর বাড়ির লোকজনের ক্ষতি হবে।" বলতে-বলতে তামা দেখল একটা লোক কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিটা ভাল লাগল না। এই সময় ক্যাথি বলল, "মাটিতে পুঁতে ফেললে কীরকম হয়?"

"কোথায় পুঁতবি?"

"আমাদের বাড়িতে তো মাটি নেই। তোদের বাড়ির পেছনের বাগানে যদি পুঁতে দিই? সেই ভালো। কেউ দেখতে পাবে না, বুঝতেও পারবে না।"

সায় দিচ্ছিল না মন। বাবা-মা জানবেন না যে বাড়ির বাগানে অত হাজার ডলারের ব্রাউন সুগার আছে। পুলিশ যদি আসে, যদি সঙ্গে কুকুর থাকে তা হলে খুঁজে পেতে দেরি হবে না। সেক্ষেত্রে ওরা বাবা-মাকেও ধরবে। সে মাথা নাড়ল, "না, আমাদের বাড়িতে না। বরং চার্চের পেছনে যে বাগানটা, সেখানে কেউ যায় না। আজ চার্চ ডে নয়। সেখানেই পুঁতে দেওয়া যেতে পারে।"

তামা হিন্দু। কারণ তার বাবা-মা তাই। কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে সে কয়েকবার চার্চে বেড়াতে গিয়েছে। ওই বাগানটাকে তার খুব ভাল লাগে। এদিকে লোকটা এখনও তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তামা ওকে এড়াতেই ক্যাথিকে নিয়ে কে মার্টের ভেতরে ঢুকল। লোকজন এই অসময়ে তেমন নেই। কর্মচারীরা ছড়িয়ে আছে আশপাশে। এককোণে টিভি চলছে। সবাই সেদিকে তাকিয়ে। তামারা দেখল মার্থার খবরটাই বলা হচ্ছে।

পুলিশ জানতে পেরেছে গত রাত্রে মার্থা তার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে সে বন্ধুর কাছে একটা প্যাকেট রেখে এসেছে। মার্থা যে ড্রাগ-চোরাচক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল এটা তার প্রমাণ। এই অবধি শুনেই ক্যাথি তামার হাত আঁকড়ে ধরল। সংবাদপাঠিকা তখনও বলে যাচ্ছেন, "পুলিশ একটু আগে মেয়েটিকে গ্রেফতার করে। মেয়েটির নাম লুসি। ওরা একই ক্লাসে পড়ত। লুসির কাছে যে প্যাকেটটা পাওয়া যায় তাতে সাধারণ চিনির দানা ছিল। লুসি বলেছে মার্থা তাকে রাখতে দিয়েছিল এক রাত্রের জন্য। কী ছিল সে খুলে দেখেনি। এদিকে মার্থার মা জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ে পাঁচ হাজার ডলারের একটা ক্যাশ সার্টিফিকেট তাঁদের অজান্তে ভাঙিয়েছে। কিন্তু মার্থা কেন লুসির কাছে সাধারণ চিনি রাখতে যাবে তা বোধগম্য হচ্ছে না। পুলিশ সন্দেহ করছে চোরাকারবারীরা মার্থাকে ভুল বুঝিয়েছিল।"

ক্যাথি তামার দিকে তাকাল। হঠাৎ তামা উত্তেজিত হয়ে ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এল, "আমি মাকে ফোন করছি।"

"সে কী! কেন?"

"মা এলে সব কথা খুলে বলব।"

"অসম্ভব।" মাথা নাড়ল ক্যাথি।

"তোর প্যাকেটেও লুসির মতো চিনি পাওয়া যেতে পারে।"

"কী করে বলব?"

"মা এসে প্যাকেটটা খুললেই বোঝা যাবে।" বলতে-বলতে তামা দেখল সেই লোকটাকে মার্টের ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। চোখাচোখি হতেই লোকটা এগিয়ে এল, "এক্সকিউজ মি বেবি, তোমার নাম কি ক্যাথরিন?"

"কেন? নামে কি দরকার?"

"আমি তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম তুমি তামার বাড়িতে এসেছ। তামার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম কেউ নেই কিন্তু তোমার গাড়িটা ওখানে রয়েছে। তারপরেই রিপোর্ট পেলাম তোমাদের বয়সী দুটো মেয়েকে লেকের ধারে দেখা গেছে।"

"আপনি কে?" ক্যাথি জিজ্ঞেস করল কাঁপা গলায়।

লোকটা পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখাল,"ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর জন স্মিথ।" জন হাসলো, "তুমি খুব নার্ভাস হয়ে আছ মনে হচ্ছে।"

"না, নার্ভাস কেন?" ক্যাথি মুখ ফেরাল।

"ওয়েল। আমরা তামার বাড়িতে বসতে পারি। ওর মা-বাবাও এখনই এসে পড়বেন। তা ছাড়া তোমাদের গাড়িটা ওখানে পড়ে আছে। সেটা নিতে তোমার মা ওখানে আসছেন।" জন হাত তুলল, "চলো, ওইখানে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।"

ক্যাথি কাতর চোখে তামার দিকে তাকাল। জন এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ির দিকে। ক্যাথি ফিসফিস করে বলল. "ব্যাগ থেকে বের করে ফেলে দেব?"

"দেখতে পাবে।" তামা জবাব দিল।

"কিন্তু আমার ব্যাগ থেকে ওটা পেলে জেল হবে, স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে।"

ডিটেকটিভ জন চেঁচিয়ে ডাকতেই ওরা এগিয়ে যেতে বাধ্য হল। গাড়িতে পথটা ফুরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্তেই। তামা দেখল বাড়ির বারান্দায় মা দাঁড়িয়ে আছেন চিন্তিত মুখে। ক্যাথির মা গাড়ির কাছে। বাবাকে দেখতে পেল না। গাড়ি থেকে নামতেই তামার মা দৌড়ে নেমে এলেন। হাত তুলল জন, "না, না, উত্তেজিত হবেন না। চলুন ভেতরে গিয়ে কথা বলি।"

তামার মা তামার হাত ধরেছিলেন। ক্যাথিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তার মা। ক্যাথি কাঁদছিল। ভেতরে ঢুকে সবাইকে সোফায় বসতে বললেন জন। তারপর শুরু করলেন, "আমি একটু খুলেই বলি। লুসি, মার্থার বন্ধু স্বীকার করেছে ওরা সপ্তাহে একদিন মার্থার বাড়িতে মজা করতে যেত। ওরা ড্রাগ খুব সামান্যই নিত, তাই নেশা হয়নি। ক্যাথি, কী বল?"

ক্যাথি নীরবে মাথা নাড়তেই জন খুশি হলেন, "দ্যাটস গুড। চতুর্থ মেয়েটির নাম লিজা। সে-ও এরই মধ্যে কথাটা স্বীকার করেছে। মার্থা কাল রাত্রে লিজার বাড়িতেও গিয়েছিল। লিজা এবং ক্যাথির নাম আমরা জানতে পারি লুসির কাছ থেকে। মার্থা তার তিন বন্ধুকে তিনটি প্যাকেট দিয়ে এসেছিল। ক্যাথি, তোমার প্যাকেটটা দাও।"

ক্যাথি চুপ করে বসে রইল। তার মা বললেন, "ক্যাথি, উনি যা বলছেন তাই করো।"

ক্যাথি তখন ব্যাগ খুলে প্যাকেটটা টেবিলে রাখল। সেটা তুলে নিয়ে চটপট খুলে ফেললেন জন। সেলোফেন কাগজের প্যাকেটের ভেতরে লালচে-সাদায় দ্রব্যদানা চোখে পড়ল সবার। সেই মোড়কটা খুলে একটা দানা জিভে নিয়ে চোখ বন্ধ করলেন জন। তারপর হেসে ফেলে

দিলেন টেবিলে, "হ্যাঁ, এটাও চিনির দানা।" সঙ্গে সঙ্গে তামা এবং ক্যাথির মায়ের স্বস্তির নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। জন বললেন, "মার্থা জানত না এই প্যাকেটে চিনির দানা আছে। পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে সে পঁচিশ সেন্টের চিনি কিনেছিল। ওকে কেউ ধাপ্পা দিয়েছে। ওকে যেমন ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে তেমনই আর-একজন ধাপ্পা খেয়েছে। যে মার্থাকে বিক্রি করেছে সে আর-এক নেশাখোরকে খবর দিয়েছিল মার্থার কাছে জিনিসটা আছে। লোকটা মার্থার কাছে সেটা চায়। মার্থা ভয়ে লুসির নাম করে। কিন্তু সে বিশ্বাস করে না। ঝগড়া হয় এবং গুলি করে। ড্রাগের জন্য ওরা সব করতে পারে। লোকটা এরপরে লুসির বাড়িতে যায়। রাত হয়ে যাওয়ায় ভেতরে ঢুকতে পারে না। অপেক্ষা করে সুযোগের জন্য। কিন্তু সেই সময় তার নেশা প্রবল হয়ে ওঠে। ওই সময় মাথা ঠিক রাখতে পারে না ওরা। বাড়ির পাশের গাছ বেয়ে দোতলায় উঠতে যায় সে। শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পড়ে যায়। তার চিৎকারে লুসির বাবা বেরিয়ে আসেন। আহত লোকটিকে হসপিটালাইজ্‌ড করা হয়। ওর অবস্থা খুবই গুরুতর। আজ সকালে সে স্টেটমেণ্ট দিয়েছে, কেন লুসিদের দোতলায় উঠতে গিয়েছিল। ওর সেন্স ফিরলে আমরা মার্থাকে খুন করার স্টেটমেন্ট নেব। কিন্তু এখন, ক্যাথি, আমি চাই না তোমার মতো সুন্দর মেয়ের নামে বদনাম হোক। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা করো আর কখনও ড্রাগ খাবে না, তা হলে এই ব্যাপারটা গোপন থাকবে। তা ছাড়া তোমার কাছে চিনি ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি।" ক্যাথি কেঁদে ফেলল। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "প্রতিজ্ঞা করছি, আমি জীবনে ড্রাগ খাব না।"

ডিটেকটিভ জন হাসলেন, "দ্যাট্‌স লাইক এ গুড গার্ল। এখন মার্থার খুনীকে ধরেই আমাদের কাজ শেষ হয়নি। যারা ওকে বিক্রি করেছিল তাদের ধরতে হবে। তারাই সত্যিকারের অপরাধী। এবং আপনারা, মায়েরা, আপনাদের বলছি। যখন স্বামী-স্ত্রী কাজে বেরিয়ে যান এবং ওরা একা বাড়িতে থাকে, তখন আমাদের একটু ফোন করে জানিয়ে রাখবেন। ওরা অপ্রাপ্তবয়স্ক। কত বিপদ হতে পারে ওদের।" জন বেরিয়ে গেলেন।

ক্যাথির মা তামাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। কে জানে তাঁর মেয়ের মার্থার মতো অবস্থা হতে পারত যদি তামা ওকে সঙ্গ না দিত। ওঁরাও চলে গেলেন।

তামার মা গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন। তামা বলল, "মা তুমি আমার ওপর রাগ করেছ, না? আমি কিন্তু তোমাকে ফোন করার কথা বলেছিলাম।"

তামার মা মাথা নাড়লেন, "তোমায় আমি বিশ্বাস করি তামা।"

"তা হলে মুখ ভার করে আছ কেন?"

"তোমার বড়মামাকে টেলিফোন করেছিলাম।"

"ও। কী বললেন?"

"অন্তুর সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।"

"কী হয়েছে?" চমকে উঠল তামা।

"ও ড্রাগ খাচ্ছে। ফেরোসাস হয়ে গিয়েছে। কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না। ঘরে বন্ধ করে রাখলেও ড্রাগ খেতে দিতে হচ্ছে। পড়াশোনা চুলোয় গিয়েছে। আমি বড়মামাকে বললাম, ওকে এখানে নিয়ে আসতে। এখানে অনেক নতুন চিকিৎসা হচ্ছে এখন। এখনই না বাঁচাতে পারলে তোমার বড়মামার পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে।"

চুপ করে রইল তামা। তারপর বলল, "মা, ইণ্ডিয়াতেও ড্রাগ খায় ওরা?"

"তোমাকে বলেছি ইণ্ডিয়া বলবে না নিজেদের মধ্যে। দেশ বলবে। হ্যাঁ, খায়। এই সর্বনেশে জিনিস যারা বিক্রি করে তারা পৃথিবীর সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।"

"কিন্তু তুমি বলো দেশের লোক গরিব। গরিবরা কেনে কী করে?"

"সেইরকম জিনিসই বিক্রি হয়, যা ওরা কিনতে পারে।"

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল তামা। সোজা চলে গেল নিজের ঘরে। কাগজ বের করে চিঠি লিখতে বসল, "পৃথিবীর সব দেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী মহাশয়েরা, আপনাদের কাছে আমি, একটি পনেরো বছরের মেয়ে, বিনীত আবেদন করছি যে, আপনাদের দেশে যারা ড্রাগ নিয়ে ব্যবসা করে তাদের একমাত্র শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দিন। ওরা মার্থাকে মেরেছে, ক্যাথির বিপদ ডেকে এনেছিল এবং আমার মামাতো ভাই অন্তুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আপনারা এদের কখনও ক্ষমা করবেন না। কোনও অল্প শাস্তি দেবেন না।"

রক্ত মাংসের স্বামী

বিয়ের তিন মাস বাদে এক সকালে চা খেতে খেতে তিয়া বলল, 'শ্যাম, তোমাকে কিছু কথা বলা দরকার হয়ে পড়েছে।'

চায়ের সঙ্গে আনন্দবাজার পড়া ছয় পুরুষের অভ্যেস, তবু কথাগুলো কানে যাওয়ামাত্র চমকে উঠল শ্যাম। এত মোলায়েম গলায় আজকাল কোন মেয়ে কথা বলে না। মোলায়েম গলায় স্ত্রীর কথা শুনতেন তার প্রপিতামহ। পুরাতত্ত্ব লাইব্রেরিতে ভিডিও টেপে সে ব্যাপারটা দেখে ও শুনে এসেছিল বিয়ের আগে। এখন যেন সেই গলা, নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

তিয়া বলল, 'স্বামী হিসেবে তুমি চলেব্‌ল। অ্যাটলিস্ট আমি যা বলি তা তুমি শোন। স্ত্রী হিসাবেও আমি খারাপ নই। কাজের জন্যে তুমি আমাকে ওয়ান ভোল্টের রোবট কিনে দিতে চেয়েছিলে, আমি নিইনি।'

'আসলে দামী রোবট কিনতে পারিনি, বিয়ের আগেই তোমাকে বলেছিলাম। কম দামীটায় কিছু কাজ চালানো যেত: তুমি নিলে না।'

'টাকাটা জমিয়েছি। এরপর তো কিনতেই হবে পাঁচ ভোল্টের রোবট। এখন তো কোন কাজ আটকে যাচ্ছে না, তুমি দারুণ কো-অপারেট করছ। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, স্বামী হিসেবে তুমি চলেব্‌ল কিন্তু আমার সন্তানের বাবা হিসেবে তোমাকে মানতে পারছি না।' তিয়া চায়ের কাপ শেষ করল।

'কেন?' শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল শ্যামের।

'তোমার পেডিগ্রি দ্যাখো। তোমার বাবা সাধারণ লোক ছিলেন, তাঁর বাবা এমন কিছু করেননি যা তুমিও মনে রাখতে পার। তাঁর বাবা শুনেছি অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন, তুমিই বলেছ। তাঁর বাবা নাকি এই আনন্দবাজারেই গল্প লিখতেন। অথচ এখনকার আনন্দবাজারে তাঁর নাম কখনোই উল্লেখ করা হয় না। এই ব্যাকগ্রাউণ্ড নিয়ে তোমার সন্তান কি হতে পারে। সাধারণ একটি মানুষ। তাই না?'

মাথা নাড়ল শ্যাম, 'হুঁ।'

'তোমার সন্তান কিরকম হলে তুমি খুশি হও?'

'খুব নামকরা একজন বিজ্ঞানবিদ্‌। দারুণ আবিষ্কার করবে।'

'ওই পেডিগ্রিতে কোন চান্স নেই। আমিও একটি দারুণ সন্তানের মা হতে চাই। সারা জীবন গর্ব করতে পারব।' তিয়া উঠে এসে শ্যামের শরীরের সঙ্গে নিজের মাপা শরীর ঘনিষ্ঠ করে

বলল, 'আমি তোমাকে খুব প্রাউড ফাদার করতে চাই। তোমার মন খারাপ শুরু হয়ে গেছে তো। বারো ঘণ্টা থাকবে, তারপর আবার এ নিয়ে আমরা কথা বলব। আজ ছুটির দিন, কোথাও বের হবো না। এই বারো ঘণ্টা আমি তোমাকে চোখে চোখে রাখব।' তিয়া শ্যামের মাথায় হাত বোলালো।

দেড়শ বছর আগেও পৃথিবীর মানুষের মন একবার খারাপ হলে কিছুতেই ভাল হতে চাইত না। আত্মহত্যা, যুদ্ধ, খুন—অনেক কিছু করে ফেলত সেই অবস্থায়। তখন মন ছিল ভারি স্যাঁতসেতে, শ্রাবণের রাস্তাঘাটের মত, কাদা প্যাচপেচে।

কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌রা যেসব অসাধ্যকে সাধ্যে এনেছেন তার মধ্যে একটি হল মানুষের মন কখনোই বারো ঘণ্টার বেশি খারাপ থাকছে না। জন্মাবার সময় আর ট্রিপল অ্যান্টিজেন পোলিও ভ্যাকসিন প্রয়োজন পড়ছে না। তার বদলে অন্য কয়েকটি ওষুধ দেওয়া হয়। ওরই একটার ফল হল বারো ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারলে মন একদম চৈত্রের দুপুরের মত তপ্ত হয়ে যায়। গরম হৃদয় যাকে বলে। বিজ্ঞানবিদ্‌রা চেষ্টা করছেন যাতে সময়টা আরও কমানো যায়। বারো ঘণ্টার মন খারাপে কিছুদিন আগে দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধ লাগব লাগব হচ্ছিল। সময়টা কেটে যেতেই শান্তি এসেছে।

সেইদিন রাত এগারোটার সময় শ্যাম টিভি দেখছিল। এখন কলকাতায় বসে সাতানব্বুইটা চ্যানেল ধরা যায়। আইরিশ ফোক সঙ শুনছিল সে। নাইনটিনথ সেঞ্চুরির গান। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা তিয়াকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তিয়া, তুমি কবে মা হতে চাও?'

'ফাইভ ভোল্টের রোবটটা কিনতে পারলেই।'

'সেটা তো আমরা ইনস্টলমেণ্টেও কিনতে পারি।'

'এখন পারি। টাকাটা আমি মাসে মাসে দিতে পারব। গত মাসেই তো দুজনের ইনক্রিমেণ্ট হয়েছে। খুব ভাল বলেছ।'

শ্যাম খুশি হল। তিয়া প্রশংসা করলে তার খুব ভাল লাগে।

তিয়া একটু ভেবে বলল, 'আমার বয়স এখন আঠাশ। আর তিরিশ বছর আমার যৌবন থাকবে। তার মধ্যেই ওকে বিখ্যাত হতে হবে।'

শ্যাম টিভির চ্যানেল পাল্টালো। কোপেনহেগেন। স্পষ্ট আসছে। ডেনিশ ভাষায় কোন আলোচনা সভা চলছে। হঠাৎ ইংরেজিতে সাব টাইটল ফুটল। 'খুব জরুরী ঘোষণা করা হচ্ছে। আজ কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানবিদ্‌ সম্মেলনে আমেরিকার বিজ্ঞানবিদ্‌ যোশেফ-পয়টার একটি আলোড়ন তোলা আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানবিদ্‌রা তা মেনে নিয়েছেন।'

তিয়ার নজর টিভির ওপর পড়েছিল। সে বিছানা থেকে নেমে শ্যামের পাশে এসে বসল। একজন কালো আমেরিকান এবার ক্যামেরায়। তিনিই যোশেফ পয়টার। ছিপছিপে, পঞ্চাশের মধ্যে বয়স। যোশেফ ইংরেজিতে বললেন, 'আমি এই পৃথিবীর মা এবং বোনদের জন্যে একটা

চমৎকার খবর পরিবেশন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।·সন্তান জন্মাবার আগে মাতৃগর্ভে দশমাস সময় কাটাতে বাধ্য হত। আর এই সময়টা হবু মায়েরা অত্যন্ত কষ্টে কাটাতেন। শেষের কয়েক মাস তাঁদের প্রায় জড়ভরত হয়ে থাকতে হত। গত দশ বছর ধরে আমি চেষ্টা করেছিলাম এই সময়টাকে কমানোর জন্যে। আমার বিশ্বাস হয়েছিল ভ্রূণ থেকে পূর্ণ মানুষ করতে প্রকৃতি বড্ড বেশি সময় নিচ্ছে। আমি শেষ পর্যন্ত এই সময়টাকে কমিয়ে তিন মাসে আনতে সক্ষম হয়েছি। এখন থেকে আর কোন মাকে বাড়তি সাত মাস কষ্ট করতে হবে না। এর ফলে মায়েদের কাজের ক্ষমতা এবং অন্যান্য সৃজনশীলতা বহুগুণ বেড়ে যাবে বলে বিশ্বাস।'

যোশেফকে জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁর স্ত্রী কি করেন? তিনি বললেন, 'মার্থা বিজ্ঞানচর্চা করে। তার বিষয় রোবট।' পর্দায় এবার তিন মাসে মা হওয়া এক আমেরিকান যুবতী এবং তার সন্তানকে দেখানো হল।

খবরটা শেষ হওয়ামাত্র উল্লাসে চিৎকারে করে তিয়া লাফ দিল। তারপর শ্যামকে জড়িয়ে ধরে তিনপাকে নেচে নিল, 'উঃ, কি ভাল, কি ভাল।'

শ্যাম গদগদ গলায় বলল, 'তুমি সাত মাস গেইন করছ।'

'গ্র্যাণ্ড।' তিয়া শ্যামকে আদর করল, 'সাত মাসে বাচ্চাটাকে আরও অভিজ্ঞ করা যাবে। ওর জীবন সাত মাস বেড়ে গেল।'

এই সময় টেলিফোন বাজতেই শ্যাম সেটা ধরে বলল, 'তোমার মা।'

কর্ডলেস রিসিভার তুলে তিয়া জিজ্ঞাসা কীরল, 'শুনেছ?'

'শুনছি। কি হবে রে!'

'কি আর হবে! বাঁচা গেল। তোমার কষ্টটা আমাকে ভোগ করতে হবে না।'

'দূর। তাড়াহুড়ো করে তিন মাসে নিয়ে এল, হাত পা না হয় ডেভলপ্ করালো কিন্তু ব্রেন? ওইটে তো আসল। পরে ক্যাবলা হয়ে রইল। তুই বরং একটু অপেক্ষা কর। ধর, বছর তিনেক। বাচ্চাগুলো জন্মাক, কি হয় দ্যাখ, তারপর বুঝে-সুঝে সিদ্ধান্ত নিস। বুঝলি?'

'মা, তুমি এখনও প্রাগৈতিহাসিক রয়ে গেলে।'

'শ্যামু কি বলছে?' মায়ের গলা পাল্টে গেল।

'ওর মন খারাপ ছিল বারো ঘণ্টা। এখন ঠিক হয়ে গিয়েছে।'

কলকাতা শহরে এখন আটটা স্পার্ম ব্যাঙ্ক আছে। ওরা পরদিন বিকেলে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে গেল। সুবিধে হল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কম্প্যুটারে অন্যান্য ব্যাঙ্কের স্টকের বিবরণ দিয়ে দেয়। সাধারণত তিন মাসের বেশি ব্যাঙ্ক ওগুলো প্রিজার্ভ করবে না। কি ধরনের মানুষ, তাদের জীবন এবং কাজ কিরকম ছিল তা পর্দায় দেখানো হচ্ছে। আরও কয়েকজন মহিলা রয়েছেন সেখানে। ওরা দুজনে বসে পড়ল। বিভিন্ন মানুষের স্তর অনুযায়ী দাম ঠিক করা আছে। কোনটাই পছন্দ হচ্ছিল না ওদের। এই শহরে সবচেয়ে বড় যিনি বিজ্ঞানবিদ্ তিনি দৃষ্টিশক্তি খারাপ হলে চশমা

অথবা কণ্ট্যাক্ট লেন্স ছাড়াই শুধু একটি প্রত্যহসেব্য ট্যাবলেটের মাধ্যমে দৈনিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন। এঁকে পছন্দ হল না তিয়ার। তারপরে যার ছবি ফুটে উঠল তাকে দেখেই এক মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি একেই চাই।'

সেলসম্যান আঁতকে উঠল, 'কি বলছেন ম্যাডাম? এই লোকটা খুনী!'

'আপনারা রেখেছেন কেন?'

'স্রেফ মজা করার জন্যে। গতমাসে ওর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে।'

'জানি। কিন্তু আমি ওরটাই চাই।' মহিলা শক্ত গলায় বললেন।

'কিন্তু ম্যাডাম্ আপনার সন্তান খুনী হতে পারে!'

'আমি তো তাই চাইছি।' মহিলা হাসলেন।

তিয়া আর শ্যাম বেরিয়ে এল বিরক্ত হয়ে। পর পর তিনদিন ওরা ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখল, যদি নতুন কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কোন আশাও পাওয়া গেল না, যা তিয়াকে উজ্জীবিত করতে পারে। সে রেগে-মেগে বলল, 'যাচ্ছেতাই শহর এই কলকাতা।'

মাথা নাড়ল শ্যাম, 'ঠিক বলেছ। প্রতিভাবান মানুষের বড় অভাব।'

সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখল তিয়া। ঘুম ভাঙামাত্র সে সরকারি মনোবিজ্ঞান দপ্তরে টেলিফোন করল। আধঘণ্টার মধ্যে কর্মীরা এসে গেলেন। তিয়াকে ওদের বাড়িরই একটা সাদা দেওয়ালওয়ালা ঘরে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার করে দেওয়া হল। তার আগে সম্মোহন শক্তি ইলেকট্রিক চার্জারের মাধ্যমে তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে চৈতন্য স্তিমিত এবং মানসিক অবস্থা রি-উইণ্ড করা শুরু হল। বিজ্ঞানীরা এইটুকুই করতে পেরেছেন। স্বপ্ন দেখার সময় কিছু করা সম্ভব হয়নি, তার চার ঘণ্টার মধ্যে সেই দেখা অংশটিকে মনের মধ্যে থেকে তুলে এনে দ্বিতীয়বার দেখার কায়দা এখন করায়ত্ত। ফলে ঘুমন্ত অবস্থার স্বপ্ন জেগে উঠেও দিব্যি দেখা যাচ্ছে। অতএব সামনের সাদা দেওয়ালে স্বপ্নের ছবি পড়ল। একটা সুন্দর মেয়ের গা ঘেঁষে একদল বক উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের কেউ ডিম পাড়ল। ডিম মাটির দিকে দ্রুত পতিত হচ্ছিল। কিন্তু মাঝপথে সেটি ফেটে গেল এবং তার শাবক শূন্যে ডিগবাজি খেয়েই পাখা নাড়তে পাড়তে পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করল। এই হল স্বপ্ন।

স্বপ্নটা ভিডিও রেকর্ডারে ধরে তিয়াকে পূর্ণ চৈতন্যে ফিরিয়ে এনে দেখানো হল। এবার ব্যাখ্যা দেওয়া হল, তিয়া মা হতে চাইছে। সাম্প্রতিক আবিষ্কারের সুযোগ নিয়ে খুব অল্প সময়ে মা হতে চায় সে। এবং তার সন্তান অত্যন্ত দ্রুত গতিময় হোক এই বাসনা।

ব্যাখ্যা শুনে তিয়া খুব খুশি হল। একা হওয়ামাত্র সে শ্যামকে বলল, 'অ্যাই শোন, তুমি যোশেফকে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট চাও।'

'কোন যোশেফ?' বুঝতে অসুবিধে হল শ্যামের।

'আঃ। তোমার মাথা এত ভাল হয়ে যাচ্ছে! এখন অমি যোশেফ পয়টার ছাড়া আর কারো কারো কথা ভাবতে পারি? ভদ্রলোকের গায়ের রঙ ব্রাউন হলেও কি ছিপছিপে শরীর। আর মেধা? ভাবতেই পারা যায় না।' তিয়া চোখ বুজল।

দুদিন বাদে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া গেল। এখন কলকাতা থেকে নিউইয়র্ক পৌঁছতে মাত্র আট ঘণ্টা সময় লাগে। উনি অবশ্য থাকেন মায়ামির কাছে। ওরা সেখানে পৌঁছে সোজা বিচে চলে এল।

কয়েক শ' নারী পুরুষ প্রায় জন্মদিনের পোশাকে সূর্যের সমস্ত উত্তাপ শরীর দিয়ে শুষে নিচ্ছে। সেদিকে এক পলক তাকিয়েই তিয়া ঠোঁট ওল্টালো, 'বিজ্ঞান এত উন্নতি করছে অথচ মানুষের মনে প্রিমিটিভ নেচার রয়েই গেল।'

'প্রিমিটিভ?' শ্যাম জানতে চাইল।

'নয়তো কি? জন্তু-জানোয়ারের মত শুয়ে থাকা। ভাবডেবিয়ে দেখো না হাঁদারাম! পিত্তি জ্বলে যায়!'

শ্যাম বালিতে চোখ রাখল। রেগে গেলে তিয়া টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরির কিছু নির্বাচিত শব্দ ব্যবহার করে। এগুলো ও পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে, তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে! একটা সংস্কৃতির মত যুগ যুগ ধরে এইভাবে বেঁচে আছে।

যোশেফ পয়টারের নাম এখন মুখে মুখে। ওরা জানতে পারল বিয়ের আগে নাকি যোশেফের স্ত্রী মার্থা বেশি সম্ভাবনাময় ছিলেন বিজ্ঞানবিদ্ হিসেবে। যোশেফকে সাহায্য করার জন্যে নাকি তিনি নিজেকে পর্দার আড়ালে রেখেছেন। তিয়া শ্যামকে বলল, 'শুনে রাখ। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।'

সমুদ্রের ধারে খানিকটা ঘেরা জায়গায় যোশেফ পয়টারের বাড়ি। মূল দরজার বেল বাজাতে লাগল শ্যাম। মিনিট তিনেকেও কারও সাড়া নেই। হঠাৎ ওপরের ঘরের জানলা খুলে এক ভদ্রমহিলা, তাঁর কালো মুখে বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'কাকে চাই?'

শ্যাম মিনমিন করল, 'মিস্টার পয়টার।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?' খেঁকিয়ে উঠলেন মহিলা।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কানের মাথা খেয়ে... বন্ধ ঘর থেকে আমি শুনতে পাচ্ছি আর উনি বাগানে বসে শুনতে পাচ্ছেন না। বাঁ-দিকের দরজাটা ঠেলে ভেতরে চলে যান।' দড়াম করে জানলা বন্ধ হল।

খিড়কি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে কিছুটা হাঁটতেই দেখতে পেল একজন মধ্যবয়স্ক ছিপছিপে মানুষ খুরপি দিয়ে বালি খুঁড়ছেন। ওদের দেখতে পেয়ে উঠে এলেন তিনি। তিয়া চাপা গলায় বলল, 'দারুণ।'

আলাপ হবার পর তিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মত এত বড় একজন মানুষ এসব ঘরোয়া কাজ করছেন?'

যোশেফ হাসলেন, 'আর বলবেন না। তিন তিনটে রোবটকে আমার স্ত্রীর জ্বালায় সরিয়ে দিতে হয়েছিল। এখন বাড়িতে কাজের রোবট নেই।'

'কেন? উনি কি রোবট পছন্দ করেন না?' তিয়া অবাক।

'বরং উল্টো। উনি বড্ড বেশি পছন্দ করেন। তবে তাদের কাজ করতে দেননি। তিনি তাদের বুকে হৃদয় ঢোকাবার চেষ্টা করছেন।'

'বাঃ।' উৎফুল্ল হল শ্যাম।

'আপনি বাঃ বললেন?' বিরক্ত হলেন যোশেফ, 'রোবটেরা যদি মন পায় তাহলে কি আর আমাদের কথা শুনবে? নিজেদের নির্যাতিত ভাববে। আর তারপরেই ইউনিয়ন, বিংশ শতাব্দীর ব্যাপার আমদানি করবে। আমি তাই এ-বাড়িতে রোবট ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছি। যন্ত্র যন্ত্র আর মানুষ মানুষই।'

তিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ছেলেমেয়ে?'

'নাঃ, নেই। আমার শারীরিক কিছু বিচ্যুতি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' যোশেফ যেন এক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

'কিন্তু আপনার স্ত্রী তো মা হতে পারেন।' শ্যামকে খুব উজ্জীবিত দেখাল।

মাথা নাড়লেন যোশেফ, 'পাচ্ছি না। খুবই দুঃখের ব্যাপার কিন্তু ঘটনাটা তাই। আমরা দু'জনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের সন্তান খুব সহজ সরল সাধারণ হবে। সে তার নিজের মত বড় হবে। আমাদের জটিলতা রক্তে নিয়ে সে পৃথিবীতে আসবে না। ব্যাঙ্কে গেলে আপনি জটিল মানুষের স্পার্ম পাবেন। তাঁরা আর যাই হোন সরল হবেন না। গত বছর আফ্রিকায় গিয়েও আমরা সহজ মানুষ খুঁজে পাইনি। একটাও মানুষ পেলাম না যে জটিলতার বাইরে আছে। খুব স্যাড ব্যাপার।'

'আপনি সহজ সরল খুঁজছেন কেন?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল তিয়া।

'দেখুন, এখন মাতৃগর্ভে থাকার সময় তিন মাস। ফলে জন্মানোর পরেই ওরা বেশি সময় পাবে নিজেকে গড়ার। সহজ সরল মানুষ তার স্বাভাবিক প্রকৃতিতে পথ খুঁজে নেবে। আমার বা কোন ডাক্তারের সন্তান একটি বিশেষ খাতে চলবে। যাক, আমার কাছে আপনাদের আসার কারণ জানতে পারি?'

এবার শ্যাম বলল, 'ওঁর সাধ ছিল খুব বড় বিজ্ঞানবিদ্‌-এর সাহায্যে মা হতে।'।

এই সময় ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল। নারীকণ্ঠের।

আতঙ্কিত যোশেফ দৌড়ালেন। পেছন পেছন ওরা। দেখা গেল মিসেস পয়টার লাফাতে লাফাতে একটি বন্ধ ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসছেন। স্বামীকে দেখামাত্র তিনি চেঁচিয়ে উঠে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন, 'আমি পেরেছি, পেরেছি।'

'কি পেরেছ?'

'রোবট!'

'মানে? তুমি রোবট নিয়ে এসেছ?' খেপে গেলেন যোশেফ।

'হ্যাঁ! তুমি যখন বাইরে গিয়েছিলে।'

'তুমি, তুমি আমার অনুরোধ রাখলে না মার্থা?'

'তুমি যে পরীক্ষায় আপত্তি করেছ তা কি আমি করতে পারি?'

'ও।' যোশেফ হাসতে চেষ্টা করেন। 'থ্যাঙ্ক ইউ! কিন্তু—?'

'আমি ওকে পুরুষ করেছি। ও একটা মানুষের মত, সেই প্রিমিটিভ মানুষের মত, সরল বাচ্চার বাবা হতে পারবে।' মিসেস পয়টার বলামাত্র যোশেফ তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর করে ছুটলেন টেলিফোনে খবর দিতে। মানুষের সৃষ্ট রোবট সরল মানুষের জন্ম দিতে পারবে। বিরাট আবিষ্কার।

তিয়া শ্যামের হাত ধরে টানল, 'অ্যাই, চল।'

'যাবে? মানে—।' শ্যাম অবাক।

'ডাকছি, চল।' গম্ভীর মুখে বলল তিয়া।

'কিন্তু রোবটটাকে দেখবে না?'

'রক্তমাংসের থাকতে আমি যন্ত্রের দিকে হাত বাড়াব কেন? এসো।' তিয়ার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল শ্যাম।

শে ষ ঘ ণ্টা বে জে গে ল

যিনি বলেছিলেন লাবণ্য না থাকলে সৌন্দর্য পূর্ণতা পায় না, তিনি একটু কম জানতেন। কুন্তী সুন্দরী একথা ওঁর কুকুর মদনও জানে। কুন্তী যে লাবণ্যবতী তা আয়নাগুলো সোচ্চারে জানিয়ে দেয়। আর এরকম সুন্দরী লাবণ্যবতী এই শহরে অন্তত আট হাজার একুশজন আছেন অথবা থাকতে পারেন। তবে কিনা ওইসব রূপসীদের অধিকাংশই বোকা বোকা অথবা স্বার্থপর। আর সেই স্বার্থপরতা আড়াল করার কোনও কায়দাও তাঁদের জানা নেই। কুন্তী এই ভিড় থেকে অনেক দূরের। তাঁর সৌন্দর্য আছে, লাবণ্য তো আছেই, সেই সঙ্গে জড়িয়ে আছে অহংকারের হালকা প্রলেপ। আর এটাই তাঁকে একদম আলাদা করে রেখেছে মিছিল থেকে।

অহংকার মানেই সবজান্তাপনা নয়, নাক তোলা কিন্তু আকাশে রেখে দেওয়া নয়। ওঁর অহংকার একটা হালকা পারফিউমের মতো, শরীর জড়িয়ে থাকে কিন্তু ঠিক কোনখানে তার উৎস সেটা টের পাওয়া যায় না। সেই রসজ্ঞের দুর্ভাগ্য যিনি কুন্তীকে দ্যাখেননি।

এখন কুন্তী পঁয়তাল্লিশ। ফিল্মস্টাররা যে বয়সটায় পৌঁছলে আর আড়াল খোঁজার চেষ্টা করেন না, সেই বয়স। যে বয়সের মহিলাকে এককালে বৃদ্ধা বলা হত, দু'দশক আগে প্রৌঢ়া বলে চিহ্নিত করা হত-সেই বয়সে পৌঁছনো কুন্তীকে দেখে শ্বাস ভারী হয়, এই যা। চট করে যুবতী বলতে নিশ্চয়ই বাধবে কিন্তু প্রৌঢ়া কিংবা বৃদ্ধা নয়, বাংলার এর কোনও সঠিক শব্দ না থাকার জন্যে আফসোস হবে। কুন্তী নিজের পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি শরীরটাকে যত্নে রেখেছেন।

একটুও ধুলো নয়, আগাছা জন্মাতে দেবার সুযোগই নেই, সার এবং জলের সঙ্গে যত্ন সর্বত্র ছড়ানো। আর এই কারণেই সমবয়স্কাদের সঙ্গ কুন্তী এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন।

খামোকা কোনও নারীকে ঈর্ষান্বিত করে কষ্ট দিয়ে কোন লাভ নেই। পৃথিবীতে যে যার মতো থাকুক।

কুন্তীর ভোর হয় ভোর হবার অনেক আগে। তখনও তাঁর এই আট তলার ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে কলকাতাকে ভুতুড়ে দেখায়। সারা রাত জ্বলে থাকা আলোগুলো নিভে যাওয়ার জন্যে ছটফটিয়ে মরে। সেই আলো না মরা ভোরেই কুন্তী হাঁটতে বের হন। শার্ট প্যান্ট জুতো পরে লিফট চালিয়ে নীচে নামতেই দারোয়ান সেলাম করে গেট খুলে দেয়। গুরুসদয় রোড ধরে বালিগঞ্জ সার্কুলারে পড়ে চক্কর দিয়ে ফিরে আসাটা এখন অঙ্কের মতো হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম সময় কমানোর চেষ্টা করতেন রোজ। এখন করেন না। দু-একবার

হঠাৎ উৎসাহী কোনও পুরুষ তাঁকে বিরক্ত করলেও বৃষ্টি না হলে এইভাবে হেঁটে যাওয়া থেকে তিনি বিরত হননি।

মাটিতে রোদ নামার আগেই ফ্ল্যাটে ফিরে আসা, একটু বিশ্রাম। তারপর মিনিট পনেরো আসন। প্রতিদিন আসন করার সময় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো জানিয়ে দেয়, আমরা ঠিক আছি, ঠিক আছি। আর সেটা জানতে পারলেই মন ভাল হয়ে যায়। তারপর স্নান, বেশ সময় নিয়ে আরাম করে। বিন্তি লেবু চা আর সেঁকা পাঁউরুটি এনে দেয় খবরের কাগজের সঙ্গে। সকাল আটটা পর্যন্ত কুন্তী টেলিফোন ধরেন না।

এই ফ্ল্যাটটিতে কুন্তীর সারা সময়ের সঙ্গী বিন্তি। মাত্র সতের বছর বয়সে বিন্তির ইউটেরাসে টিউমার হবার জন্যে ওটাকে বাদ দিতে হয়েছিল। এ জীবনে আর মা হতে পারবে না বলে ও বিয়ে করেনি। সঠিকভাবে বলতে গেলে কেউ বিয়ে করতে চায়নি। এ ব্যাপারে বিন্তিরও রাখঢাক নেই। চেহারা পত্তর ভাল বলে যে সব পুরুষ বিন্তির দিকে এগোয় তাদের সে সাফ বলে দেয় তার অঙ্গ-হানির কথা। বিন্তির এখনও ধারণা পুরুষরা মেয়েদের কামনা করে শুধু সন্তানের বাবা হবে বলে।

কুন্তীর কাছ থেকে এই ব্যাপারটাকে ঘেন্না করতে শিখে গিয়েছে সে। তার শিক্ষায় এমন অনেক কিছু ব্যাপার ঢুকে গিয়েছে যে যার ফলে অন্য কারও বাড়িতে কাজ করা সম্ভব নয়।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এবাড়িতে কাজের লোক কখনই বঞ্চিত হয় না। কিন্তু কী খাওয়া-দাওয়া? কুন্তী লাঞ্চ করেন অফিসে। বাড়ি থেকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঠিক নটায় বেরিয়ে যান। সেই ব্রেকফাস্টে থাকে একটা ডিমের পোচ আর দুটো ফল। লাঞ্চে একটা চিকেন স্টু-ই তাঁর কাছে আসে। ছুটির দিনে একরাশ স্যালাড, চার চামচ ভাত, দু-টুকরো মাছ অথবা মাংস এবং ফল। রাত্রে ফলটা বাদ যায়, বদলে আসে সেঁকা মাংস। এই খেয়ে খেয়ে বিন্তিরও অভ্যেস তৈরি হয়ে গেছে। কুন্তীর কাছে সে জেনেছে বাঙালিরা অপ্রয়োজনে বেশি খায়।

শরীরে যা প্রয়োজন তার বহুগুণ জিভের আরামের জন্যে ভেতরে ঠেসে দেওয়া হয়। বিন্তি সেটা এখন ভাল করে বুঝে গেছে। এই ফ্ল্যাট বাড়ির অন্য যে কোনও কাজের লোকের চেয়ে তার ফিগার ঢের ঢের ভাল। কুন্তী বাড়িতে যখন থাকেন না তখন তার সময় চমৎকার কাটে টিভির সামনে বসে। কেব্‌লে সিনেমা তো আছেই, বিবিসি, স্টার টিভির খুঁটিনাটি এখন তার মুখস্থ। আর এসব কারণেই ডায়মণ্ডহারবারের গ্রামের বাড়িতে যেতে হলে দিনে দিনে ফিরে আসে সে।

এই হল কুন্তীর সংসার। সারাদিন একরকম, সন্ধের পর একটু আলাদা। অন্তত বিন্তির চোখে তো তাই। বাড়ি ফিরে স্নান সেরে এক কাপ লেবু-চা আর চিকেন স্যাণ্ডুইচ খেয়ে কুন্তী কোনদিন টিভির সামনে বসলেন অথবা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টালেন। বন্ধুরা কেউ এলে টেবিল সাজানো হয়। সেইরাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে বিন্তি। দিদিমণির আড্ডা ভাঙতে কখনও বারোটা অথবা কাছাকাছি। কেউ না এলে ঠিক দু-গ্লাস মদ্যপান করেন কুন্তী। বিন্তির

প্রথম প্রথম পছন্দ হত না, এখন আর কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। এক দুপুরে একলা বাড়িতে সে জিভে ঠেকিয়ে অবাক হয়েছিল। এমন বিশ্রী গন্ধওয়ালা জিনিস মানুষ কী করে আনন্দের সঙ্গে খায়!

আজ সকাল থেকেই ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। দিনটা ছুটির বলেই মনে আলস্য এল। ব্যালকনির বেতের চেয়ারে বসে খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে চোখ থেকে চশমা সরাল কুন্তী। প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ! সামনের আকাশে ময়লাটে মেঘের ভিড়। হঠাৎই নিজেকে নিঃসঙ্গ বলে মনে হতে লাগল তাঁর।

পৃথিবীতে একটা কাছের মানুষ নেই যাকে বলা যায় দ্যাখো তো আমার পিঠে কী হয়েছে?

বিন্তি আছে অবশ্য। কিন্তু এই একাকিত্ব বিন্তিকে দিয়ে পূর্ণ হবে না কোনওদিন।

একজন পূর্ণ পুরুষের জন্যে প্রচণ্ড টান অনুভব করলেন তিনি।

বাইশ বছর বয়সে মৃণালের সঙ্গে ভালবাসা এবং বিয়ে। ভাবপ্রবণতার বেলুনে সমস্ত পৃথিবী তখন আড়ালে। মা বাবা বাধা দেননি। বস্তুত ওঁরা কখনই কুন্তীর কোনও কাজে বাধা দেননি। কিন্তু তিনবছর যেতে না যেতেই মৃণালের চরিত্রের অনেক অসংগতি তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। ওর কোনও সমস্যা নিয়ে জানতে চাইলে বিরক্ত হয়ে বলত, এসব তুমি বুঝবে না। মুখে না বললেও বুঝিয়ে দিত মহিলাদের সম্পর্কে তার ধারণা কী! তখন চাকরি করতেন না কুন্তী। আর না চাইলে টাকা দিত না মৃণাল। টাকার জন্যে হাত পাততে পারতেন না কুন্তী। মৃণালের কিছু বন্ধুবান্ধব এমন বোকা বোকা কথা বলত যে প্রকাশ্যেই তাদের সমালোচনা করতেন তিনি।

এইসব ব্যবধান বাড়তে বাড়তে একসময় বাক্যালাপ বন্ধ হল। তারপর আলাদা হয়ে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত ডিভোর্স। এখন এতদিন বাদে মৃণাল সম্পর্কে তাঁব কোনও স্পষ্ট ভাবনা নেই। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রথম পুরুষ। শরীরের আনন্দ নিয়ে কথা উঠলেই তাই মৃণালের কথা মনে পড়ে।

তিরিশে পৌঁছে রঙ্গন হল। এতদিনে জীবন পাল্টে গিয়েছে অনেক। ছেলে বন্ধু ছিল কয়েকজন কিন্তু রঙ্গন এসে সবাইকে আড়াল করে দিল। রঙ্গন কম কথা বলে এবং মেয়েদের স্বাধীনতায় হাত দেয় না। সে ব্যবসায়ী। বিদেশ থেকে মুদ্রা আসায় ভারত সরকারের প্রিয় পাত্র। সকালে ইচ্ছে হলে দুপুরেই দিল্লি হয়ে সিমলা চলে যেতে পারে।

একটু আনপ্রেডিকটেবল, কিন্তু রঙ্গনকে স্বামী হিসেবে পেয়ে ভাল লেগেছিল কুন্তীর।

মদ্যপানের অভ্যেসটা রঙ্গনের কাছ থেকে পাওয়া। ফাইভ স্টারের মেনুকার্ড যার মুখস্থ সে এক রবিবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল বনগাঁর দিকে। ঝাঁ ঝাঁ রোদে গ্রামের একটা মেঠো দোকানে ভাত ডাল তরকারি খেল শালপাতায়, কুন্তীকেও খেতে হয়েছিল বলা ঠিক হবে না, কুন্তী নিজেই খেয়েছিল। রঙ্গন বলেছিলে, ইচ্ছে না হলে খেয়ো না, গাড়িতে পার্কস্ট্রিটের খাবার আছে। রঙ্গনকে রোমান্টিক বলা যায় যদি কেউ তার সঙ্গে জীবন-যাপন করে। কিন্তু ক্লাবে,

পার্টিতে সে গম্ভীর, উদাসী। বাড়িতে গেস্ট এলে কিছুক্ষণ বাদে হাই তুলে ঘুমোতে চলে যায়। আবার সকালে উঠেই পাশপোর্ট নিয়ে ভিসা করতে ছুটে যায় নায়াগ্রার রামধনু দেখবে বলে। রঙ্গন তাঁকে অনেক দিয়েছে। এই বিত্ত, কর্তৃত্ব, বিশাল ব্যবসা এবং জয়তীকে। তের বছরের জয়তী শান্তিনিকেতনে পড়ছে। মায়ের চেহারা আর বাপের স্বভাব পেয়েছে।

জয়তীর যখন চার আর কুন্তীর ছত্রিশ তখন আটত্রিশ বছরের রঙ্গন এক সকাল বেলায় ঘুরে আসছি বলে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং আর ফেরেনি। যাওয়ার সময় ও পার্সটাও নিয়ে যায়নি। সাত লক্ষ টাকা যে আয়কর দেয় তার পরনে ছিল পাজামা এবং পাঞ্জাবি। যত রকমের খোঁজ খবর সম্ভব সব বিফলে গিয়েছে, পুলিশ শেষপর্যন্ত হার মেনেছে, মানুষটা উধাও তো উধাও। কেন রঙ্গন এভাবে না জানিয়ে চলে গেল তার উত্তর আজও পাননি কুন্তী।

সত্যি কথাটা হল, রঙ্গনের অভাব তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না এখন। ব্যাপারটা মনে এলে জ্বালা আসে। কতখানি স্বার্থপর হলে মানুষ এইভাবে চলে যেতে পারে। তাঁকে তো বটেই মেয়েকেও এক ফোঁটা গুরুত্ব দিতে চায়নি রঙ্গন। টেবিল, চেয়ার, খাট, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, শেয়ার, ইউনিট ট্রাস্ট অথবা ব্যবসার মতো তাঁদেরও ফেলে যেতে পেরেছিল অনায়াসে। সবচেয়ে আফসোস হয় যখন মনে পড়ে চলে যাওয়ার ঠিক আগের রাত্রে চূড়ান্ত মদ্যপান করে শরীরের আনন্দ খুঁজতে চেয়েছিল রঙ্গন। ও ব্যাপারে সে কখনই দক্ষ ছিল না, সেই রাত্রেও আলাদা কিছু হয়নি। আর পরদিন সকালে চা খেয়ে কাগজ পড়ে লোকটা চলে গেল। কেউ কেউ সন্দেহ করেছিল এর পেছনে কোনও অপরাধচক্র আছে, কিন্তু সেটা প্রমাণিত হয়নি, কেউ বলেছে রঙ্গন সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, সেটাও একধরনের সান্ত্বনা।

কিন্তু রঙ্গনের কথা মনে এলে অপমানবোধ আসে। কুন্তী এটা এড়াতে পারেন না। ন'টা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। মাঝে মাঝে একাকিত্ব প্রবল হলে বাঁধ ভাঙার বাসনা হয়। রঙ্গনের উধাও হওয়ার পরবর্তী পর্যায় নিয়ে আইনজ্ঞরা তাঁকে সুপরামর্শ দিয়েছেন। সেগুলো ঠিকঠাক মানতে গিয়ে তাঁকে সংযত থাকতেই হয়েছে।

কুন্তী উঠলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল দিন গড়ালে মেঘের দুপুর এলে যন্ত্রণা তীব্রতর হবে।

এইসময় কেউ যদি তাঁকে সঙ্গ দিত! কাকে বলা যায়! চোখের সামনে পরিচিতি পুরুষদের মুখ ভাসল। এদের বেশিরভাগই বিবাহিত।

বিবাহিত অথচ কুন্তী সম্পর্কে আগ্রহী। এদের কেউ কেউ বিদ্বান, স্মার্ট, অর্থবান অথচ কুন্তীর সামনে এলেই মদনের মতো লেজ নাড়তে থাকে। বোকা বোকা স্বভাবের পুরুষদের তিনি দুচক্ষে দেখতে পারেন না। আবার কেউ কেউ অতিরিক্ত স্মার্ট। মেয়েদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে শরীরে মেদ জমতে দেন না। এই ওপর চালাক লোকগুলো কাছে এলেই তাঁর অ্যালার্জি হয়। ওদের ভেতরের ফাঁপা বেলুনটাতে পিন ফুটিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। তৃতীয় দলের পুরুষরা আসেন গম্ভীর মুখে। হুঁ হ্যাঁ ছাড়া শব্দ বাড়ান না। যেন এই পৃথিবীর সব কিছু তাঁরা জেনে বসে আছেন। এঁদের দেখতেই কেষ্ট বলে মনে হয়। আর নয় বছর ধরে এইসব থকথকে

কাদার মধ্যে পাঁকাল মাছ হয়ে বেঁচে থেকে তিনি যে বর্ম বানিয়ে ফেলেছেন তা হুট করে আজ খুলে ফেলবেন কী করে?

টেলিফোনটা বাজল। বিন্তি গিয়ে রিসিভার তুলল। কথাবার্তা বলে এসে জানাল, 'নাম বলল অণিমা, তোমার বন্ধু ছিল নাকি!'

অণিমা! কে অণিমা? হঠাৎ এক তরুণীর মুখ মনে এল। ফর্সা ঝকঝকে, চোখে চশমা। ওঁদের ক্লাসের প্রথম হওয়া মেয়ে। অণিমা সেন। সেনই তো। সে এতদিন পর হঠাৎ?

কুন্তী আবিষ্কার করলেন তাঁর খুব ভাল লাগছে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে বললেন, 'কুন্তী বলছি। আমি ঠিক—;' ইচ্ছে করেই থামলেন তিনি। ওপাশের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, 'কুন্তী, আমি অণিমা, আমরা একসঙ্গে পড়তাম প্রেসিডেন্সিতে। অনেককাল হয়ে গেল অবশ্য, চিনতে পারা যাচ্ছে কি?'

'ও ব্বাবা! তুমি!' কুন্তী এবার বোঝালেন তিনি চিনেছেন, 'কী খবর বল? হঠাৎ?'

'তেমন কিছু নয়। চৈতিকে মনে আছে? আমাদের সঙ্গে পড়ত, ইন্টার কলেজ ড্রামায় বেস্ট অ্যাকট্রেস হয়েছিল, হ্যাঁ, চৈতি বলেছিল তুমি নাকি এখন বিশাল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী। ক্ষমতায় থাকলে চাও বা না চাও লোকে তোমার নাম জানবেই। আমার এক দেওর সাংবাদিক। তাকে বলতে সে তোমার অফিস আর বাড়ির ফোন নম্বর এনে দিল।'

'ভদ্রলোকের নাম?'

'সর্বজিত সেন?'

কুন্তীর মনে পড়ল। খুব ঝকঝকে চেহারার মধ্য তিরিশের এক সাংবাদিক। অর্থনীতি নিয়ে ভাল কাজ করছেন। কয়েকবার লোকটাকে দেখেছে সে। দেখা অবধি! সাংবাদিকদের নিয়ে তাঁর কোনওকালে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সেই লোকটা অণিমার দেওর!

'তোমার দেওর দেখছি দারুণ করিৎকর্মা।'

'তা বলতে পার। ওয়াশিংটনে একটা বড় কাজের অফার পেয়েছে অথচ বলছে যাবে না। যাহোক, তুমি বিরক্ত হচ্ছ না তো?'

'বিন্দুমাত্র না। কী করছ এখন?'

'যা কপালে ছিল। ছাত্রী পড়াই আর সংসার চালাই। তোমার স্বামীর...।'

'ওটা এখন ইতিহাস।' ঝটপট থামিয়ে দিলেন কুন্তী।

'ও! আসলে আমি একটা মেয়েকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছি।'

'মেয়ে?'

'হ্যাঁ। বছর তিরিশ বয়স হবে। বেশি পড়াশুনাও নেই। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য ওর চাকরি দরকার। এখনই। কলেজে পড়ালে চাকরি দেবার ক্ষমতা থাকে না। তোমাকে যদি অনুরোধ করি তাহলে কি অন্যায় হবে?'

সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে গেলেন কুন্তী।

প্রয়োজন ছাড়া যে এই টেলিফোন নয় জানার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা শেষ হয়ে গেল। তিনি নিচু গলায় বললেন, 'আমার না বলা উচিত। চাকরি করার যোগ্যতা মেয়েটির আছে কিনা তাও যাচাই করার প্রয়োজন এই মুহূর্তে আমার নেই। কিন্তু তুমি বলেই সেটা বলতে বাধছে।'

'অনেক ধন্যবাদ ভাই। ওকে কবে পাঠাব?'

ঝুলিয়ে রেখে লাভ নেই। আজকের এই অলস দিনটার কিছু সময় না হয় অতীতের দায় মেটাতেই কাটুক। কুন্তী বললেন, 'আজই। দুপুরে।' বলে রিসিভার রেখে দিলেন। তাঁর মনমেজাজ আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

দশটা নাগাদ দ্বিতীয় টেলিফোন এল, 'কেমন আছ?'

কুন্তী কথা না বলে রিসিভার কানে ঠেকিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলেন। ওপাশে কিছুক্ষণ অপেক্ষা, তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'কথা বলতে ইচ্ছে না করলে রিসিভার নামিয়ে রাখতে পার!'

'আমি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম অজস্র কণ্ঠস্বরের থেকে তোমারটা কত আলাদা! হ্যাঁ, বল।

'ভাল নেই। একদম ভাল নেই।'

'কেন?'

'উত্তরটা বোকার মত শোনাবে। তোমার বউ কোথায়?'

'পাশের ঘরে।'

'ওকে নিয়ে চলে এসো এখানে।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন কুন্তী। এবং তারপরেই আবার ডায়াল করলেন। বেছে বেছে আরও তিনজন পুরুষকে আমন্ত্রণ জানালেন সস্ত্রীক তার ফ্ল্যাটে আসতে। শেষপর্যন্ত আয়নার সামনে বসে বিন্তিকে ডাকলেন, 'আজ একটু বেহিসাবি হব। তুমি বাজের যাও। ইলিশ মাছ নিয়ে এসো।'

'ইলিশ?' বিন্তির চোখ বড় হল। এতদিনে সে জেনেছ ইলিশ শরীরের কিছুই উপকার করে না, 'তুমি ইলিশ খাবে?'

'হ্যাঁ। একদিন না হয় খেলাম। অনেকটা আনবে। আরও আটজন খাবে। মাথা পিছু চার পাঁচ পিস। পেটি দেখে নেবে। আর খিচুড়ি বানাবে।'

'খিচুড়ি?' হাঁ হয়ে গেল বিন্তি এবং পরক্ষণেই বলল, 'আমি খাব না।'

'কেন?'

'এমনি।'

টাকা দেওয়াই থাকে। বিন্তি চলে গেলে নিজেকে সাজালেন কুন্তী। সাজতে বসলে তাঁর মন ভাল হয়ে যায়, আজও হল। বিন্তির কথা ভেবে তিনি হেসে ফেললেন। তাঁর এই বেহিসাবি খাওয়া মেয়েটা মানতে পারছে না।

একদিন তো!

সাজ শেষ হয়ে গেলে সেলারে গেলেন তিনি।

প্রচুর বিদেশি মদ থরে থরে সাজানো।

ভদকাও আছে। দুপুরে ভদকা এবং বিয়ার।

বিয়ারের বোতল আরও কয়েকটা আনানো উচিত। টাকা বের করে বাইরের ঘরে গিয়ে আবদুলকে হুকুমটা দিয়ে দিলেন। আবদুল রঙ্গনের আমলের কুক কাম বেয়ারা। এখন বৃদ্ধ কিন্তু মোগলাই রান্নার মাস্টার। কিন্তু এ বাড়িতে আজকাল ওকে রাঁধতে হয় না।

বারোটা নাগাদ অতিথিরা এসে গেল।

জোড়ায় জোড়ায়। দুপুর বলেই সবাই হালকা পোশাকে এসেছে। মহিলারা ফ্ল্যাটে ঢুকেই কুন্তীর প্রশংসায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর। কুন্তী যেন দুহাতে ফুল কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন অথচ মুখে নির্লিপ্তের হাসি ওঁদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছিল। ট্রলিতে ভদকা, বরফ জল এবং বোতলে বিয়ার। আবদুল পরিবেশন করে যাচ্ছে। বিত্তি ফিরে এসেছে দুজোড়া ইলিশ নিয়ে। বাইরে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি চলছে। এই সময় অমিত জানতে চাইল, 'এই হঠাৎ আমন্ত্রণের কারণ জানা যাক?'

সোফায় বসা কুন্তীর দুহাতে গ্লাস, মুখ ওপরে তোলা, ঠোঁটে ঈষৎ কুঞ্চন, 'এখন নয়, আরও পরে। তোমাদের ফিরে যাওয়ার আগে।'

এসব আড্ডা জমে গেলে হোস্ট এবং গেস্টের আলাদা কোনও ভূমিকা থাকে না। কিছুক্ষণ পরেই কুন্তী আলাদা হয়ে যেতে পারলেন।

ব্যালকনিতে দাঁড়িতে তিনি অতিথিদের দেখছিলেন। এই চারজন পুরুষই মোটামুটি সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী। কিন্তু এঁরা এমন অনেক ইঙ্গিত দিয়েছেন যাতে স্পষ্ট তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ অসীম। সঙ্গে স্ত্রী নিয়ে এসে এরা পোষমানা শেয়ালের মতো আচরণ করছে। অমিতকে তিনি স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পারতেন, আজ সকাল থেকে নিজেকে খুব একা লাগছিল। পেনফুল একাকিত্ব। মনে হচ্ছিল একজন পুরুষ মানুষকে সঙ্গী হিসেবে দরকার।

তোমাদের যে কোনও একজনকে একা ডাকলেই সেটা পেয়ে যেতাম। কিন্তু সেই পাওয়ায় চুরি-চুরি অনুভূতি। তোমরা মদ্যপান করো।

নেশা হোক। তারপর তোমাদের স্ত্রীদের সামনে যদি উত্তরটা ছুঁড়ে দিই তখন দেখতে হবে কী আচরণ করো। ওই দেখার জন্যেই এই আমন্ত্রণ।

দুপুর যখন মাঝপথে, বিয়ার এবং ভদকা যখন অনেকটাই পেটে তখন আবদুল এসে জানাল একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছে। আবদুলের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে কুন্তী তাতে অণিমার নাম পড়লেন। তাড়িয়ে দিতে গিয়েও পারলেন না। অতিথিদের কাছ থেকে কয়েক মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে তিনি ড্রইং রুমে চলে এলেন।

একটি কালো রোগা মেয়ে ছাপা শাড়িতে শরীর জড়িয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েটার মুখে একটা মিষ্টি ছাপ ছাড়া হাতে নিঃসঙ্গ শাঁখা দেখতে পাওয়া গেল। কুন্তীকে দেখা মানে যে দেবীদর্শনের কাছাকাছি তা ওর চাহনিতে বোঝা যাচ্ছিল। কুন্তী বললেন, 'ইয়েস!'

'দিদি টেলিফোনে—!'

'হুঁ? কতদূর পড়েছ?'

'স্কুল ফাইন্যাল।'

'কী চাকরি করবে? যে কোনও চাকরি করতে গেলে যে যোগ্যতা দরকার তা তোমার আছে?'

মেয়েটি মাথা নিচু করল।

টাইপ জানো? শর্টহ্যাণ্ড? তাহলে কী জানো?'

মেয়েটি চোখ তুলল, 'লিখতে পারি!'

'লিখতে পার? কী লেখা?'

'গল্প।'

'মাই গড! তুমি গল্প লেখ নাকি?' কুন্তী বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

'হ্যাঁ।'

'কাগজে ছাপা হয়?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি 'না। ওরা ফেরত দেয়।'

'কেন?'

'জানি না। কেউ বলে না তো কী হয়েছে। অবশ্য দিদি বলেছেন।'

'কী বলেছেন?'

'আমি নাকি পুরনো দিনের মতো গল্প লিখি। আসলে আমার বাবার দোকানে যে সব বই ছিল তাই পড়ে শিখেছি তো। তবে এখন নতুন দিনের মতো লিখব।'

'তোমার বাবার কিসের দোকান? বই-এর?'

'না, মুদির। ছোট দোকান'

'কোথায়?'

'বনগাঁয়।'

'আচ্ছা! তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

মাথা নিচু করল মেয়েটি, 'সোনারপুরে।'

'সেখানেই থাক?'

'না। বনগাঁয়।'

'কেন?'

চুপ করে রইল মেয়েটি!

কুন্তী বিরক্ত হল, 'দ্যাখো, তোমাকে দেবার মতো কোনও চাকরি আমার হাতে নেই। তুমি তোমার দিদিকে একথা বলবে।'

'আমি জানতাম।' বিড়বিড় করল মেয়েটি।

'তুমি জানতে একথা বলব?'

'হ্যাঁ, বড়লোকদের চরিত্র এমন হয়। গল্পে পড়েছি। লিখেছিও। কিন্তু বড়মহিলারা কি রকম হন তা জানতাম না। আপনি রাগ করবেন না, আমি আসি।'

'দাঁড়াও। তোমার তো সাহস কম নয়। অণিমার সঙ্গে কি করে আলাপ?'

'আমাদের গ্রামের এক মাসি ওঁর বাড়িতে কাজ করে। আমাদের গ্রামের সবাই জানে যে আমি লিখি। মাসি গিয়ে দিদিকে আমার কথা বলেছিল—।'

মেয়েটির গলার স্বরে চমৎকার দৃঢ়তা লক্ষ্য করলেন কুন্তী। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বনগাঁ থেকে এখানে আসছ আজ?'

'হ্যাঁ। দিদির বাড়িতে গিয়েছিলাম স্টেশনে নেমে।'

'কখন বেরিয়েছ বাড়ি থেকে?'

'ভোর পাঁচটায়।'

'কিছু খাওয়া হয়েছে?'

'না।'

'বসো।' হুকুম করলেন কুন্তী। মেয়েটি সঙ্কোচ নিয়ে বসল।

'পছন্দ করে বিয়ে করেছিলে?'

'অ্যাঁ ? না, না। পছন্দ করার মতো কোনও ছেলে আমাদের গ্রামে ছিল না। বাবা সম্বন্ধ ঠিক করতেন কিন্তু,' মেয়েটি থামল, 'আমি আমাকে নিয়েও একটা গল্প লিখেছি, জানেন?'

'সেটা কি ছাপা হয়েছে?'

'না। আমার হাতের লেখা ভাল। আপনি পড়বেন? না, আপনার সময়ই হবে না।'

'তোমার কাছে গল্পটা আছে?'

মেয়েটি ব্যাগ খুলে ভাঁজ করা কাজগগুলো দিল। প্রথম পাতায় লেখা, 'শবরীর প্রতীক্ষা', লেখিকা—নমিতা দেবী।

কুন্তী বিন্তিকে ডাকলেন। মেয়েটিকে কিছু খাবার দিতে বললেন। কিন্তু মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'না দিদি, আমার হাতে সময় নেই। এমনিতেই বৃষ্টি পড়ছে, কখন বাড়ি পৌঁছতে পারব জানি না।' আপনি এই ডাক টিকিট লাগানো খামটা রাখুন। পড়া হয়ে গেলে এই খামে লেখাটা ঢুকিয়ে পোস্টবক্সে ফেলে দেবেন। হ্যাঁ?'

কুন্তী কিছু বলতে পারলেন না। মেয়েটি একটা স্ট্যাম্প লাগানো খাম টেবিলে রেখে তাঁকে নমস্কার করে যাওয়ার সময় বলল, 'দিদি, একটা কথা বলব?'

'বলো?'

'আপনি না খুব সুন্দর। সিনেমার মতো সুন্দর। সিনেমায় নামেননি কেন?'

'নামলে উঠতে পারতাম না, তাই।'

'মানে?'

'তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে বললে না?'

মেয়েটি বুঝল। বুঝে চলে গেল।

হয়তো ওই লেখা, ওই কয়েকপাতার গল্প পড়তেন না কুন্তী, কিন্তু গোল বাধাল অমিত। ঘরে ফেরা মাত্র বলে বসল, 'কী ব্যাপার ভাই? আমাদের ঘরে বসিয়ে বাইরে কাকে সময় দিচ্ছিলে? মূল্যবান মানুষটি কে?'

কুন্তী না বললে সেটাই তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মানাত। কিন্তু বললেন, 'তিনি এক লেখিকা।'

'লেখিকা? কী নাম?' অমিতের স্ত্রী জয়ী জিজ্ঞাসা করল।

'নমিতা দেবী।'

ইন্দ্রজিত অবাক, 'নমিতা দেবী? নাম শুনিনি তো। আমি অবশ্য বাংলা সাহিত্যের খবর ঠিক রাখি না। তবে আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবীর নাম শুনেছি।'

শোভন বলল, 'ছেলেবেলায় মায়ের কাছে পত্রিকা দেখতাম। তখন দেবীদের লেখা ছাপা হত। এই নমিতা দেবীর নাম তখন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে ইন্দ্রজিত। কোথায় তিনি?'

'চলে গেছেন। যাওয়ার আগে এই গল্প দিয়ে গেছেন।' কুন্তী বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে হৈচৈ পড়ে গেল। হয়তো ভদকা কিংবা বিয়ারের প্রভাব অথবা আলোচনার নতুন কোনও বিষয় না থাকায় সবাই গল্প শুনতে চাইল। আর কুন্তীকেই সেটা পড়তে হবে।

এও এক মজা। কুন্তীর মনে হল স্কুলের স্পোর্টসে গো অ্যাজ ইউ লাইকের মতন ব্যাপারটা। সারাজীবন যা করব না তা একদিন টুক করে করে ফেলা।

সস্তায় কেনা কাগজ। লাইন টানা। হাতের লেখা গোটা গোটা। বোঝাই যায় যত্ন করে লেখা হয়েছে। আটটি মানুষ কুন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে। কুন্তী পড়া শুরু করলেন।

'আমার নাম শকুন্তলা। সে যুগের নয়, এ যুগের। এ রকম নাম কেন যে আমার রাখা হয়েছিল তা বাবা মাকে প্রশ্ন করেও জানতে পারিনি।'

'এক মিনিট।' ইন্দ্রজিত বাধা দিল।

'ভদ্রমহিলার নাম নমিতা না?'

জয়ী বিরক্ত হল, 'আঃ, লেখিকা কি নিজের নামে নায়িকার নাম লিখবে? দ্যাখো; পড়ার সময় কেউ কথা বলবে না।'

কুন্তী এগিয়ে দিলেন কাগজগুলো, 'জয়ী, তুমিই পড়ো।'

জয়ী খুশি হল। কুন্তী যেন রক্ষা পেলেন।

আমরা খুব গরীব। আমার বাবা একটা সাধারণ দোকান চালান গ্রামে। দিনে কিরকম বিক্রী হয় তা জানিনা। আমি কোনওমতে থার্ড ডিভিশনে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে বাড়িতে বসে ছিলাম। তবে ঠিক বসে থাকা বললে যা বোঝায় তা নয়। আমি রোজ চারপাতা লিখি। এটা আমার অনেকদিনের অভ্যেস।

আমি যে গল্প লিখি তা অনেকেই জানে। এমন কি আমাদের সবচেয়ে বুড়ি মানদাঠাকুমাও সেদিন বলেছিল তার গল্প আমাকে লিখতে হবে কিন্তু তার আগে বুড়ি মরে গেল।

আমি দেখতে ভাল নই। রোগা, কালো, স্বাস্থ্যটাস্থ নেই তবে হাইট আছে। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। আমি দেওয়ালে দাগ দিয়ে রেখেছি। সংসারের কাজ পারি, তবে করতে ইচ্ছে করেনা। বাবার দোকানে মাসিক পত্রিকাও বিক্রী হয়। কোনও মাসে সেটা না বিকোলে আমি নিয়ে আসি। গোগ্রাসে পড়ি আর তার ঠিকানায় লেখা পাঠাই। এসব করতেও পয়সা লাগে। বাবা দিতে চায় না বেশিরভাগ সময়।'

অমিত হাই তুলল, 'একটু বোরিং মনে হচ্ছে।'

জয়ী বলল, 'শাট আপ! কেমন সরল সরল কথাবার্তা—চুপ করে থাকো।'

'আমার বোঝা বাবা নামাতে চাইল। পাত্র পক্ষ আসে। জিজ্ঞাসা করে এটা পারি, ওটা পারি কিনা! আমি গান জানিনা, সেলাই জানিনা। রান্না একটু আধটু জানি আর জানি লিখতে।

অনুরূপা দেবী বা নিরুপমা দেবীর মত শকুন্তলা দেবীরও একদিন নাম হবে বলে আমার বিশ্বাস। আর লিখতে জানি শুনলেই পাত্রপক্ষের মুখ কেমন হয়ে যেত। তাঁরা অদ্ভুত চোখে তাকাতেন। ফিরে গিয়ে আর সাড়া দিতেন না। শেষপর্যন্ত বাবা আমাকে শাসালেন, কাউকে বলা চলবে না আমি লিখি। যেন লিখতে পারাটা পাপ। বাঙালি মেয়ের যেমন অনেক কিছু করা পাপ তেমনি লেখাও। আর এই করতে করতে সোনারপুরের হরিপদ বিশ্বাসের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। ছেলের বউদি এসেছিল দেখতে। বিধবা বউদি। বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে শুনে মা বিশ্বাস করতে চায়নি। লম্বা চওড়া, শরীর একটুও টসকায়নি। আমার মা ওঁর চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছিল না। ওঁর স্বামী মারা গেছে পনেরো বছর বয়সে। ষোলতে শাশুড়ির ছেলে হয়।

একবছরের ছেলেকে বিধবা বউমার কাছে রেখে তাঁরা গঙ্গাসাগর করতে গিয়েছিলেন আর ফেরেননি। নৌকোডুবি হয়েছিল। সেই থেকে ইনি একবছরের দেওরকে মানুষ করেছেন। বিয়ে থা করেননি। দেওরই ধ্যানজ্ঞান। বিষয় সম্পত্তি আছে। দেওরকে একটা স্টেশনারি দোকান করে দিয়েছেন।

আমাকে খুঁটিয়ে দেখলেন। সংসারের কাজ পারি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। গান জানি না সেলাই, নাচ জানি না আঁকা, এসব প্রশ্ন না করে ফস করে জিজ্ঞাসা করলেন আমার ভেতরের জামার সাইজ কি! ভয়ে ভয়ে বত্রিশ বলতে তিনি মাকে বললেন, 'আপনার মেয়েকে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। ওকে জা করে নিয়ে যাব।'

বাবা যা পারলেন দিলেন। বর এল বিয়ে করতে। স্বাস্থ্যবান যুবক। গায়ের রঙ কালো হলেও স্বভাব লাজুক। বাসর ঘরে একটিও কথা বলল না। সবাই যখন বিশ্রাম নিতে গেল তখন সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটা কথা বলব?'

তিনি বললেন, 'ইচ্ছে হলে বল।'

'আমি না লিখি। মানে গল্প-টল্প। বিয়ের পর লিখলে আপত্তি আছে?'

তিনি অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকালেন।

তারপর বললেন, 'সারাদিন রাত বসে থাকতে হবে। ঘরে বসে যা ইচ্ছে করতে পার। তবে মাসে দশটাকার বেশি হাত খরচ পাবে না এইটা মনে রেখ।'

সেই রাত্রে ওই অবধি। কিন্তু আমার চেয়ে সুখী বোধহয় পৃথিবীতে কোনও মেয়ে ছিল না। দশটাকায় যত কাগজ পাওয়া যাবে তা তো সারা মাসে লিখে ফুরোবে না।

শ্বশুর বাড়িতে এলাম। শ্বশুর শাশুড়ি নেই, বউদিই সব। ফুলশয্যার রাত্রে তিনি আমাকে বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলছি। হরিপদর শরীর ভাল নেই, ওকে বিরক্ত করবে না।'

মেয়ে হয়ে মানে বুঝতে পারব না তা কি করে হয়। রাত্রে তিনি যখন শুতে এলেন তখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'শরীরে কি হয়েছে?'

'কি হবে আবার? কিস্যু হয়নি। ঘুমাও।'

সকালে উঠেই তিনি বেরিয়ে যেতেন দোকানে। দুপুরে খেতে এলে বউদি যত্ন করে তাঁকে খাওয়াতেন। খেয়ে দেয়েই আবার দোকানে ছোটা। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। তখন স্নান শেষ করে রাত্রের খাওয়া খেয়ে নিয়ে সিগারেট খেতে বাইরে যেতেন। ফিরতেন কখন টের পেতাম না। এত ঘুম পেত যে জেগে থাকতে পারতাম না।

বিয়ে হল, শ্বশুর বাড়িতে এলাম কিন্তু যেসব ঘটনা এইসময় ঘটে তার কিছুই আমার ক্ষেত্রে ঘটল না। দ্বিরাগমনে গ্রামে ফিরে গেলে বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে কি জবাব দেব? এখন আমি সকালে উঠি। ঘর গোছাই। বউদির নির্দেশে রান্না করি। তারপর সারাদুপুর লিখি আর লিখি। দুপুরের পর বউদি সেজে গুজে বেরিয়ে যান, তখন একা। আর এই সময় পাশের বাড়ির বউটা আসে আমার কাছে। আমি লিখছি দেখে চোখ কপালে তোলে। আমার বিরক্ত লাগলেও কিছু বলি না। বউটা নানান কথা জানতে চায়। স্বামী আমাকে কীরকম আদর করে, তাও! ওসব ঘটনা ঘটেনি বলে দিয়েছিলাম। শুনে মুখ গম্ভীর করে বলেছিল, 'জানতাম।'

এসব চরিত্রের কথা আমি জানি। ঘর ভাঙ্গতে এদের জুড়ি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রও এঁদের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই রাত্রে মনে হল স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। তাঁর সত্যি হয়তো অসুখ আছে। অসুখটা কি? অসুখ থাকলে কেউ অত পরিশ্রম করতে পারে! তাহলে বউটাও বা বলবে কেন, জানতাম!

রাত্রে স্বামী এলেন। খাওয়া-দাওয়া হল। বউদি তাঁকে জানিয়ে দিলেন নিয়ম মানতে আগামীকাল আমাকে নিয়ে বনগাঁয়ে যেতে হবে দ্বিরাগমনে। তবে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেই হবে। রাত কাটাতে হবে না। স্বামী কিছু বললেন না।

স্বামী সিগারেট খেতে বাইরে গিয়েছেন। আমি আজ কিছুতেই ঘুমাবো না। আধঘণ্টা এক ঘণ্টা চলে গেল। রাত বাড়ছে। সব চুপচাপ। এখনও তিনি ফিরছেন না কেন? শেষ পর্যন্ত ওঁকে খুঁজতে বাইরে, বের হলাম। লম্বা বারান্দা। পরিষ্কার উঠোন। উঠোনে চাঁদের আলো। তিনি নেই। কোথাও। উঠোন পেরিয়ে দরজায় গেলাম। রাস্তা দেখা যাচ্ছে ছবির মত। এরকম বর্ণনা আমার একটা গল্পে আছে। তাঁকে দেখতে পেলাম না। হঠাৎ আমার ভয় করতে লাগল।

কিছু হয়নি তো তাঁর। মনে হল বউদিকে ব্যাপারটা জানাই। কিছু হলে তিনিই আমাকে দুষবেন না জানানোর জন্যে। বউদির ঘরটা ওপাশে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুঝলাম ওটা ভেতর থেকে বন্ধ নয়! ঠেলতেই পাল্লাদুটো খুলে গেল। আর আমি যেন অন্ধ হয়ে গেলাম। এক ছুটে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম। তারপর একটু সামলে উঠে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলাম। চোখের পাতায় দৃশ্যটা যেন এঁটে আছে। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছিল খাটে। বউদি এবং আমার স্বামী পরস্পরকে সাপের মত জড়িয়ে অদ্ভুত চাপা শব্দ করে যাচ্ছিলেন। মানুষ খুব যন্ত্রণা পেলে মুক্তির জন্যে এমন শব্দ করতে পারে! কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল ওই শব্দগুলো আমার বুকটাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। চোখ থেকে ঘুম উধাও। শরীর থেকে শক্তি। ওই ভাবে পড়ে থাকতে থাকতে একসময় টের পেলাম পাশের বিছানায় স্বামী এসে শুয়ে পড়লেন।

তারপর ভোর হল। সারারাত আমার ঘুম নেই। স্বামী জাগলেন এবং রোজকার মত বেরিয়ে গেলেন। আমি ঘর থেকে বের হচ্ছিলাম না। এমনকি কলতলাতেও নয়। বউদি এলেন, 'তৈরি হয়ে নাও।'

আমি মাথা নিচু করলাম।

তিনি কিছু ভাবলেন। তারপর এগিয়ে এসে খাটের পাশে দাঁড়ালেন 'আমার ঘরে শব্দ না করে ঢুকে তুমি অন্যায় করেছ।'

আমি কথা বললাম না।

'তোমাকে একটা কথা বলি। অল্প বয়সে বিধবা হবার পর অনেক প্রলোভন এসেছিল। শরীর আমার এমনিতেই পুরুষের মাথা ঘোরায়। কিন্তু আমি সংযত ছিলাম। কেউ আমার নামে কোনও দুর্নাম দিতে পারবে না। শরীরে ভরা যৌবন অথচ ব্যবহার করতে পারছি না। এ যে কী যন্ত্রণা তা আমিই জানি। তোমার স্বামী তখন ছোট। তাকে মানুষ করছি দরদ দিয়ে। আমি খাওয়ালে খাওয়া, শোওয়ালে শোওয়া। আস্তে আস্তে সে বড় হচ্ছিল। কিন্তু আমাকে ছেড়ে শুতে চাইত না। আমারও ভাল লাগত। সেই ভাবে কাটিয়ে কখন একদিন আমার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল আমি নিজেই জানিনা। তার কাছে আমিই সব। মা বল তো মা, সঙ্গিনী বল তো সঙ্গিনী। আমার কাছে ও যা পেয়েছে তা পৃথিবীর কোনও মেয়ে ওকে দিতে পারবে না।'

'তাহলে ওঁকে বিয়ে দিলেন কেন?'

'না দিয়ে পারিনি। সত্যি বলতে কি আমি দিতে চাইনি। কিন্তু পাড়ার লোকজন যে আমাদের সম্পর্কটাকে সন্দেহ করছে তা টের পেলাম। আমার বয়সের সঙ্গে মানিয়ে যদি শরীর ভাঙ্গত, চুল পাকত, তাহলে কেউ সন্দেহ করত না। তাই ঠিক করলাম ওর বিয়ে দেব। বিয়ে দেব এমন মেয়ের সঙ্গে যার শরীরে আকর্ষণ নেই। যার কোন গুণ নেই। অনেক খোঁজ করে তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। এমনিতেই তোমার বিয়ে হত না। এখন এখানে এসে

ভালই তো আছ। এইভাবেই সারাজীবন থাকতে পারবে যদি ইচ্ছে কর। আর কাল যা দেখেছ তা যদি কাউকে জানাও তাহলে নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারবে।'

উনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন তখন আমি কেঁদে ভাসাচ্ছিলাম। কান্না ছাড়া তখন আমার কিছুই করার ছিল না। উনি আমার পাশে বসলেন, 'এত কান্নাকাটির কি হয়েছে? ষোল থেকে তিরিশ আমি বঞ্চিত ছিলাম সেটা জানো? আর মেয়েদের ব্যাপারটা মেয়ে বলেই আমি জানি। সব মেয়ে এসবের জন্য কষ্ট পায় না। তোমার মত রোগা ছেলেছেলে মেয়ের তো কষ্ট হবার কথাই নয়। তুমি এখানে থাকো, খাওয়া-দাওয়া সাজগোজ সব কর, আমি আপত্তি করব না। তবে হ্যাঁ, তুমি নাকি কিসব লেখালেখি কর, এইসব কথা লেখা চলবে না বলে দিলাম।'

হুকুম হয়ে গেল। একটা লেখায় পড়েছিলাম রাজা ইচ্ছে হলে লেখকের লেখা বন্ধ করে দিতে পারতেন। লেখকের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করতেন। পরে সরকার সেই কাজ করেছেন, কিন্তু লেখকরা লেখা থামাননি। মনে মনে স্থির করলাম আমিও হার মানব না। আমার স্বামী আমাকে বনগাঁতে পৌঁছাতে এলেন। সারাপথে একটা কথা নয়। রওনা হতে দেরি হওয়ায় আমরা পৌঁছেছিলাম প্রায় বিকেল বিকেল। বাবা মা জোর করে তাঁকে ফিরতে দিলেন না তখনই। বললেন রাত কাটিয়ে যেতে হবে।

নিজেদের বাড়িতে এতকাল আমার আলাদা শোওয়ার ঘর ছিল না। আজ রাত্রে সেই ব্যবস্থা হল। রাত্রে তাঁর পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি করব?'

তিনি ঘুমবার চেষ্টা করছিলেন, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি?'

'আমাকে তোমার একটুও পছন্দ হয়নি, না?'

তিনি উত্তর দিলেন না। না দেওয়াটাই বড় উত্তর। পরদিন সকালেই ফিরে গেলেন কাজের চাপ দেখিয়ে। আমি থেকে গেলাম বাপের বাড়িতে।

দিন গেল। মাসও। সোনারপুর থেকে কেউ আমাকে নিতে আসে না। এমনকি একটা চিঠিও নয়। মা আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করে। আমি ভয় পেতাম সত্যি কথা বলতে। কিন্তু জানিনা জানিনা বলে আর কতদিন চাপা দিতে পারব। শেষ পর্যন্ত বলতে হল। মা পাথর হয়ে গেল! একি সম্ভব? মায়ের বয়সী মহিলার সঙ্গে? যার কাছে একমাস থেকে বড় হয়েছে তার সঙ্গেই শারীরিক সম্পর্ক? কিন্তু সত্যি যা তা চিরকালই সত্যি।

অথচ তার মধ্যেই আড়াল। মা বাবাকে এসব জানালেন না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে বনগাঁ থেকে চলে গেলেন সোনারপুরে। পাড়ার সবাই দেখল আমরা গেলাম এবং খানিক সময় বাদে ফিরে যাচ্ছিলাম। আমার চোখে জলও তারা দেখতে পেল। অতএব ওদের কৌতূহল হল। একজন কারণ জিজ্ঞাসা করতেই মা তাদের বলল, মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু দ্বিরাগমনের সময় সেই যে মেয়েকে দিয়ে গেলে হরিপদ আর আনতে এল না। অনেক অপেক্ষার পর নিজে নিয়ে এসেছিলাম মেয়েকে। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে বলে দিল,

'মেয়েকে নাকি তার পছন্দ হয়নি।' সঙ্গে সঙ্গে জনতা গর্জে উঠল। আর আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে হরিপদ এবং তার বউদির কেচ্ছাকাহিনী শুনতে লাগলাম। প্রথম প্রথম গ্রামের লোক ভাবত মাতৃস্নেহ। তারপর কেউ না কেউ কিছু না কিছু দেখতে পেয়েছে। লোকের চোখ ঢাকার জন্যে যে হরিপদর বিয়ে দেওয়া হল সেকথা সবাই জানে। এমন অনাচার মেনে নেওয়া চলে না। বউ ফিরিয়ে নিতে হবে নিতে হবে বলে পাড়ার লোক আমাদের সামনে রেখে চিৎকার করতে করতে চলল। আমার খুব লজ্জা করছিল কিন্তু তখন আর কোনও উপায় ছিল না। তাঁর বউদিও নাকি বাড়িতে নেই। দরজায় আঘাত করছিল সবাই। শেষপর্যন্ত তিনি দরজা খুলে চিৎকার করলেন, 'আপনারা করছেন কি? আমাদের বিয়ের ব্যাপারটায় নাক গলাচ্ছেন কেন?' মানুষ তখন খেপে গিয়েছে। তাকে দেখতে পেয়েই কিলচড় শুরু হয়ে গেল। আমি আর পারলাম না। আমার ভয় হচ্ছিল সবাই মিলে মারলে তিনি মরে যাবেন। আমি আমার রোগা শরীর নিয়ে ছুটে গেলাম তাঁকে আড়াল করতে। একটা লোক তাঁকে মারতে যাচ্ছে দেখে একটু ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলাম, দেখলাম সে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। স্বামী ভেতরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে নিলেন। শুনলাম লোকটার নাকি মৃগীরোগ আছে। সবাই মিলে ধরাধরি করে হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হল। আমি এবং মাও ওদের সঙ্গে গেলাম। লোকটাকে সুস্থ হতে দেখে ফিরে আসছি যখন, তখন একজন সেপাই এসে বলল থানার বড়বাবু আমাদের ডাকছে। আমাকে আর আমার মাকে। গেলাম। দারোগাবাবু জানালেন আমার স্বামী এসে ডায়েরী করে গেছেন যে আমি এবং আমার মা দলবল নিয়ে তাঁকে মারতে গিয়েছিলাম, তাঁকে ধাক্কা দিতে গিয়ে আর একজনকে এমন আঘাত করেছি যে লোকটাকে হেলথ সেন্টারে নিয়ে যেতে হয়েছে। তাঁর আরও অভিযোগ স্ত্রী হিসেবে আমার অক্ষমতা জানার পরই নাকি আমি বাপের বাড়ি চলে যাই। তাছাড়া ওঁর কাছে আমার লেখা বেশ কিছু কাগজ আছে যাতে প্রমাণ করা যেতে পারে যে আমার চরিত্র ভাল নয়।

দারোগাবাবু হাসলেন। বললেন 'সবই বুঝলাম কিন্তু কাগজে কি লিখেছেন?'

'গল্প!'

'অ্যাঁ? আপনি গল্প লেখেন?'

'হ্যাঁ।'

'আরেব্বাস, ভাবা যায় না।' দারোগা নাক চুলকে ফেললেন 'ঠিক আছে, কোর্ট থেকে সমন গেলে হাজির হবেন।'

ব্যস, হয়ে গেল।

এরপর থেকে আমি বনগাঁয়ে, আমার বাপের বাড়িতে। সংসারে কাজ করে দিই, তিনটে ছাত্রী পড়াই আর দুপুরে গল্প লিখি। বাবার কাছে হাত পাততে হয় না। মুশকিল হল আমার গল্পগুলো ঠিক কোন কারণে ছাপা হচ্ছে না তা বুঝতে পারছি না। হলে সোনারপুরে গিয়ে পত্রিকাটা দিয়ে আসতাম। আমার এখন ভাল লাগে না। সাতদিন যে মানুষটার পাশে শুয়েছিলাম

তিনি আমাকে খুব টানেন। মাঝে মাঝে নিজেকে বোঝাই তিনি তখন খুব ছোট ছিলেন, কিছু বুঝতেন না। বউদির সঙ্গে ঘটনা ঘটে গিয়েছিল হঠাৎই। যেমনভাবে দুর্ঘটনা হয়। তারপর সেইটে অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মন মানতে চায়, কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হচ্ছে!

আমার এখন সোনারপুরে যেতে ইচ্ছে করে। ভাইরা বড় হচ্ছে। ওরা বুঝতে শিখেছে আমি এবাড়িতে বাহুল্য। আমার এখানে থাকার কথা নয়। হঠাৎ আমার এক বান্ধবী আমাকে একটা সত্যি কথা বলল। ভগবান মানুষকে তৈরি করেছেন কতকগুলো নিয়ম মেনে। শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়কাল এবং বার্দ্ধক্য।

কোনওটাতেই কেউ চিরদিন আটকে থাকতে পারে না। তাকে এগিয়ে যেতেই হয়। আমার স্বামীর বয়স এখন তিরিশ, তিনি ছেচল্লিশ। আর কতদিন? বড়জোর বছর চারেক। তারপর তাঁর শরীর থেকে যৌবন উধাও হয়ে যাবেই। আর বাইরের যৌবন যদি বা থাকে ভেতরের যৌবন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তখন তাঁর কোনও আকর্ষণ থাকবে না আমার স্বামীর কাছে। গন্ধ নেই মধু নেই এমন ফুলের দিকে মানুষ কতবার তাকায়। পাঁচ বছর পরে আমার মাত্র তিরিশ বছর হবে। কী-ই বা এমন। তখন তিনি আমাকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন।

আমি তাই মাসে একবার সোনারপুরে যাই। দূর থেকে বউদিকে দেখে আসি। লোক বলে এই বয়সে অসুখ-বিসুখ হলেও মানুষের শরীর নষ্ট হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত তেমন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। তবু, এটাই আমার একমাত্র আশা। আমি অপেক্ষা করব।'

জয়ী পড়া শেষ করল। তারপর বলল, 'ইম্পসিব্‌ল!'

অমিত জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে?'

'এই জন্যেই বাঙালি মেয়েরা এক্সপ্লয়েটেড হয়ে চলেছে। স্বামী আর-একজনের সঙ্গে ফূর্তি করছে দিনের পর দিন। আমি অপেক্ষা করব কখন তিনি মুখ ফেরাবেন সেই আশা নিয়ে?' জয়ীর গলায় জ্বালা স্পষ্ট হল।

শোভন বলল, 'কিন্তু গল্পটা দাঁড়িয়ে গেছে। শুধু যৌবন দিয়ে অনন্তকাল কেউ কোন সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এই উপলব্ধিটা গল্পটার চমক।'

ওরা খিচুড়ি এবং ইলিশ খেল। বিকেল নামতেই যে যার বাড়ি ফিরে গেল ধন্যবাদ জানিয়ে। দেখা যাচ্ছিল গল্পটা কিছুই নয়, খুবই সাধারণ ইত্যাদি বলা সত্ত্বেও খেতে বসেও এ নিয়ে কথা বলা বন্ধ করছে না। এক মাসের শিশুকে মাতৃস্নেহে বড় করে কোনও মহিলা শেষপর্যন্ত ওই সম্পর্কে যেতে পারেন কিনা তাও তর্কের বিষয়। কুন্তী কোন কথা বলছিলেন না। একজন ঠাট্টা করে বলল, 'আহা বেচারা। লিজ টেলার যদি স্বামীর বউদি হত তাহলে ওকে পনেরো বছর অপেক্ষা করতে হত কম করেও। তদ্দিনে মেয়েটাই বুড়ি হয়ে যেত!'

বাড়িটা এখন ফাঁকা। ব্যালকনিতে চুপচাপ বসেছিলেন কুন্তী। ঘোলাটে মেঘগুলো ব্লটিং-এর মতো সমস্ত আলো দ্রুত শুষে নিচ্ছে। সন্ধে হয়ে এল বলে। ওপাশের একটা ঘরে টিভি

চলছে। দর্শক বিন্তি এবং আবদুল। শব্দ বাইরে বেরুচ্ছে না। কি একটা সিনেমা চলছে সেখানে।

গল্পটাকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না কুন্তী। বাঙালি মেয়েদের যে বয়সে ওই পর্বটিকে ছেড়ে আসতে হয়, তাঁর ক্ষেত্রে একটু আগেই যেন এসে গিয়েছে। ডক্টর দত্ত বলেছেন, এটা জীবনের খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। একটুও মাথা ঘামাবেন না। শরীর নিয়ে চিন্তা করা বোকামি। আসলে মন তাজা রাখাই প্রয়োজন। শুনতে খারাপ লাগে না এইসব উপদেশ। শুনলে স্বস্তি হয় বলেই খারাপ লাগে না।

কিন্তু ওই যে মেয়েটি লিখেছে, গন্ধ নেই মধু নেই এমন ফুলের কথা! এখনও এই সময়ে তিনি যখনই একাকী তখনই এমন কোনও পুরুষের সঙ্গ কামনা করেন যে বোকাবোকা নয়, যে স্মার্ট সাজার চেষ্টা করে না অথবা বোদ্ধা হবার ভান করে না। এই যে কামনা তা তাঁর বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে। তাঁর শরীরের সব কিছু মন্থন করে নিঃশ্বাসের মতো আন্তরিক হয়ে ওঠে। রঙ্গন চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুকাল থিতিয়ে ছিল এইসব ভাবনা। এখন একটু একটু করে প্রবল হচ্ছে। শেষ ঘণ্টা বেজে যাওয়ার পর লোকে যেমন হুড়মুড়িয়ে ট্রেনের কামরায় উঠে পড়ে, ঠিক তেমন? শেষ ঘণ্টা? তাঁর শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে? ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন কুন্তী। অসম্ভব। এই তো, ভরদুপুরে বাড়ি এসে ভাকা খাওয়ার আগেই মানুষগুলো তাঁর রূপের কত প্রশংসা করে গেল। অফিসে যখন ঢোকেন তখন কর্মচারীদের মুখে যে স্তাবক দৃষ্টি থাকে তা তাঁর অদেখা নয়। ম্যাডাম শব্দটা উচ্চারণ করার সময় তারা এক একজন চকোলেট হয়ে যায়।

সেদিন রবীন্দ্রসদনে গিয়েছিলেন বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে। একটি বছর পঁচিশের ছেলে এগিয়ে এসেছিল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি?' কুন্তীর কপালে ভাঁজ পড়েছিল।

'কেন?'

'আপনার মতো কাউকে কখনও দেখিনি।'

'সরি। আমার বাজে কথা বলার মতো সময় নেই।' কুন্তী পাশ কাটিয়েছিলেন অবহেলায় কিন্তু তাঁর ভাল লেগেছিল।

আর এসব শেষ ঘণ্টা বেজে গেলে কারও জীবনে ঘটে। পৃথিবীতে এমন মেয়ে অনেক আছে যাকে কখনও কোনও পুরুষ প্রস্তাব দেয়নি। যেমন ওই মেয়েটি। কী নাম যেন, হ্যাঁ, নমিতা। চেহারার মতো সাদাসাপটা নাম।

কুন্তী কলকাতার দিকে তাকালেন। ঝাপসা জলের মধ্যে আলোর বিন্দু ফুটে উঠেছে। কলকাতায় সন্ধে নেমেছে বর্ষা জড়িয়ে। দিন শেষ হল। একটা গোটা দিন। কুন্তী ধীরে ধীরে শোওয়ার ঘরে চলে এলেন।

দেওয়ালজোড়া আয়নায় এখন তিনি। মিষ্টি, অহঙ্কারী। দূর। কে কী বলল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ। বরং স্নান করা যাক। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে অবিরত ভিজে চলেছেন তিনি। আজকের দিনটা অবহেলায় কাটল। শরীরটার দৈনন্দিন পরিচর্যা হল না।

একটু অলস্যঘন দিন। আগে মন্দ লাগত না, এখন অস্বস্তি হয়। এই বুঝি ফাঁক গলে শনি ঢুকে পড়ল। ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়েছিলেন তিনি। কোনও এক রাজা নাকি অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারছিলেন না শনিদেব। কোথাও তাঁর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু একদিন বাইরে থেকে ঘুরে এসে রাজা যখন তাঁর পা ধুচ্ছিলেন তখন গোড়ালির কাছে জল পৌঁছায়নি অন্যমনস্কতার কারণে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে শনিদেব সেইখান দিয়ে রাজার শরীরে প্রবেশ করে ধ্বংস ডেকে আনলেন। এমন যেন না হয়, এমনটা হতে দেবেন না কুন্তী।

স্নান সেরে বড় তোয়ালেতে শরীর মুছতে মুছতে আয়নার নিজেকে দেখলেন। না, কপালে ভাঁজ পড়েনি, চোখের তলায় একটু ঢেউ নেই। হাসলে গালে কুঞ্চন ওঠে না। চামড়া কি টানটান। গলায় একটু, নাঃ, এ তাঁর চোখের ভুল। গতকাল যখন ছিল না আজ কোত্থেকে আসছে! মুখ উঁচু করতেই সন্দেহটা মিলিয়ে গেল। কাঁধ থেকে কনুইদুটো এখনও সতেজ। এবং নিজের বক্ষদেশ দেখতে গেলেই মৃণালের ওপর তাঁর খুব রাগ হয়। প্রথম যৌবনে মৃণাল যথেচ্ছাচার যদি না করত তাহলে এখনও ঈশ্বরী ঈর্ষিতা হতেন। সেই সময় তিনি বোঝেননি, মেয়েরা ভালবাসলে যেমন কিছুই বুঝতে পারে না অথবা চায় না। সঙ্গে সঙ্গে গল্পটার কথা মনে এল। নমিতা অথবা শকুন্তলার স্বামীর বউদি, মেয়ে দেখতে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন ভেতরের জামার মাপ কত? বেচারা, কী অপমানকর প্রশ্ন!

হঠাৎ ভদ্রমহিলাকে দেখতে ইচ্ছে করল কুন্তীর। পঞ্চাশের কাছে পৌঁছেও যিনি তিরিশকে শাসনে রেখেছেন। সেই মহিলা নিশ্চয়ই তার মতো এমন বিত্তে নেই, হাত বাড়ালেই সমস্ত পৃথিবীকে পান না। তাঁর কৌশল কী?

সারা শরীর ঢাকা আলখাল্লা পরে শোওয়ার ঘরে পৌঁছাতেই টেলিফোন বেজে উঠল। কুন্তী রিসিভার তুললেন না। বাজনা থামতেই বুঝলেন বিন্তি ধরছে ও ঘরে। একটু বাদেই সে এল, 'অণিমাদেবী, কী বলব?'

মাথা নেড়ে ধরবেন বললেন কুন্তী।

রিসিভারটা তুললেন, 'হেলো!'

'বিরক্ত করছি। খুব ব্যস্ত?'

'নাঃ। বল।'

'তোমাকে যে মেয়েটির কথা বলেছিলাম সে কি দেখা করেছে আজ?'

'এসেছিল।'

'কখন?'

'দুপুরে।'

'তারপর? মানে, কখন গেল?

'কেন বল তো?'

'আর বোলো না। ওর খোঁজে বনগাঁ, মানে যেখানে ও থাকে, সেখান থেকে ওর বাবা এসেছেন আমার কাছে। মেয়েকে নিয়ে এখনই সোনারপুরে যাবেন। অথচ কথা ছিল ও তোমার ওখান থেকে আমার কাছে ফিরে আসবে।'

'তাহলে বনগাঁয় ফিরে গেছে।'

'মনে হচ্ছে। এখন এরা যে কী করবে?'

অণিমা যেন সত্যিই বিব্রত।

কুন্তীর খেয়াল হল 'সোনারপুরে যাবে কেন? ওর লেখা একটা গল্প দিয়ে গেছে আমায়। সেটা পড়ে তো মনে হয় না যাওয়া উচিত। আর শোন, এই মেয়েকে দেবার মতো কোনও চাকরি আমার হাতে নেই। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

'ও। ব্যাড লাক্। তোমাকে বিরক্ত করেছি বলে খারাপ লাগছে। মেয়েটার কপালটাই মন্দ। ওর বাবা এসেছেন স্বামীর শেষকৃত্যে নিয়ে যেতে।'

'হোয়াট?' চিৎকার করে উঠলেন কুন্তী।

'আজ দুপুরেই ওঁরা খবর পেয়েছেন লোকটা নাকি ভোরে আত্মহত্যা করেছে। গলায় দড়ি দিয়ে। শেষকৃত্যে না গেলে সম্পত্তির ভাগ থেকে হয়তো বঞ্চিত হতে পারে।'

'কিন্তু লোকটা আত্মহত্যা করতে গেল কেন?'

'আমি জানি না। আচ্ছা, রাখছি।'

রিসিভার রেখে ধুপ করে বিছানায় বসে পড়লেন কুন্তী। তাঁর ভিজে চুল এখন তোয়ালেতে জড়ানো। হঠাৎই সেই তোয়ালের হিম তাঁর সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। মেয়েটা এখন কার জন্যে কিসের জন্যে অপেক্ষা করবে। যার সময় গেলে সে জিতে-যাবে বলে ভেবেছিল তার তো আজ ভোরেই সময় চলে গেল কিন্তু ওর তো জেতা হল না। এখন সেই মহিলা, যাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল একটু আগে, হঠাৎই যেন অনেক অন্ধকারে চলে গেলেন। আশ্চর্য! এদের কাউকেই তো তিনি চেনেন না।

কুন্তী উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎই সমস্ত শরীর যেন নির্জল বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। জিভ, গলা, পেট, সর্বাঙ্গ। জল মানে চলাচল, জল মানে সরস। অনেক দূরের মহাকাশে যেসব গ্রহ জলহীন হয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা হিংসুটে চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তৃষ্ণায় বুক জ্বলে জ্বলে খাক!

কুন্তী প্রচণ্ড শক্তিতে বোতামে চাপ দিলেন।

বিশাল ফ্ল্যাট কাঁপিয়ে বেল বাজছে। বিন্তি ছুটে এল দরজায়।

কুন্তী বলতে পারলেন, 'জল দাও।'

স হা ব স্থা ন

এখন বিকেল। ব্যালকনিতে চেয়ার পেতে বসেছিলেন দিব্যজ্যোতি। সামনে চোখ মেললেই চোখের শান্তি হয়। কোথাও কোনো বাধার প্রাচীর নেই। দক্ষিণ দিক, বোধ হয় বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একদম খোলা। নিবারণ ঢোল ঠিকই বলে। এত মিষ্টি হওয়া তিনি কোনদিন গায়ে মাখেননি।

শরীরটা জুত নেই। আজকাল নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই এমন হয়। ঠিক সময়ে খাওয়া, শোওয়া, ঘুমাবার চেষ্টা চালিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা এবং বই পড়া, জীবন বলতে এখন এই। লতিকার তাগাদায় জীবনের শেষপ্রান্তে এসে একটা মোচড় এল। শোভাবাজারের ঘিঞ্জিতে তিনি হাঁটতে পারতেন না। এখানে এত সবুজ মাঠে হাঁটতে হাওয়া লাগবে। মল্লিকবাড়ির অন্দরে হাওয়া ঢুকতো না কিন্তু এখানে ঈশ্বরের দাক্ষিণ্য পর্যাপ্ত। নিবারণকে দেখে তার খারাপ লাগছে না। ওর সঙ্গে কথা বলেও আরাম পাওয়া যাবে। আশেপাশের ফ্ল্যাটের মানুষ যারা আসবে তারা কেমন হয় সেইটেই ভাবনার। দিব্যজ্যোতি খুশী মনে ঘরের ভেতরটা লক্ষ্য করলেন মুখ ফিরিয়ে। আর অমনি বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কোনো আভিজাত্য নেই, দেশলাই বাক্সের মত দেওয়াল, শুনতেই সব মিলিয়ে অনেক স্কোয়ার ফুট কিন্তু কেমন খোপ খোপ। আজন্ম মল্লিকবাড়ির সেই বিশাল থামওয়ালা বড়-বড় ঘরে বারো ইঞ্চি দেওয়ালের মধ্যে থেকে এসে এটিকে খেলাঘর বলে মনে হচ্ছে। খেলাঘর বটে—জীবনের সব পাট চুকিয়ে, আত্মীয়-অনাত্মীয়দের সব মুখের চেহারা দেখে এই খেলাঘর পেতেছে লতিকা তাকে নিয়ে।

'অত হাওয়া লাগিও না ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' পেছনে এসে দাঁড়ালেন লতিকা। তারপর স্বামীর বুকে গলায় একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে দিলেন। ঠাণ্ডা লাগছিল না কিন্তু এতে বেশ আরাম হলো দিব্যজ্যোতির। হেসে বললেন, 'কলকাতা শহরে গরমকালে চাদর জড়িয়ে বসে আছি, কি কাণ্ড। শোভাবাজারে এমনটা ভাবতেও পারিনি লতিকা।' লতিকা চারপাশে তাকালেন, শুধু শূন্য মাঠ আর দূরে দূরে অর্দ্ধসমাপ্ত কিছু বাড়ি। আকাশ এখন টকটকে হয়ে আছে; সূর্য ডুবুডুবু। লতিকা বললেন 'আঃ, এত আরাম ভগবান আমার কপালে লিখে রেখেছিলেন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি গো।'

দিব্যজ্যোতি তাকালেন স্ত্রীর দিকে। বয়স সর্বাঙ্গে স্পষ্ট কিন্তু চুলে পাক ধরেনি, দাঁতও পড়েনি। একটু মোটা হয়ে গেছেন বটে লতিকা কিন্তু খাটতে দ্বিধা করেন না। এখন ওঁর দিকে

পেছন ফিরে রেলিং-এ ভর করে পৃথিবী দেখছেন যে মহিলা তিনি তাঁর স্ত্রী। সাদা শাড়িতে রং খুঁজে পাওয়া ভার। দিব্যজ্যোতি ডাকলেন, 'লতু'।

লতিকা চমকে ফিরে তাকালেন। দিব্যজ্যোতি অবাক হলেন, 'কি হল অমন করলে কেন?'

লতিকা মৃদু মাথা নাড়ালেন, 'না। কিছু না। বল?'

কিছু ত বটেই। বল বলতে চাও না।' দিব্যজ্যোতি নিজের গলায় অভিমান শুনলেন।

লতিকা হাসলেন, 'কি বলছিলে বল! বুঝেছি চা চাই।'

'তা হলে মন্দ হয় না। কিন্তু তোমার ঝামেলা বাড়িয়ে কি লাভ!'

'চা আর ভাতের ব্যবস্থা এসেই করেছি। এ বাড়িতে আজ নতুন কিন্তু তোমার জীবনে।'

'বছর গুনো না। বছরের হিসেব আর ভাল লাগে না।' 'কি বলছিলে তখন?' লতিকা পাশে এস দাঁড়ালেন, খুব অন্তরঙ্গ কিছু কথা বুকে ছটফট করছিল দিব্যজ্যোতির। তিনি জানেন লতিকা সেই কথাগুলোর আন্দাজ পেয়েছে। দীর্ঘদিন ভালবেসে একসঙ্গে থাকলে মাটিও আকাশকে বুঝতে পারে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে কথাগুলো উচ্চারণ করলে নিজের কানেই অন্য রকম ঠেকবে বলে মনে হল তাঁর। তিনি বললেন, 'বলছিলাম, আমার গায়ের চাদর জড়িয়ে দিলে কিন্তু নিজে তো এই হাওয়া গায়ে মাখছো।'

লতিকার চোখ ছোট হল। তারপরেই হাসি ফুটল ঠোঁটে, 'আমার কিছু হবে না। মেয়েদের ঠাণ্ডা কম লাগে। শোভাবাজারে শীতকালে কি গরম জামা পরতাম? শরীরে এখন এত চর্বি ঠাণ্ডাটা ঢুকবে কোত্থেকে। তুমি বসো, আমি চা আনছি।'

লতিকা চলে গেলেন ভেতরে। দিব্যজ্যোতি মাথা নিচু করলেন। এই সময়টা মন্দ কি! দুজনেই জানেন কথাটা বলা হল না কিন্তু অন্য কথার ভিড়ে তা ডুবিয়ে রাখাই মাঝে-মাঝে আরামদায়ক। সারাটা জীবন শুধু যেমন অন্যের জন্যে খরচ করে যাওয়া!

আর একটু বাদে উঠে দাঁড়ালেন দিব্যজ্যোতি। সত্যি শীত লাগছে এখন। হাওয়ার দাপট বাড়ছে, আকাশের গায়ে একটু কালো ছাপ। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন। নতুন বাল্বের আলোয় ঘরটা ঝকমকিয়ে উঠলো। এইটে তাদের শোওয়ার ঘর। কোনোমতে একটি খাট পাতা হয়েছে। আর কিছুই সাজিয়ে রাখা হয়নি। পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সুইচ টিপলেন—এটি দ্বিতীয় শোওয়ার ঘর। আপাতত এখানেই সমস্ত জিনিস স্তূপ করে রাখা হয়েছে। আলমারি থেকে চেয়ার, লতিকার রান্নার সব জিনিসপত্র। এগুলোও তিনি অনেক অনেক কাল দেখে আসছেন। শোভাবাজারের বাড়িতে যাদের মানাতো এখানে তাদের দেখতে অস্বস্তি হচ্ছে। এই আধুনিক ফ্ল্যাটে পুরোনো আবার বড় বেমানান। কিন্তু নতুন কিছু কেনার সামর্থ্য কোথায়? বাইরের ঘরের দরজায় এসে আলো জ্বাললেন। সোফাসেট এখানে পেতে রাখতে হয়েছে লরি থেকে নামিয়ে। মেঝেতে কিছু নেই, দেওয়াল উদোম। কুড়ি বছর আগের সোফাসেট। ওই টুলটা ঠাকুর্মার আমলের। এখনও কি রকম চকচক করছে। হঠাৎ দিব্যজ্যোতির মনে হল, এই আধুনিক বাড়িতে তিনি বা তাঁরা কতটা মানানসই? এই গিলে করা পাঞ্জাবী, কোঁচকানো ধুতি

আর সুতির চাদর? এই সময় সশব্দে কলিং বেল জানিয়ে দিল কেউ এসেছে। দরজা খুলতে গিয়ে সচেতন হলেন দিব্যজ্যোতি। আগন্তুক অবাঞ্ছিত কিনা তা জানবার জন্যে এখানকার দরজায় ছোট ফুটো থাকে। তাতে চোখ রেখে ভাল লাগল তাঁর নিবারণ এসেছে। দরজা খুলে প্রসন্ন মুখে তাকালেন, 'এসো, নিবারণ।'

সব ঠিক আছে? 'কোন প্রব্লেম নেই?' নিবারণ হাত তুলে প্রশ্ন করল।

'বাইরে দাঁড়িয়ে তো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যায় না। ভেতরে আসতে বলেছি।'

দিব্যজ্যোতির কথায় ভেতরে ঢুকে নিবারণ বলল, 'একি। জানলাগুলো খোলেননি কেন? ঘরে গুমোট হবে।' বলেই সে জানলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, দিব্যজ্যোতি বাধা দিলেন, 'না-না। থাক এখন, মশা ঢুকবে।'

'মশা? নো মশা হেয়ার। থাকলেও একদম রোগা পটকা।'

'থাক না। তুমি বসো। আসলে খুললেও তো বন্ধ করতে হবে।'

ততক্ষণে একটি জানলা খুলে ফেলেছে নিবারণ, 'বন্ধ করার ভয়ে খুলবেন না? ঠিক আছে, যাওয়ার সময় আমি বন্ধ করে দেব। আর দেখেছেন কি হাওয়া! কি পবিত্র!'

'পবিত্র' দিব্যজ্যোতি চমকে উঠলেন, 'শব্দটা খুব ভাল বললে হে! তুমি কি কবিতা লেখ? পবিত্র হাওয়া! বাঃ।'

নিবারণ লজ্জা পেল, 'না-না। অশিক্ষিত মানুষ, এসব ক্ষমতা আমার কোথায়। মুখে যা আসে বলে ফেলি। বলার পরও কেউ না বলে দিলে বুঝতে পারি না কথাটা ভাল।'

দিব্যজ্যোতি ভাল করে ছেলেটিকে লক্ষ্য করলেন, যে বয়স শুনেছেন, চেহারায় সেটি মালুম হয় না। তিনি অন্য প্রসঙ্গে গেলেন, 'আর সব ফ্ল্যাটের মানুষ কবে আসছেন?'

'এসে গেলেন বলে। আমরা তো তৈরী হয়ে বসে আছি। এখন ঠিক আছে, সবাই এসে গেলে একা আমায় সব ঝক্কি সামলাতে হবে। প্রাণহরিবাবু, চেনেন তো ওঁকে, ওই যে মিটিং-এর দিন যিনি আপনাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমাদের ম্যানঞ্জার। ছি, ছি, এই দেখুন বলি কথাটা ম্যানেজার কিন্তু সঙ্গদোষে জিভে যে উচ্চারণ ঢুকেছিল তাই বেরিয়ে আসে। যা বলছিলাম, প্রাণহরিবাবু মাঝে মাঝে আসবেন এখানে। অতএব আমার একার ঘাড়ে সব। কিন্তু কাজ দেখে পালাবার পাত্র নই আমি।' নিবারণ যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছিলেন, ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন দিব্যজ্যোতি।

তিনি বললেন, 'তোমরা এই বাড়িটার নাম জব্বর দিয়েছ হে।'

'তা যা বলেছেন। বাঙালি থেকে চীনে, সবাই আসছেন তখন বাড়ির নাম কলকাতা ভাল মানাচ্ছে। আমি এবার উঠি।' উসখুস করল নিবারণ।

'উঠবে মানে? এলেই বা কেন?'

'এই প্রথম সন্ধ্যে, আপনারা আছেন কেমন দেখতে ইচ্ছে করল।'

'খুব ভাল ইচ্ছে। বসো তো! তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার ভাল লাগছে।'

এই সময় দু'কাপ চা হাতে লতিকা দরজায় এসে দাঁড়াতেই নিবারণ উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করল, 'ছি-ছি, আপনি আমার জন্যেও চা করলেন?'

'একজনের চা তৈরীতে যে পরিশ্রম, দুজনের কিন্তু তা ডবল হয়ে যায় না, আপনি অনেকদিন বাঁচবেন!' লতিকা টেবিলে চা নামিয়ে রাখলেন। দিব্যজ্যোতি একটু চিমটি কাটলেন, 'তুমি আবার কখন মনে করলে ওকে!' 'করেছি।' উল্টোদিকের সোফায় গুছিয়ে বসলেন লতিকা।

নিবারণ একদৃষ্টিতে লতিকার দিকে তাকিয়েছিল। বিব্রত মুখে লতিকা প্রশ্ন করলেন, 'কি দেখছেন ওরকম করে?' নিবারণ মাথা নাড়ল, 'আপনি না কি বলব সাক্ষাৎ মা দুর্গার মত দেখতে।'

হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন দিব্যজ্যোতি, লতিকার মুখে রক্ত জমল। নিবারণ তার কথায় জোর দিল, 'হ্যাঁ, আমি মিথ্যে বলছি না। আপনার দিকে তাকিয়েই কেমন ভক্তি ভক্তি ভাব জাগে।'

দিব্যজ্যোতির গলার তখনও হাসির রেশ, 'ঠিকই বলেছ ভাই। আমার ত সারাজীবন ওই করে কেটে গেল।' লতিকা কৃত্রিম রোষ দেখালেন, 'থামো তো! নিবারণবাবু, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে। আপনি না এলে আমাকেই ডাকতে যেতে হত। কিন্তু এত বড় বাড়ি একদম খালি হয়ে রয়েছে, ভয়-ভয় লাগে।'

দিব্যজ্যোতি বললেন, 'এখন বাড়ি খালি বলে ভয় পাচ্ছ, বাড়ি ভরে গেলে আবার লোক দেখে হাঁপিয়ে উঠবে।'

'উঠি উঠব তবু শোভাবাজারের বাড়ির মত ঘরকুনো হয়ে থাকতে তো হবে না। শুনুন, ওঁকে তো বলে কোনো লাভ নেই। একটা কথাও কানে ঢোকে না। আমার একজন পুরুত চাই। ভালো পুরুত।' লতিকা আবদারের গলায় জানালেন।

'পুরুত মানে পুজো করবেন?' এই তল্লাটে কোনো পুরোহিত আছে কিনা মনে করতে পারল না নিবারণ। প্রাণহরিবাবু ব্রাহ্মণ, উনি পুরুতগিরি করেন কিনা সেটা জানা নেই।

'হ্যাঁ। গৃহপ্রবেশ করলাম অথচ একটা পুজো হল না, এটা খুব খারাপ ব্যাপার। আমি তাই বেশিরভাগ জিনিষপত্রে হাত দিইনি। পুজো করার পর গোছাব। আপনি কাল সকালেই একজন পুরুত এনে দিন। খুব বড় কিছু নয়, একটা পুজো করে নেব।'

দিব্যজ্যোতি মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার বললেন, 'ছাড়ো তো এসব। পুরুত নয়, আমাদের একটা ভাল কাজের লোক চাই। শোভাবাজারে যারা ছিল তারা পাড়া ছেড়ে এত দূরে আসতে চাইল না। তুমি ভাই একটি ঝি কিংবা চাকর দেখে দাও, নইলে তোমার ওই দুর্গাঠাকুরাণীর ফাই-ফরমাস খাটতে-খাটতে আমার প্রাণ জেরবার হয়ে যাবে।'

লতিকা ফুঁসে উঠলেন, 'বাজে বকো না। শোভাবাজারে তো পায়ের ওপর পা তুলে থাকতে। লোক আজ না হোক কাল পেয়ে যাব কিন্তু পুরুত আমার চাই কালকেই। ভয় পেয়ো না, তোমাকে এই পুজোর ব্যাপারে কিছু করতে হবে না। এখানে কোন ঠাকুরবাড়ি নেই?'

নিবারণ মাথা নাড়ল। 'আপনি তো কথাটা বলে ফেলেছেন, যোগাড় করার দায়িত্ব আমার। তবে একটা কথা, মন্ত্রটা নিয়ে খুঁতখুঁতুনি করবেন না।'

লতিকা শিউরে উঠলেন, 'ওমা, সেকি কথা!' দিব্যজ্যোতি হাসলেন, 'বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ। বঙ্গগৃহিনীরা এই করেই মরল।'

'মরি নিজের বাড়িতেই মরব। বিয়ের পর থেকেই মান্ধাতার আমলের বাড়িতে শরিকদের সঙ্গে ঝগড়া করে কাটাতে হয়েছে। তোমার আর কি! এখন একটু হাত পা মেলার সুযোগ পেয়েছি, হাজার হোক নিজের বাড়ি বলে কথা।' এই সময় দুম করে আলো নিভে গেল। নিবারণ বলল, 'এই এক জ্বালা। ঘাবড়াবেন না, জেনারেটার আছে। দেখি গিয়ে।' নিবারণ অন্ধকারেই চা এক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়াল। দিব্যজ্যোতি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'অন্ধকারে যাবে কি করে? লতু টর্চ আনো।'

নিবারণ বললেন, 'কিছু ব্যস্ত হবেন না। প্যাঁচাদের চেয়ে খারাপ দেখি না অন্ধকারে। কলকাতায় থাকতে থাকতে সেটাও অভ্যাস হয়ে গেছে। কাল আপনি আপনার পুরুত পেয়ে যাবেন ঠিক। সকাল সকাল আনব।'

বাড়িটা এখন ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। নিবারণ বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা দিয়ে লতিকা বললেন, 'এখানে ভূতের মত বসে না থেকে বারান্দায় বসবে চল।'

'মোমবাতি আনোনি?' দিব্যজ্যোতির উঠতে ইচ্ছে করছিল না। জানলা দিয়ে খারাপ হাওয়া আসছে না।

লতিকা বললেন, 'এনেছি তবে এখন খুঁজে পাব না।' বলে অন্ধকারেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইলেন দিব্যজ্যোতি। খালি বাড়িতে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। দিব্যজ্যোতির মনে হল খালি বাড়ি বলেই এই শব্দ। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই তাঁর অস্বস্তি আরম্ভ হল। যেন ঘরের মধ্যেই তিনি শব্দের উৎস খুঁজে পাচ্ছেন। দিব্যজ্যোতি নিচু গলায় ডাকলেন, 'লতু।' শব্দটা যেন কয়েকগুণ জোরে কানে বাজল। তিনি ধীরে ধীরে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেলেন। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে ব্যথা লাগল টেবিলের পায়ে ধাক্কা লাগায়।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হল না। শোভাবাজারে কোনোকালেও ভূতের ভয় পায়নি। ওর এক জেঠিমা তান্ত্রিকদের খুব মানতেন। বিডন স্ট্রিটে এক তান্ত্রিকের কাছে যাওয়া আসা ছিল তাঁর। তন্ত্রমতে প্রেত পাঠানো যায় কারো ক্ষতি করতে অথবা কেউ ক্ষতি করছে জানলে সেই প্রেতকে দিয়ে পাহারা দেওয়ানো যায় এসব কথা শুনে শুনে নেশা চড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তাঁর মনে অন্যরকমের ভয় এল। এই বিশাল শূন্য বাড়িতে একা থাকাটাই অসম্ভব। শব্দগুলো নানারকম মানে হয়ে কানের ভেতরে ঢুকছে।

দিব্যজ্যোতি হাতড়ে হাতড়ে বারান্দায় চলে এসে থমকে দাঁড়ালেন। লতিকা গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। দিব্যজ্যোতি ঠিক করলেন চশমার কাঁচ এবার পাল্টাতে হবে।

যতই অন্ধকার হোক, লতিকাকে তিনি বেশ ঝাপসা দেখছেন যেন। বাইরে অনেক দূরে টিমটিমে আলো। আর আকাশটা এখন মেঘমুক্ত কারণ ঠাসঠাস তারারা ঝক্‌ঝক্‌ করছে। দিব্যজ্যোতি আরও একটু এগোলেন। তাঁর পায়ের শব্দ এতক্ষণে লতিকার কানে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে মুখ ফেরাচ্ছে না। মজা লাগল দিব্যজ্যোতির, মেয়েদের বয়স বাড়লেও মনের মধ্যে অভিমানের বাক্সটা ঢেকেঢুকে রাখে। সময় বুঝলেই খানিকটা খুলে দেখায়। দিব্যজ্যোতি বিকেলে যেটা বলতে গিয়ে পারেননি এই আধা অন্ধকারে যখন তারার আলোর মিশেল চারপাশে, তখন দু'হাত বাড়িয়ে লতিকাকে কাছে টানলেন। লতিকার শরীরটা এই বয়সেও নরম, অন্তত তাঁর চেয়ে নরম। কাঁধে চাপ দিয়ে ওঁকে ঘুরিয়ে মুখ লাগিয়ে লতিকার চিবুক তুলে অনেক অনেকদিন পরে চুম্বন করলেন তিনি। এক ঝটকায় মনে হল যৌবনের উচ্ছ্বাসের যে স্বাদ লতিকার ঠোঁটে পেতেন তার গন্ধ যেন নাকে লাগল। কিছু বলার জন্য তিনি মুখ খুলতে যেতেই লতিকা হু-হু করে কেঁদে উঠলেন। তারপর দিব্যজ্যোতির বুকে মাথা রেখে সেই কান্নাটা গিলতে চেষ্টা করলেন।

কাঠ হয়ে গেলেন দিব্যজ্যোতি। কোনোমতে নিজেকে সামলে লতিকার পিঠে আলতো হাত বোলালেন। তারপর গাঢ় স্বরে বললেন, 'you must not, you must not!'

তা এসব বছর পাঁচেক আগের কথা। সময়ের চড়া পড়ে পড়ে এত সময় কোথাও এক ফোঁটা জল নেই বলে ধারণা জন্মেছিল দিব্যজ্যোতির কিন্তু এ স্রোত চোখের বাইরে দিয়ে বয়! চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন তিনি। সেই সময় লতিকা বলে উঠলো, 'বড় খুকীদের আসতে লিখলাম।'

জামাই ছুটি পায়নি। দিব্যজ্যোতি মনে করিয়ে দিলেন, 'বড় খুকীর মেয়ের পরীক্ষা!'

লতিকা জবাব দিলেন না। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল ছুটি না পাওয়া, মেয়ের পরীক্ষা—এসব বাহানা। কেউ তাঁর ইচ্ছের দাম দিতে চায় না। কিন্তু আজ ওই বারান্দায় যাওয়ার পর, একা দাঁড়িয়ে অন্ধকার দেখার পর থেকেই মনে হচ্ছিল ওর কথা। মনে হচ্ছিল কোথাও কি ভুল হয়ে গেছে? সে যেসব অন্যায় করেছে চোরের মত চলে গিয়ে তাঁরাও কি ওকে বুঝতে ভুল করেছেন?

ছোটবেলায় ছোটখুকী বলত, দেখো, আমি বড় হয়ে বিয়েই করব না। বিয়ে করলেই তো তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। দুই বোনের পার্থক্য ছিল দশ বছরের। বড় খুকীর বিয়ের পরে তাঁর কান্না দেখে মেয়ে বলেছিল!

এই বাড়ি নিজের। কোনো শরিক নেই, কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না। এই সুখ তাঁর অনেকদিনের আকাঙ্খায় ছিল। কিন্তু আজ কেন নিজেকে সুখী ভাবতে পারছেন না তিনি? হঠাৎ মুখ তুললেন লতিকা, 'মানুষ আর জন্তুর মধ্যে কি পার্থক্য জানো? সবাইকে নিয়ে সুখী হতে না পারলে মানুষের সুখ পূর্ণ হয় না।'

'কি বলতে চাইছ তুমি?' দিব্যজ্যোতির বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো।

'আমি তোমার কাছে একটা ভিক্ষে চাইব?'

'ভিক্ষে বলছ কেন?'

'ছোটখুকী, ছোটখুকীর কাছে একবার যেতে চাই!'

'কেন?'

'জানি না। কিন্তু না গেলে মন শান্ত হবে না।'

'সে যদি তোমায় অপমান করে?'

'আর কখনো যাব না।'

'না লতিকা। যাকে একবার মৃত ভেবেছ, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি, তাকে আর টেনে এনো না। স্মৃতি হাতড়ে পিছু ফেরা ভাল নয়। তোমার বড় মেয়েও খুশি হবে না। তাছাড়া যে লোকটা ছোট খুকীকে পয়সার লোভে মডেলিং করায়, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছা আমার নেই।' দিব্যজ্যোতি কথাগুলো বলছেন যখন তখনই আলো ফিরে এল। শোভাবাজারে লোডশেডিং শেষ হলে অনেক গলা থেকে একসঙ্গে আনন্দ ধ্বনি ছিটকে উঠত, কিন্তু এখানে কেউ কোন আওয়াজ করল না। এবং তখনই দিব্যজ্যোতির খেয়াল হল নিবারণ জেনারেটর চালু করতে গিয়েছিল অথচ তার কোন ফল পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা নিয়ে পরে কথা বলবো।

মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল দিব্যজ্যোতির। লতিকা তাঁকে ডাকছেন।

'কি বলছ?' বিরক্তি মুখে, গলায়।

'বাথরুমে যাব।'

'যাবে তো যাওগে। আমাকে ডাকার কি আছে।'

'কি সব শব্দ হচ্ছে চারপাশে। তুমি একটু দাঁড়াবে।'

লতিকার কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল। তবু সেই মুচড়ানো গলায় বললেন। 'কি করব! আজ ওকে ভীষণ মনে পড়ছে। আমাকে ছোটবেলায় এইরকম বারান্দাওয়ালা বাড়ির কথা বলত!' দিব্যজ্যোতি বললেন, 'লতু! তুমিই বলেছ, সী ইজ ডেড টু আস।'

লতিকা নিজেকে মুক্ত করে ধীরে ধীরে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। দিব্যজ্যোতি একটু অসহায় চোখে তাকালেন। তার শরীরে কম্পন আসছিল। হাঁটু দুটো হঠাৎ খুব দুর্বল হয়ে পড়ল। তিনি চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। এবং এতদিন বাদে স্ত্রীকে চুম্বনের যে আনন্দ কিছুক্ষণ আগে বেলুনের মত ফুলছিল তা এখন চুপসে গেছে। ওই কান্না একটি কারণেই আসতে পারে লতিকার, তাঁরও। দুটো মানুষের সূত্র যদি এক হয় তাহলে একের অনুরক্ষণ অন্যে টের পাবেই। তিনি কিছুতেই মুখটা মনে করতে চাইছিলেন না তখন বারংবার সে ফিরে আসছে। উনিশ বছর বয়সের তাঁর সবচেয়ে আদরের মেয়ে, ছোট মেয়ে, একেবারে বিয়ে করে খবর পাঠাল সে কাজটা করেছে। সামনে এসে দাঁড়িয়ে জানানোর সাহস হলো না। শোভাবাজারের

রক্ষণশীল বাড়ির অন্য আত্মীয়দের কথা ছেড়ে দিলেন। এই চোরের মত কাজটার জন্যে প্রচণ্ড অপমানিত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি আহত হয়েছিলেন লতিকা। বড় মেয়ে সম্বন্ধ এনেছিল। বড় জামাই-এর অফিসে কাজ করত ছেলেটি। দিল্লিতেই বাড়ি। মেয়ে জামাই লিখেছিল ছোটমেয়েকে নিয়ে লতিকা যেন দিল্লিতে কয়েকদিন কাটিয়ে আসেন। সেখানেই মেয়ে দেখবে ছেলে। সেইমত টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল আর আজই এই কাণ্ড! ছেলে ছবি আঁকে। নিজের সিগারেটের খরচ যার ছবি বিক্রির টাকায় ওঠে না সে বিয়ে করেছে দিব্যজ্যোতি মল্লিকের মেয়েকে। লতিকা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেছিলেন তিনি ধরে নেবেন ছোট মেয়ে মৃত। মুখ দর্শন করবেন না ঠিক করেও দিব্যজ্যোতিকে অনেকদিন নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। উনিশ বছর তিল তিল করে যে স্নেহ দিয়ে ওকে গড়ে তুলেছিলেন তা মুছে ফেলা মুশকিল। কথাটা জানার পর মেয়ে আর এ-মুখো হয়নি। দিব্যজ্যোতি জানেন না ফিরে এলে তিনি কি করতেন। তার বিস্ময় লাগে, উনিশ বছরের অভ্যাস ভালবাসা পরস্পরের হৃদয়ের স্পর্শ ম্লান হয়ে গেল মেয়ের কোন আকর্ষণের তাগিদে? কয়েক বছরের বা মাসের মধ্যে একটি পুরুষ কোন যাদুতে এত মূল্যবান হয়ে ওঠে? তারপর যখন কাগজের বিজ্ঞাপনে মেয়ের মোহিনী ছবি দেখতে লাগলেন, বুঝলেন মডেলিং করছে পেট ভরাতে, তখন তলানিটুকুও চলে গেল মন থেকে।

'দাঁড়াবো? আমি? বাথরুমের দরজায়? তুমি কি কচি খুকী?' লতিকা আর কথা না বলে নেমে গেলেন বিছানা থেকে। নতুন জায়গা, দেওয়ালের গন্ধ এখনও মরেনি, ঘুম আসছিল না প্রথম রাতে। তাও যদি এল লতিকার ভূতের ভয় সেটা ভাঙিয়ে দিল। বালিশে মুখ ডুবিয়ে নিজের শরীর অনুভব করেছিলেন দিব্যজ্যোতি। হঠাৎ কানে একটা শব্দ বাজল। না, খালি বাড়ির শব্দ নয়, লতিকার হাত থেকে মগ পড়ে গেছে নিশ্চয়ই। তিনি আবার ঘুমাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আর ঘুম আসছে না। দিব্যজ্যোতি চিৎ হয়ে শুতেই মনে হল লতিকা এখনও ফেরেননি। যতই হোক এতক্ষণ কারো বাথরুমে থাকা বাড়াবাড়ি। তিনি শুয়ে শুয়েই ডাকলেন 'লতু'। কেউ সাড়া দিল না। অথচ বাথরুমটা তো লাগোয়াই। দিব্যজ্যোতি উঠলেন। চশমাটা নিতে গিয়েও নিলেন না। ভেজানো দরজা, ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া নেই, দিব্যজ্যোতি আবার ডাকলেন, 'লতু? তোমার হয়ে গেছে?'

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করেও সাড়া না পেয়ে দরজায় চাপ দিতেই বুক নিংড়ে আর্তনাদ ছিটকে উঠল দিব্যজ্যোতির। লতিকা বাথরুমের মেঝেতে পড়ে আছেন।

দৌড়ে কাছে যেতে গিয়ে দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলালেন দিব্যজ্যোতি। শরীরটা যে এত বিকল হয়েছে তা আন্দাজেও ছিল না। তাঁর নিজের বুকই ধড়াস ধড়াস করছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। কোনোরকমে তিনি লতিকার শরীরের সামনে উবু হয়ে বসলেন। তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। হাত তুলে লতিকার কাঁধ ধরলেন তিনি, 'লতু লতু। কি হয়েছে লতু? কথা বল লতু।'

কোন সাড়া নেই। দিব্যজ্যোতি কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁর শরীরে এখন এমন সামর্থ্য নেই যে নীচে গিয়ে হাঁকাহাঁকি করে নিবারণকে ডাকবেন। কিন্তু একজন ডাক্তার আনা দরকার এই বোধ সক্রিয় ছিল তাঁর। নিজের সমস্ত মানসিক শক্তি জড়ো করে শক্ত হতে চাইলেন তিনি। তারপর আঙ্গুল নিয়ে গেলেন লতিকার নাকের সামনে। নিঃশ্বাস কি পড়ছে? বোঝা যাচ্ছে না। দিব্যজ্যোতির মনে হল তাঁর আঙ্গুলের চামড়া এত মোটা হয়ে গেছে বয়স হওয়ায়, যে সামান্য আলতো চাপ ঠাওর করতে পারছেন না। মুখ তুলতেই কল দেখতে পেলেন তিনি। কি মনে হতেই কলের মুখ ঈষৎ খুলতেই জল পড়তে লাগল লতিকার মাথায়। সেই জল তিনি হাতে নিয়ে বুলিয়ে দিতে লাগলেন ওঁর গলায় কপালে।

আচমকা অন্যতর ভাবনা এল। এখন লতিকা যদি এই ভাবেই চোখ বন্ধ রেখে চলে যায়? ওর এই সাধের নতুন বাড়িতে লতিকা ছাড়া তিনি কেমন করে থাকবেন? শুধু বাড়ি নয়, তাঁর প্রতিদিন অভ্যাসের সঙ্গে যখন লতিকা জড়িত তখন তিনি এর পরের দিনগুলো বাঁচবেন কি করে? বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল দিব্যজ্যোতির। তিনি প্রাণপণে লতিকাকে ডাকতে লাগলেন?

এই সময় চোখ মেললেন লতিকা। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা, জলের স্পর্শ এবং কানে নিজের নাম তাকে বিহ্বল করে তুলল। এবং তখনই তিনি স্বামীর মুখ দেখতে পেলেন। ধীরে ধীরে উঠে বসতে চেষ্টা করলেন লতিকা। দিব্যজ্যোতি জিজ্ঞাসা করলেন বিপর্যস্ত স্বরে, 'কি হয়েছিল লতু, তোমার কি হয়েছিল।'

ভেজা চুল, সিক্ত জামায় শীত করল লতিকার। চোখ বন্ধ করে বললেন, 'পড়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ মাথাটা—।' দুটি মানুষ পরস্পরকে অবলম্বন করে কোনক্রমে প্রচুর সময় নিয়ে খাটে ফিরে এল। লতিকা পোশাক পরিবর্তন করার শক্তি পেলেন না। সিক্তবস্ত্র মুক্ত হয়ে চাদরে শরীর মুড়ে পড়ে রইলেন এক পাশে। দিব্যজ্যোতি, শক্তিহীন, চোখের সামনে অন্ধকার নিয়ে, বুক ভর্তি যন্ত্রণার প্রথম পদক্ষেপ বুঝেও চাদর টেনে তাঁর পাশে শুয়ে। বালিশের নিচ থেকে কৌটো বের করে একটা সরবিট্রেট বের করে নিজের মুখে দিয়ে তারপর দ্বিতীয়টি লতিকার মুখের দিকে বাড়িয়ে দিতেই শুনলেন, 'কি?'

'সরবিট্রেট!'

'থাক।'

দুটো মানুষের শরীরে সাদা চাদর এমনভাবে পাশাপাশি টানটান যে আচমকা দেখলে দুটি মৃতদেহ মনে হওয়া অস্বাভাবিক হত না। লতিকার হাত বেরিয়ে এসে দিব্যজ্যোতির হাত আঁকড়ে ধরল। বাথরুমের খোলা কল তখন একটানা জল ঢেলে যাচ্ছে।

সন্ধেবেলার মানুষ

পর্দা উঠলে দেখা গেল মঞ্চ অন্ধকার। কয়েক মুহূর্ত যেতেই আমরা বুঝতে পারলাম এমনটা নাটকে ছিল না। উইংস-এর ওপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করলেন। কথাবার্তা যা ভেসে এল তাতে বুঝলাম বৈদ্যুতিক বিভ্রাট ঘটে গেছে।

আমরা উসখুস করতেই একটা মোমবাতি দেখা গেল। ছোট্ট আলো সামলে যিনি মঞ্চে এলেন তাঁর বয়স আন্দাজ করা মুশকিল।

মুখেই আলো জমায় মোটামুটি বয়স্ক ঠেকছে। ভদ্রলোক এগিয়ে আসতে আধো আলোয় মধ্যবিত্ত আসবাব দেখতে পেলাম।

'উপস্থিত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলারা। আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। এমনটা হবার কথা ছিল না সেটা বুঝতেই পারছেন। কথা তো অনেক কিছুরই থাকে না, হয়ে যায়, এবং হলে আমরা তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।'

'যা হোক, চুপচাপ বসে না থেকে আসুন আপনাদের সঙ্গে আমি একটু আলাপ পরিচয় করে ফেলি। আমরা আজ যে নাটকটি করব সেটি আমার পরিবারের কয়েকজনকে নিয়েই। যেহেতু আমিই একমাত্র রোজগেরে মানুষ, তাই আমাকেই কর্তা বলা হয়। আমার নামে বিয়ের কার্ড এলে স্ত্রী নেমন্তন্ন খেতে যান। তাই এই নাটকের প্রধান চরিত্র হিসেবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলার অধিকার আমার আছে।'

ভদ্রলোক মোমবাতিটা একটা টেবিলে সযত্নে রাখলেন। আলো সরতেই বুঝলাম ওঁর বয়স পঞ্চাশের গায়ে। কথা বলার ধরন মন্দ নয়।

'আমার নাম নিরাপদ মিত্র। একেবারে সাদাসাপটা নাম। আমি জীবনে কখনও কোন পাপ করিনি। যাকে বলে অন্যায়, তা কখনও করিনি, মিথ্যে কথা বলিনি। এই কথাগুলো আপনাদের কানে সোনার পাথরবাটির মত শোনাচ্ছে। কিন্তু এটাই সত্যি। আমি রাজ্য সরকারের একজন কর্মচারি এবং এখন পর্যন্ত ঘুষ নিইনি। এই বাড়িটা আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব কিনেছিলেন। গত কুড়ি বছরে হোয়াইট ওয়াশ করাতে পারিনি পয়সার অভাবে। খুব কষ্ট হচ্ছে সংসার চালাতে। এটা নতুন গল্প নয়। কিন্তু এ-বাড়িতে মনে হয় কষ্টটা আমি একাই করছি। আপনাদের এসব কথা বলছি জানলে বাড়িতে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। আমার বেশী কথা বলা বারণ।'

'আমরা চারজন এই বাড়িতে থাকি। আমার স্ত্রী নন্দিতা—! দাঁড়ান, নন্দিতার সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। পঁচিশ বছব আগে আমরা যখন বিয়ে করেছিলাম তখন ওর বয়স ছিল বাইশ। এই সাতচল্লিশে চেহারাটা খুব খারাপ রাখেনি। হ্যাঁ, আগে খুব ছিপছিপে ছিল, কথাবার্তায় মিষ্টত্ব ছিল। আমারই দোষে সেগুলো নষ্ট হয়েছে। তবে হ্যাঁ, ও যে দুটো বড়বড় ছেলেমেয়ের মা, তা দেখলে বোঝা যায় না। ডাকি ওকে, নন্দিতা, নন্দিতা—!'

'কেন?' ভেতর থেকে গলা ভেসে এল।

'একটু এ ঘরে আসবে?'

প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে উত্তর না পেয়ে নিরাপদ মিত্র আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'আমি অবশ্য সচরাচর এমন ডাকাডাকি করি না। অস্বস্তি হয়। আসলে ছেলে বা মেয়েকে যে গলায় ডাকি, স্ত্রীকে ডাকতে গেলেও তো সেই গলাতেই ডাকতে হয়। ভেবে দেখুন, ব্যাপারটা ঠিক নয়। আমার বাবা তো মাকে কোনদিন নাম ধরেই ডাকেননি।'

এই সময় সালোয়ার কামিজ পরা লম্বা গড়নের একজন ঘরে ঢুকল, 'ডাকছ কেন?'

'তোমাকে নয়, তোমার মাকে।'

'মা সেটাই জানতে চাইল।' মেয়েটার উচ্চারণ খুব স্পষ্ট।

'অ। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'কাজ ছিল!'

'কাজ? ইউনিভারসিটি ছুটি হয় চারটেয় আর রাত সাতটা পর্যন্ত কি কাজ কর?'

'রাত সাতটা নয়, সন্ধ্যে সাতটা।'

'আমার প্রশ্নের এটা উত্তর নয়।'

'বললাম তো কাজ ছিল।'

'না। থাকতে পারে না। বিকেলবেলার পর তোমার বয়সী মেয়ের কোন কাজ থাকতে পারে না। যদি দরকার হয়, সেই কাজ দিনের বেলায় করবে।'

'কেন?'

'আমার চিন্তা হয়।'

'তোমার ছেলে রাত নটার আগে বাড়ি ফেরে না। তাকে একথা বল না কেন?'

'আশ্চর্য! সে ছেলে, নিজের ব্যাপারটা সামলাতে পারে।'

'বাবা, তোমার ধারণা সন্ধ্যে নামলেই কলকাতায় রাস্তায় চিতাবাঘ আর হায়না ঘুরে বেড়ায়?'

'আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না।'

'না। তুমি আমাকে বোঝাও। সন্ধ্যের পর রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ ঘুরে বেড়ায়? মেয়েরাও কাজের জন্যে বের হয়। তোমার কি মনে হয়, সেইসময় ছেলেরা আমাদের অসম্মান করবে?'

'করতে পারে।'

'এই ছেলেরা কারা? শ্যামল বা তোমার মত কারো ভাই অথবা বাবা?'

নিরাপদ যেন স্তম্ভিত, 'তুমি কি বললে!'

'অবাক হয়ো না। কথাটা সত্যি। যারা মেয়েদের অসম্মান করে তারা আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসে না। আর সেই সব জন্তুগুলো দিনের বেলাতেও সক্রিয় থাকে। বাবা, আমরা এতকাল ভয় পেতাম আর তোমরা সেই ভয়টাকে হাওয়া করতে। কিন্তু এখন দিন বদলে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে তুমি অসুস্থ হলে আমাকেই ডাক্তার ডাকতে বেরুতে হবে। তাই না?' মেয়েটি বেরিয়ে গেল। নিরাপদ মিত্রকে বেশ বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। নিজেকে সামলে নিতেই বোকার মত হাসলেন। হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ে নীপা।'

অবশ্য অতবার বাবা ডাক শুনে আমরা সম্পর্কটা বুঝেই গিয়েছিলাম, তাই এটা না বললেও ওঁর চলত। নিরাপদ মিত্র এক পা এগিয়ে এলেন, 'জানেন মশাই, আজকাল নিজের মেয়েকে ঠিকঠাক বুঝতে পারি না। এমন সব কথা বলে যে, যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা মুশকিল হয়ে পড়ে কিন্তু মানতে কষ্ট হয়। হ্যাঁ, মানি, আজকালকার মেয়েরা আমাদের মা-মাসিমাদের মত নয়, কিন্তু কাগজ খুললেই এত ধর্ষণের ঘটনা চোখে পড়ে যে, বাবা হিসেবে আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায়? বলুন! যাকগে, মেয়ের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিলাম কিন্তু যাঁকে ডেকেছি তিনি এখনও এলেন না। শৈশবে দেখেছি ঠাকুর্দা বা বাবার কিরকম কন্ট্রোল ছিল ফ্যামিলির ওপর। মুখের কথা খসামাত্র কাজ হয়ে যেত। মা বাবার অবাধ্য হয়েছেন এমন ঘটনার কথা ভাবতেই পারি না। আর আজকাল—। আমিই একমাত্র আর্নিং মেম্বার কিন্তু আমাকেই তোয়াক্কা করে না। মা ভয় পেতেন দেখে আমরাও বাবাকে ভয় পেতাম। এখন ছেলেমেয়েরা মাকে দেখে শিখছে, কি করে বাবাকে অবজ্ঞা করা যায়!'

'ডাকছ কেন?' আধা অন্ধকারে এক মধ্যবয়সিনী প্রবেশ করলেন।

'তোমার মেয়ে আমাকে পাঁচ কথা শুনিয়ে গেল।'

'কেন খোঁচাতে যাও!'

'বাঃ। চমৎকার! রাত করে বাড়িতে ফিরবে আর বললেই দোষ!'

'কেন রাত হল জিজ্ঞাসা করেছ?'

'করেছি। বলল, কাজ ছিল। এটা কোন উত্তর হল?'

'যখন সংসারের কোন কাজ করবে না, তখন ওটাই উত্তর।'

'তার মানে? আমি সংসারের কাজ করি না!'

'কি কর? সকালে বাজারটা আর ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া। টাকা এনে দিচ্ছ বলে সাপের পাঁচ পা দেখেছ! নীপা এ ঘরে আসার আগেই তুমি ডেকেছিলে আমাকে!'

নিরাপদ হাত ছুঁড়লেন, 'মনে নেই। এ সব শোনার পর কিছু মনে থাকে না। এক এক সময় মনে হয় তোমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিই। এটা কি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। যখনই দেখা হয় তখনই দুরমুশ করছ। আমি যেন পাপোশ, দেখলেই পা ঘষছ।'

'হতে পারে। তোমার সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই। যা বোঝার তা একদিনে বুঝে নিয়েছি। যার সম্পর্কে আগ্রহ নেই তার সঙ্গে প্রেম করা যায় না।'

'ও আচ্ছা! তা তো বলবে। পাবলিক তোমার কথা শুনছে। বুঝে যাচ্ছে তুমি কী চীজ।'

চীজ! আমাকে তুমি চীজ বললে!'

'নয়তো কি? আমার সঙ্গে যখন কথা বল তখন যেন ড্রাম বাজছে আর যতীন যখন আসে তখন মনে হয় জলতরঙ্গ!

'যতীনবাবু! হাসালে! ওই সিড়িঙ্গে লোকটা সম্পর্কে আমার আগ্রহ হবে? তুমি তো এর বেশী ভাবতেও জানো না।' এইসময় কড়া নাড়ার আওয়াজ হতেই ভদ্রমহিলা দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

নিরাপদ মিত্র আমাদের দিকে তাকালেন 'এইরকম এক মহিলার সঙ্গে আমাকে ঘর করতে হচ্ছে। আমি অভিযোগ করছি না, নন্দিতা আমি ছাড়া আর সবার কাছে খুব ভাল। কিন্তু আমি আমার দোষটা বুঝতে পারি না। আমি অসৎ নই, মিথ্যে কথা বলি না, কখনও কোন পাপ করিনি। লাস্ট দশ বছর নন্দিতা মেয়ের সঙ্গে শুচ্ছে। মাঝে মাঝে ভাবি আমার সঙ্গে ওর বিয়ে না হলেই ভাল ছিল। ওর সঙ্গে প্রেম করার জন্যে পাড়ার একটি ছেলে ছটফট করত। বাবা মায়ের ভয়ে তাকে প্রশ্রয় দিতে পারেনি। এ গল্প বিয়ের দু-বছর বাদে শুনেছিলাম। ছেলেটার নাম কি যেন পার্থ, পার্থ সান্যাল। পার্থর সঙ্গে বিয়ে হলে নন্দিতা সান্যাল হয়ে এখন নিউ জার্সিতে থাকত। নন্দিতাই খবর এনেছে পার্থ এখন আমেরিকান শিল্পপতি। নিরাপদর জায়গায় পার্থ, হতেই পারত। ভাবতেই কেমন লাগে! আচ্ছা, এই নিয়ে নন্দিতার মনে আফসোস নেই তো! মুখে বলেনি কোনদিন, কিন্তু—।'

হঠাৎ ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'বাড়িতে ভূতের মত বসে আছ। সমস্ত পাড়ায় আলো জ্বলছে। ফিউজটা গেছে, এটা চেঞ্জ করতে পারোনি!'

সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতার গলা, 'কে করবে? যাঁর করার কথা তিনি তো ওই ঘরে দাঁড়িয়ে কাব্যি করছেন।'

নিরাপদ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এইসময় দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিলেন তিনি। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ছেলে ঘরে ফিরলেন। ছেলে না বলে, অপোনেন্ট বলাই ভাল। ওর সঙ্গে আলাপটা আপনারা নিজেরাই করে নিন। ততক্ষণ আমি হাতমুখ ধুয়ে নিই।'

নিরাপদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা চোখ বোলালাম। একটি অতি সাধারণ ড্রইং কাম ডাইনিং রুম। ঘরের দেওয়ালের চুন অনেক জায়গায় খসে খসে গিয়েছে। একটা সস্তা টেবিল এবং চারটে চেয়ার দেখতে পাচ্ছি একপাশে। এ দিকে তিনটে কাঠের চেয়ার মুখোমুখি। নন্দিতা ঘরে ঢুকলেন হাতে দুটো থালা নিয়ে। টেবিলে নামিয়ে রেখে গলা তুললেন 'খাবার দিয়েছি!' সঙ্গে সঙ্গে নীপাকে দেখা গেল জলের জাগ এবং তিনটে গ্লাস নিয়ে ঢুকতে। ব্যস্ততা

বাড়ল। নন্দিতা কয়েকবার সম্ভবত রান্নাঘরেই গেলেন এবং তিনটে থালায় খাবার ছাড়াও একটা আলাদা পাত্র মাঝখানে রইল। নীপা একপাশে চেয়ার টেনে বসতেই ঘরে শ্যামল এল। মাঝারি লম্বা, ছিপছিপে সুদর্শন, কিন্তু একটু চোয়াড়ে ভঙ্গী আছে। পরনে গেঞ্জি পাজামা। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ ঝুঁকে খাবারের থালার দিকে তাকাল। ওর মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল, 'ওঃ, সেই একঘেয়ে ব্যাপার!'

নন্দিতা বললেন, 'বোস'

চেয়ার টেনে নিল শ্যামল, 'ধুস্। এ ভাবে খাওয়া যায় না। একদিন একটু ভাল করে রাঁধতে পার না?'

নীপা বলল, 'ওই সয়াবিনের তরকারিটা আমাকে দিও না।'

ছেলে নয়, মেয়ের দিকে তাকালেন নন্দিতা, 'কি দিয়ে খাবে?'

'ডাল দিয়েই হয়ে যাবে।' নীপা হাত বাড়াল।

শ্যামল মায়ের দিকে ফিরল, 'আজ মাংস করতে বলেছিলাম না?'

নন্দিতা হাসার চেষ্টা করলেন, 'মাংসের কেজি কত করে জানিস?

'যতই হোক, লোকে তো খাচ্ছে।'

'কারা খাচ্ছে, কি ভাবে খাচ্ছে তা আমার জানার দরকার নেই।'

'তোর বাবা যে টাকা দেয় তা থেকে শেষদিকে মাংস কেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' নন্দিতা ঝাঁঝিয়ে উঠে দেখতে পেলেন নিরাপদ ঢুকছে। সেই গলায় তিনি বললেন 'এসব কথা রোজ রোজ শুনতে আমার ভাল লাগে না। তুমি জবাবদিহি দাও!'

নিরাপদ চেয়ার টেনে নিলেন। নন্দিতা বসলেন না। নিরাপদ বললেন 'আমার যা রোজগার তাতে এর চেয়ে বেশী হয় না শ্যামল। তুই পাসটাস করে চাকরি করলে ইচ্ছে মত খেতে পারবি।'

'চাকরি যেন হাতের মোয়া, চাইলেই পাব!' শ্যামল রুটি ছিঁড়ল।

নন্দিতা আরও বিরক্ত হলেন, 'এমনভাবে কথা বলছিস যখন, তখন কলেজে যাওয়াই বা কেন? তাতেও তো কিছু পয়সা বাঁচে।'

শ্যামল মায়ের দিকে তাকাল, 'আশ্চর্য! তোমরা কেউ সত্যি কথা ফেস করতে চাও না কেন বল তো? আজকাল যেখানে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেও চাকরি পেতে হিমসিম খেতে হচ্ছে, সেখানে আমার কোন চান্স নেই, বুঝলে?'

'ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করার চেষ্টা করছিস কখনও?' নন্দিতা যেন বাগে পেলেন।

'ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট ইচ্ছে করলেই করা যায় না, তার জন্যে প্রতিভা থাকা চাই। বাবা সেকেণ্ড ক্লাসে বি. এ. পাস করেছিল, তুমিও তাই। আমি গাছ থেকে প্রতিভা পেড়ে নেব?'

শ্যামল কথাটা বলা মাত্র নীপা উঠে গেল খাওয়া শেষ করে। নিরাপদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি, ওর খাওয়া হয়ে গেল?'

মাথা নাড়লেন নন্দিতা, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করো না, পাগল হয়ে গেলাম। ওনার সয়াবিনের তরকারিতে গন্ধ লাগে। নবাব কন্যা।'

শ্যামল বলল, 'বাবা মোটেই নবাব নয়। সাধারণ মানুষও বলা যায় না।'

নিরাপদ অবাক হলেন, 'আমি সাধারণ মানুষ নই!'

'না। এখন সাধারণ মানুষ শিখে গেছে বাঁচতে হলে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। যে দুশো টাকা রোজগার করত সে তিনশো পাওয়ার চেষ্টা করে। তুমি যত সব প্রিমিটিভ আইডিয়া নিয়ে বাস করছ। জামা কাপড়ের ইস্ত্রি নষ্ট হয়ে যাবে বাসে চড়লে, তাই দু'কিলোমিটার হেঁটে অফিসে যাও। আসলে রোজ দু'টাকা বাঁচাও। কিন্তু তোমার কলিগ শেয়ার ট্যাক্সিতে যায়। সে কিভাবে টাকা পায়?'

'যতীন ঘুষ নেয়।'

'তো কি হয়েছে?'

'তার মানে? তুই বলছিস কি!'

'আজকাল যখন এ টু জেড ঘুষ নিচ্ছে, তখন তুমি সৎ থেকে আমাদের এই সয়াবিন খাওয়াচ্ছ! সারা পৃথিবী আজ জেনে গিয়েছে ধরা পড়ে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ঘুষ অত্যন্ত স্বাভাবিক পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে মানুষ একটু সুস্থ-ভাবে বেঁচে থাকতে পারে।'

নিরাপদ স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'শুনছ, ও আমাকে ঘুষ নিতে বলছে?'

নন্দিতা জবাব দিলেন না।

শ্যামল বলল, 'মানুষের ধ্যানধারণা চিরকাল এক জায়গায় আটকে থাকে না। আজ থেকে দু'শো বছর আগে মেয়েরা পড়বে কেউ ভাবত না। পঞ্চাশ বছর আগে অফিসে চাকরি করার কথা চিন্তা করত না। এখন এ নিয়ে প্রশ্ন কেউ তোলে? এই যে মা, আচ্ছা, তোমার বয়স এখন কত বল তো? পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে, তাই না?'

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর বয়স নিয়ে তোর কি দরকার?'

'তোমার ঠাকুমা এমন কি তোমার মাকেও ওই বয়সে দেখেছ? কিভাবে শাড়ি পরত ওরা! দিদিমা দিদিমা টাইপ না? অথচ মাকে দ্যাখো; নীপার সঙ্গে কোন ডিফারেন্স পাবে না। এটাই স্বাভাবিক। আর তুমি সেই কথামালা জপে যাচ্ছ।'

নিরাপদ চুপচাপ খাচ্ছিলেন। এবার বললেন, 'দ্যাখো শ্যামল, এইসব কথা, যা তুমি বললে, তা আর আমার সামনে উচ্চারণ করো না। আমি যেভাবে এতদিন চালিয়েছি, বাকি কটা দিন সেইভাবেই চালাবো। শৈশব থেকে তোমাদের যেভাবে বড় করেছি তাতে কষ্ট থাকলেও স্বস্তি ছিল, আনন্দ ছিল। আজ বড় হয়ে যদি তোমার মনে হয়, আমার আচরণের জন্যে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে, তাহলে আমার কিছু করার নেই।'

শ্যামল আর কথা বলল না। নন্দিতা চেয়ার টেনে নিঃশব্দে বসে পড়লেন। কয়েক সেকেণ্ড যাওয়ার পর নন্দিতাই পরিবেশ স্বাভাবিক করার জন্যে বললেন, 'শ্যামল, তোর তো ফাইন্যাল ইয়ার এবার, ইউনিয়ন করা ছাড়।'

খেতে খেতে মুখ না তুলে শ্যামল জিজ্ঞাসা করল, 'চাকরি দেবে কে?'

'মানে!' নন্দিতা অবাক।

'তোমার কোনো ক্ষমতাবান দাদা বাবা ভাই আছে?'

'না।' মাথা নাড়লেন নন্দিতা।

'তোমার?' নিরাপদর দিকে তাকাল শ্যামল।

'আমাকে কেউ হেল্প করেনি কখনও।'

'কারণ তাঁরা সবাই অর্ডিনারি। আজকাল ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সোর্স না থাকলে যে চাকরি পাওয়া যায় না তা একটা শিশুও বোঝে। আমার কেউ নেই তাই আমি ইউনিয়ন করছি। নিচু তলার নেতাদের সঙ্গে ভাবসাব হয়ে গেছে। আর একটু ওপরে উঠলে সোর্সটা অনেক বড় হয়ে যাবে। এখন কেউ ইউনিয়ন রাজনীতি বখে যাওয়ার জন্যে করে না, গুছিয়ে নেবার গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক এটা। উঠছি।' শ্যামল খাওয়া সেরে উঠে দাঁড়াল, 'তোমার সঙ্গে আমার কোনদিন বনবে না বাবা।'

নিরাপদ বললেন, 'হয়তো।'

'কিন্তু আমি আমার কর্তব্য করে যাব।'

'ভাল। তবে না করলেও আমি দুঃখিত নই। তোমাদের বড় করা কর্তব্য, করেছি। কিন্তু তার বদলে আমার কোন প্রত্যাশা নেই। যে যারটা বুঝে নিয়ে ভাল থাকলেই হল।'

শ্যামল আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। নন্দিতা স্বামীর দিকে তাকালেন, 'কথাটা ভেবে চিন্তে বললে?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়ের বিয়ে দেবার পর তোমার হাতে কিছু থাকবে? রিটায়ারমেন্টের আর ক'বছর দেরি খেয়াল রাখো! তারপর যদি ছেলে না খাওয়ায়—।'

'তোমাকে খাওয়াবে!'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, একশবার খাওয়াবে। কারণ তোমার মত হাড়ে দুব্বো গজানো কথা ওদের সঙ্গে আমি বলি না। তখন দেখব তুমি কি কর!' রাগত নন্দিতা থালা গ্লাস তুলতে তুলতে কথাগুলো বলে ওগুলো নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিরাপদর হাতে তখন জলের গ্লাসটা। তাঁর থালা ভেতরে চলে গিয়েছে। জলটা গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কয়েক পা এগিয়ে এলেন আমাদের সামনে, 'এই হল আমার সংসার। সবাই সবার মত ভাল। তা এরকমটা চলে যেত। কিন্তু আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। আজ সকালে একটা পোস্টকার্ড পেয়েছি। ওটা এসেছে কুচবিহার থেকে। যখন অফিসে বেরুচ্ছিলাম তখন পিওন আমার হাতে দিল। ওটা পাওয়ার পর আমি যাকে বলে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। কাউকে বলতে পারছি না। কি বলব? বললে তো অনেক কথা বলতে হয়। আমি মিথ্যে কথা বলি না। কিন্তু এই সত্যি কথাগুলো কেউ বিশ্বাস করবে? ধ্যানধারণা বদলাচ্ছে! ঘেঁচু। মানুষ আদ্যিকালেও

সন্দেহ করতে ভালবাসত, এখনও বাসে। কিন্তু চেপে যাওয়ার উপায় নেই। সর্দি অথবা বসন্ত যেমন শরীর থেকে বের হবেই, এও তেমন। এখন যে চিঠি লিখে বারণ করব তার উপায় নেই। নিজের মুখে বললে অনেক কথা বলতে হয় তাই সন্ধ্যেবেলায় পোস্টকার্ডটা আমাদের লেটারবক্সে ফেলে এসেছি। ওরাই বাক্সটা খুলুক, দেখুক। তারপর যা হয় হবে।'

মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। আবার আলো ফুটলে দেখলাম পেছনের জানলা খোলা। ওই একই ঘর কিন্তু জানলার বাইরে সকালের কচি আলো। সময়টা সকাল বলেই মনে হচ্ছে। একটা পোস্টকার্ড পড়তে পড়তে নীপা ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল,'চিঠি এসেছে।'

নন্দিতার গলা পাওয়া গেল, 'কার?'

নীপা মন দিয়ে পড়তে লাগল। জবাব দিল না ।

ঘুমঘুম চোখে শ্যামল ঘরে ঢুকল, 'কার চিঠি রে?'

'অদ্ভুত!' নীপা বলল, 'মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিনা। মা, এ ঘরে এসো!'

নন্দিতা ঢুকলেন। নীপা বলল, 'বাবার নামে চিঠি এসেছে।'

'কে লিখেছে?'

'কল্যাণী।'

'সে আবার কে? কোথায় থাকে?'

'কুচবিহার।'

'কুচবিহার! ওখানে ওর কেউ থাকে বলে জানতাম না তো! কি লিখেছে? পড়!'

নীপা পড়তে শুরু করল, শ্রীচরণকমলেষু, আশাকরি ভাল আছ। দীর্ঘ তিরিশ বছর পর নিতান্ত বাধ্য হয়ে তোমাকে চিঠি লিখছি। অনেক কষ্টে তোমার ঠিকানা পেয়েছি। আশা করছি তুমি আমাকে ভুলে যাওনি। আমার একমাত্র মেয়ে মালবিকা অসুস্থ। এখানকার ডাক্তার রোগ ধরতে পারছে না। তারা কলকাতায় যেতে বলছে অথচ সেখানে আমার কোনোও বলভরসা নেই। তাই তোমার সাহায্য চাই। আমরা আগামী মঙ্গলবার তিস্তা তোর্সায় রওনা হব। যদি তোমার আপত্তি থাকে তাহলে অবিলম্বে জানাও। প্রণাম নিও। ইতি, কল্যাণী।'

নন্দিতার মুখ থেকে শব্দ ছিটকে বের হল, 'কি আশ্চর্য! এখানে এসে উঠছে নাকি?'

নীপা বলল, 'বাবার কাছে সাহায্য চেয়েছে।'

শ্যামল বলল, 'আর লোক পেল না? বাবা কাকে চেনে?'

নন্দিতা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন, 'কোথাকার কে, ফস করে লিখে দিল যে আসছে!'

নীপা পলল, 'বাবার কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয়া?'

নন্দিতা অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাত উল্টে বললেন, 'কে জানে!'

এই সময় বাজারের ব্যাগ হাতে নিরাপদ ঘরে ঢুকে বললেন, 'কাঁচা লঙ্কা আবার আকাশছোঁয়া হয়ে গেল।'

'কল্যাণী কে?' নন্দিতা প্রশ্নটা ছুঁড়ল।

'কল্যাণী—!'

'চিঠিটা দে নীপা।'

নীপা চিঠিটা এগিয়ে দিতে নিরাপদ সেটায় চোখ রাখলেন।

'কল্যাণী বলে কাউকে চেন না?'

'চিনতাম।'

'সে কে?'

'মালদায় থাকত। কুচবিহারে গিয়েছে জানতাম না।' নিরাপদ বললেন, 'মালদার মোকদ্দমপুরে আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। আমি তখন কলেজে পড়ি আর ও, কত হবে ক্লাস নাইন টেন—। অবশ্য সেই কল্যাণী আর এই কল্যাণী এক কিনা বলতে পারব না।'

নীপা বলল, 'লিখেছে তিরিশ বছর পরে চিঠি লিখেছে, তাহলে এক হতেই পারে। বিয়ের পর মালদা থেকে কুচবিহার চলে গেছে।'

'হতে পারে। ওর বিয়ের আগেই আমরা কলকাতায় চলে আসি।'

নন্দিতা আর পারছিলেন না, 'তোমার সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিল?'

'সম্পর্ক? তখন আর কি সম্পর্ক হবে! আমার কাছে অঙ্ক করতে আসত।'

'তুমি ওকে পড়াতে?'

'টাকা নিতাম না, দেখিয়ে দিতাম।'

'কোন সম্পর্ক না থাকলে এতদিন পরে এখানে এসে ওঠে?'

'এখানে ওঠার কথা তো লেখেনি।'

'আর কি লিখবে? শোন, এখানে ওর ওঠা চলবে না। আজই লিখে দাও।'

'বেশ। কিন্তু—।'

'আমার কিন্তু কিসের!'

'যা লিখেছে তাতে তিস্তা তোর্সায় আজই পৌঁছাবার কথা। মঙ্গলবার রওনা হলে বুধবার, বুধবার তো আজই। চিঠি আসতে অনেক সময় লেগেছে।'

'সে কি!' নন্দিতা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'তাহলে কি হবে?'

শ্যামল বলল, 'চেচাঁচ্ছ কেন? যদি আসে, চা খেতে দিও, ফ্রেস হয়ে গেলে নিজেরাই বলবে কোথায় যাবে! আফটার অল বাবার পরিচিত।'

'তিস্তা তোর্সা কখন আসে বাবা?' নীপা জিজ্ঞাসা করল।

'সকালে।' নিরাপদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

নীপা চোখ বড় করল, 'বাবা ট্রেনের টাইম পর্যন্ত জানে।'

'গার্ল ফ্রেণ্ড আসছে তো!' শ্যামল আস্তে করে বলল।

'আসাচ্ছি। উঃ। পেটে পেটে এত! এতবছর ঘর করছি, কখনও বলেনি।' নন্দিতা গজ গজ করতে করতে চলে গেলেন।

শ্যামল বলল 'আমার না কেমন সন্দেহ হচ্ছে বাবা পোস্টকার্ডটার খবর জানত!'

'হ্যাঁ রে! সিলমোহর না দেখেই সব বলে দিল চিঠি আসতে সময় লেগেছে।'

'প্লাস, তিস্তা তোর্সার সময় আগে থেকে জানার কোন কারণ নেই। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে। একটা ট্যাক্সির শব্দ হল মনে হচ্ছে! দাঁড়া, দেখি।'

'মুখ ধুসনি, ভূতের মত বাইরে যাচ্ছিস? তুই বাথরুমে যা, আমি দেখছি। ও হ্যাঁ, বাবার ঘরে একটা তোয়ালে আছে, ওটা বাথরুমে রেখে দে। গামছাগুলোর যা অবস্থা!' নীপা ভাইকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

শ্যামল গালে হাত বোলালো, তারপর জানলায় গিয়ে দাঁড়াল, 'অই বাপ!' তারপর উত্তেজিত গলায় ডাকল, 'মা, মা।'

নন্দিতা এলেন, 'কি হল?'

'এসে গেছে!'

'সেকি!'

'হ্যাঁ, বেডিং নিয়ে এসেছে। তোবার বয়সী মহিলা। ফর্সা, সঙ্গে একটা মেয়ে। দেখে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে না।'

'মনে হচ্ছে না?'

'না। দিব্যি নীপার সঙ্গে কথা বলছে।'

'বলাচ্ছি।'

'মা, তুমি আবার ওদের সামনে রাগ করো না। আফটার অল দে আর কামিং ফ্রম কুচবিহার। নীপা স্যুটকেশ নিয়েছে, ভদ্রমহিলা বেডিং।

'তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?'

'বাথরুমে যাব। যাচ্ছি।' শ্যামল হড়বড়িয়ে গেল ভেতরে।

নন্দিতা কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ছেঁড়া কাপড় তুলে টেবিল পরিষ্কার করতে লাগলেন, চেয়ারগুলো ঝাড়লেন। এবং তখনই নীপা স্যুটকেশ হাতে ঢুকল, 'মা!'

বেডিং নিচে নামিয়ে কল্যাণী হাত জোড় করলেন, 'নমস্কার!'

নন্দিতা প্রতিনমস্কার করলেন। তাঁরই বয়সী হতে পারে কিন্তু ভারী চেহারা। মাথায় সিঁদুর নেই, লক্ষ্য করলেন। নীপা বলল, 'আমি বলেছি আমরা আজই চিঠি পেলাম।'

কল্যাণী বললেন, 'শুনে খুব খারাপ লাগছে—।'

'না, ঠিকই আছে, বসুন। তোমার নাম কি?'

সতেরো আঠারোর মেয়েটি শান্ত গলায় জবাব দিল, 'মালবিকা।'

'ওরই চিকিৎসার জন্যে আসা। আপনাদের তো চেনার কথা নয়, যিনি চিনতেন তিনি এখন আমাকে দেখলে চিনতে পারবেন কিনা সন্দেহ হচ্ছে। অনেককাল আগের কথা তো?'

'বাবা চিনতে পেরেছেন। আপনি বাবার কাছে পড়তে যেতেন তো!'

'যাক, মনে আছে তাহলে!'

'মা, বাবা কোথায়? বাবা, বাবা!' নীপা চেঁচালো।

নন্দিতা বললেন, 'বসুন।'

এই সময় নিরাপদ ঘরে এলেন। তাঁর চোখেমুখে বিস্ময়। বিস্ময় কল্যাণীর মুখেও। প্রথম কথা বললেন কল্যাণীই, 'তুমি প্রায় একই রকম আছ নিরাপদদা।'

'একই রকম কি থাকা যায়, বয়স হচ্ছে না।'

'আমাকে চিনতে পারছ?'

'মুখ পাল্টায়নি, মোটা হয়েছে।

'এই আমার মেয়ে। বাঁ হাতে প্রণাম করা ঠিক নয়, তাই প্রণাম করতে পারছে না।'

'কেন? ডান হাতে কি হয়েছে?

'ওই তো মুশকিল। ডাক্তাররা ধরতে পারছে না। ডানহাত নাড়তেই পারছে না ও। যা করার বাঁ হাতে করতে হচ্ছে। অথচ ডান হাত একটুও অবশ হয়নি।'

নীপা বলল, 'মালবিকা, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

মালবিকা তার মায়ের দিকে তাকাল। কল্যাণী বললেন, 'নিরাপদদা, কলকাতায় আমার কোন আত্মীয়স্বজন নেই। ওর চিকিৎসার জন্যে আমাকে কিছুদিন এখানে থাকতে হবে। একজন ভাল ডাক্তার আর থাকার ব্যবস্থা তুমি করে দাও।'

'আমি তো তেমন কাউকে—!' বিড়বিড় করলেন নিরাপদ।

'ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' শ্যামলের গলা পাওয়া গেল। পরিষ্কার হয়ে সে ঘরে ঢুকল, 'আমাদের ইউনিয়নের একটি ছেলের বাবা নামকরা নার্ভের ডাক্তার, আপনি চিন্তা করবেন না। মা, এঁরা এখনও দাঁড়িয়ে আছেন, কিরে নীপা—।'

'আপনার ছেলে?' কল্যাণী নন্দিতার দিকে তাকালেন।

শ্যামলই জবাব দিল, 'হ্যাঁ। ও বড় আমি ছোট। এবার বি.এ. দেব।'

নন্দিতা কিছুই বলতে পারলেন না, তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

শ্যামল বলল, 'মা ওনাকে নিয়ে যাও। কতদূর থেকে এসেছেন, ফ্রেস হওয়া দরকার।'

কল্যাণী শ্যামলের দিকে তাকিয়েছিলেন। এবার নন্দিতার কাছে এলেন, 'আপনার ছেলে কিন্তু নিরাপদদার ধরনটা পায়নি, বরং মেয়ের সঙ্গে খুব মিল আছে। আচ্ছা বউদি, আমি এভাবে এসে পড়ায় আপনার তো কোন অসুবিধে হয়নি?'

'ওমা! আমার অসুবিধে হবে কেন? আসুন। আসলে এখানে জায়গার বড় সমস্যা। সেই আদ্যিকালের বাড়িটাকে বাড়াবার কোন চেষ্টা করেননি আপনার দাদা।' নন্দিতা উঠলেন। কল্যাণীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মালবিকার বাবা—?'

'পাঁচ বছর।'

'ও!' নন্দিতাকে সত্যি বিমর্ষ দেখাল। তিনি কল্যাণীকে নিয়ে চলে গেলেন।

শ্যামল বেডিংটাকে নিয়ে এল একপাশে। এইসময় নিরাপদ ঢুকলেন। ছেলেকে বেডিং সরাতে দেখলেন, 'তোর মাকে জিজ্ঞাসা কর বাজার থেকে কিছু আনতে হবে কিনা।'

'এই তো বাজার করে নিয়ে এলে!'

'হ্যাঁ, তবু মানে ওরা—।'

'হলে মা বলবে।' শ্যামল বেরিয়ে গেল।

নিরাপদ চেয়ারে বসলেন। চোখ বন্ধ করলেন। নন্দিতা বললেন, 'বসে না থেকে বেরোও।'

চমকে চোখ খুললেন নিরাপদ, 'মানে?'

'একটা মোটামুটি হোটেল খুঁজে এসো।'

'হোটেল? এ পাড়ায় হোটেল আছে নাকি?'

'যে পাড়ায় আছে, সেখানে যাও।'

'আমার অফিস?'

'খুঁজতে দেরি হলে যাবে না। সি এল নেবে।'

'বেশ। কিন্তু ওরা দুটি মেয়ে হোটেলে থাকবে, ঠিক হবে?'

'বাঃ, চমৎকার! আমাকে যখন একা আড়িয়াদহে যেতে বল, তখন এমন দুশ্চিন্তা হয় না! আমি কোন কথা শুনতে চাই না, আজ বিকেলেই ওদের বিদায় করো।'

'আস্তে কথা বল নন্দিতা!'

'তোমাদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন ভিলেনের মত আচরণ করছি।' নন্দিতা গলা নিচে নামালেন, 'আমি তোমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করিনি বিয়ের আগে কতটা প্রেম ছিল? সেই প্রেম স্বর্গে ছিল না মাটিতে নেমেছিল! বুক জ্বলে যাচ্ছে তবু জিজ্ঞাসা করিনি। কারণ কি জানো?'

নিরাপদ নীরবে মাথা নেড়ে না বললেন।

'ওই যে, আমি কখনও মিথ্যে বলি না, পাপ করি না—! ফস করে সদি সত্যি কথাটা বলে ফেল তা হলে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো!'

'সত্যি কথা?'

'নইলে কোন জোরে এত বছর বাদে এখানে এসে ওঠে? তার ওপর স্বামী নেই, সোনায় সোহাগা।'

'স্বামী নেই মানে?'

'পাঁচ বছর আগে বিধবা হয়েছেন। তার আগে থেকেই স্কুলে পড়ান।'

'ও।'

'শুনে দুঃখু উথলে উঠছে?'

'যা তা বকছ!'

'শোন, আমার এখানে তিনটে ঘর। একটায় আমি আর নীপা শুই আর একটাতে তুমি আর শ্যামল। এই ঘরটায় কেউ শুতে পারে না। পারে?'

'এমনিতে পারার কথা নয়। রাত্তিরে আরশোলা বের হয়। ওদের আমি আমার শোওয়ার ঘরে ঢোকাতে পারব না।'

'আচ্ছা!'

'যাও। ওঠো, হোটেল খুঁজে এসো। যাও!'

নিরাপদ উঠলেন এবং নীপা ঢুকল, মা, মেয়েটা খুব ভাল।'

নিরাপদ মেয়ের দিকে তাকালেন।

'ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে। চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। আমি অনেক বলতে একটি শোনাল। বেচারা ডান হাতটা একদম নাড়াতে পারে না। কথা বলে নিচু গলায়। খুব কষ্টে আছে।'

'আর কিছু?' নন্দিতা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আহা, একটা ভাল মেয়েকে ভাল বলব না?'

নিরাপদ বললেন, 'যাই?'

শ্যামল এল ঘরে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'হোটেল খুঁজতে।'

'ইটস টু মাচ। অসুবিধে হলে আমাকে বল, আমি গেস্ট হাউস ঠিক করে দেব।'

'গেস্ট হাউস?' নিরাপদ অবাক।

'হ্যাঁ। পার্টির লোকদের ওসব জানাশোনা আছে। খরচ কম হবে।'

'তাহলে তো হয়ে গেল।'

'মা, মালবিকাকে আজ যাতে ডাক্তার দেখানো যায় তার ব্যবস্থা করছি। বুঝলে।'

নন্দিতা কোন কথা না বলে ভেতরে চলে গেলেন। নিরাপদ বললেন, 'কী যে সব হয়ে গেল বল তো।'

নীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কি আবার হবে!'

'ওরা এল, তোদের মায়ের অসুবিধে হবে বুঝতে পারছি—!'

'মা প্রথম প্রথম ওরকম করে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। তোমার বন্ধু, বিপদে পড়েছে—।'

'বন্ধু?'

'বাঃ, একই পাড়ায় থাকতে, তোমার চেয়ে তো বেশী ছোট নয়।'

'আমাদের সময়ে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের বন্ধুত্ব হত না।'

'কেন?'

'বড়রা সেটা স্বাভাবিক চোখে দেখত না।'

'তাহলে মেলামেশা করলে কি বলা হত?'

'ভাইবোনের সম্পর্ক ভাবা হত।'

'উনি তোমাকে দাদা বলে চিঠি লিখেছেন, ওই নিয়মেই?' নীপা হাসল।

'নিয়ম আবার কি! যখনকার যা চল।'

শ্যামল হেসে ফেলল, 'সমবয়সী হলে?'

'কথাই হত না। হলে সেটা স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হত না।'

নীপা হাসল, 'তাহলে কল্যাণীপিসিকে তোমার গার্লফ্রেণ্ড বলা যাচ্ছে না?'

'বললাম তো আমাদের সময় ওসবের রেওয়াজ ছিল না।'

শ্যামল ঝাঁকিয়ে উঠল, 'তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন মান্ধাতার বাবার আমলের লোক। তিরিশ বছর আগে, মানে নাইনটিন সিক্সটি টু, উত্তমকুমার সুচিত্রা সেনের ছবি সুপারহিট, 'এই পথ যদি না শেষ হয়' গান গাওয়া হয়ে গেছে। গুল মারছ। আমি বেরুলাম। মালবিকার ডাক্তার ঠিক করে আসি।' শ্যামল চলে গেল।

নীপা পাশে এসে দাঁড়াল 'হ্যাঁ বাবা, ষাট একষট্টিতে অপুর সংসার বেরিয়ে গেছে।'

'তো কি হয়েছে?'

'যুগটা প্রাচীন ছিল না।'

'ওটা সিনেমায়, জীবনে নয়। তখন সন্ধ্যার পর কোন মেয়েকে ট্রামে দেখা যেত না।'

'তোমার কথা শুনলে মনে হচ্ছে সতীদাহ প্রথা যখন চালু ছিল তার থেকে ওই সময়টা খুব বেশী এগোয়নি।' নীপা চলে যাচ্ছিল। নিরাপদ তাকে ডাকলেন, 'শোন।'

নীপা দাঁড়াল।

নিরাপদ বললেন, 'কখনও কখনও এগোয় না। এই যেমন তোর মা। রামমোহনের সময় একজন মা যেভাবে রিঅ্যাক্ট করতেন বিরানব্বইতে ইনি একইভাবে করছেন।'

'ছাই। মা ভয় পাচ্ছে খরচ কুলোতে পারবে না ভেবে। তুমি এক্সট্রা দেবে না।' নীপা বেরিয়ে গেল। একটু চুপ করে বসে নিরাপদ পাঞ্জাবিটা খুলতে গিয়ে সামলে নিলেন কল্যাণীকে ঢুকতে দেখে। হাসার চেষ্টা করলেন।

'তোমার অফিসের দেরি হচ্ছে না তো নিরাপদদা?'

'না, না।'

'বিশ্বাস করো কোন উপায় ছিল না।'

'আরে ঠিক আছে।'

'তুমি কিন্তু বেশী পাল্টাওনি। শুধু চুল খসে গিয়েছে। কী সুন্দর কোঁকড়া চুল ছিল তোমার! ঢেউ খেলানো, সামনে সিঙাড়া। আমরা উত্তমকুমার বলতাম, মনে আছে।'

'হুঁ।'

'সব চলে যায়।' নিঃশ্বাস ফেললেন কল্যাণী, 'আমার কথা তোমার মনে ছিল?'

নিরাপদ ঢোঁক গিললেন, 'ওই, মানে ছেলেবেলার কথা মনে হলে—।'

'ব্যস?'

'আসলে সংসারের চাপে দম ফেলার উপায় নেই।'

'তোমার ছেলেমেয়ে দুটি খুব ভাল। ওদের মা-ও।'

'মালবিকার বাবার কি হয়েছিল?'

'আট বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। দুবার স্ট্রোক হয়েছিল। তৃতীয়বারে চলে গেলেন।'

'ও। সব একাই সামলাতে হচ্ছে?'

'দোকা কোথায় পাব? মেয়েটার বিয়ে দেব ভাবছিলাম, তা দ্যাখো এই কাণ্ড। ওই মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে?'

'কি করে হল?'

'হঠাৎই।'

'নিরাদা, তোমার মনে আছে, তুমি আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলে?'

'চিঠি?'

'হ্যাঁ। আমি যেন মন দিয়ে পড়াশুনা করি, বাচাল না হই, পাড়ার যেসব ছেলে আমার সম্পর্কে আগ্রহী তাদের পাত্তা না দিই, এসব উপদেশ দিয়েছিলে। চিঠিটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। খুব রাগ হয়েছিল, তাও।'

'হ্যাঁ, তুমি খুব ছটফটে ছিলে।'

'আর?'

'মাথায় গোবর ছিল। তিনচারবার করে বোঝাতে হত।'

'আমি জানি নিরাদা আমাকে দেখে তুমি খুশী হয়েছ। কিন্তু তুমি ভাল নেই।'

'যা বাজার, তাতে ভাল থাকা যায়! বড় চাকরি তো পেলাম না।'

নিরাপদ উঠে দাঁড়ালেন। নীপা চায়ের দুটো কাপ নিয়ে এল, 'মালবিকা চা খায় তো?'

'মাঝে মাঝে।' কল্যাণী জবাব দিলেন।

'মালবিকা, এঘরে এসো।' নীপা চেঁচালো।

'বাবাকে চা দেবে না?'

'বাবা এককাপ খেয়েছে আর খাবে না। পিটপিটে আছে তো।'

মালবিকা এল। নীপা বলল, 'নাও, তোমার চা।'

মাথা নাড়ল মেয়েটি, লাজুক হাসল।

'তাহলে কি খাবে?'

'তাই? আমেরিকায় যাওয়ার ইচ্ছে আছে নাকি?'

'যদি সুযোগ পাই—।'

'কিছু না।'

নিরাপদ বললেন, 'ওকে মুড়ি এনে দে। আর চা বেশী হলে আমাকেই দিতে পারিস!'

নীপা অবাক হয়ে বাবাকে কাপটা দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নাকি খুব ভাল গান গাও?'

'না, না।' লজ্জা পেল মালবিকা।

'শুনলাম। একদিন শুনতে হবে তোমার গান।'

কল্যাণী বললেন, 'কুচবিহারে ও রবীন্দ্রসংগীতে প্রথম হয়েছে। এই হাতের ব্যাপারটা হওয়ার পরই সব থামাতে হচ্ছে।'

নীপা এল একবাটি মুড়ি নিয়ে। টেবিলে রেখে ইশারা করল মালবিকাকে। কল্যাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি পড়?'

'এম. এ.। জি আর ই দিয়েছি।'

'সেটা কি?'

নিরাপদ জবাব দিলেন, 'পাগলামি। আমেরিকায় পোস্টগ্র্যাজুয়েট পড়তে যাওয়ার জন্যে একটা পরীক্ষা দিতে হয়। ও জোর করে দিয়েছে।'

'জোর করে কেন?'

'আমাদের ঘরের মেয়ে কি আমেরিকায় পড়তে যেতে পারে?'

'ওরা পড়ার খরচ দেবে না? মানে স্কলারশিপ?'

'তা হয়তো দেবে। কিন্তু প্লেন ভাড়া দেবে কে?'

'যদি পাস করে তাহলে তোমার দেওয়া উচিত নিরাপদদা।'

কল্যাণীর কথার শেষে নন্দিতা ঢুকলেন, 'কেন? এদেশে এম. এ. পড়া যায় না?'

নীপা বলল, 'যায়। তারপর আর কিছু হয় না। আর ওদেশে পড়াশুনা করে কেউ বেকার বসে আছে এমন একটা উদাহরণ দেখাতে পারবে না।'

নন্দিতা মাথা নাড়ালেন, 'অদ্ভুত। দেখুন তো ভাই, ওই একা মেয়ে অদ্দুরে যাবে? কোনদিন একা বর্দ্ধমানেও যায়নি। আমি তো প্রার্থনা করছি ও যেন পাস না করে।'

'তা তো করবেই। মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু হয়।'

কল্যাণী বললেন, 'অবশ্য খরচের দিকটাও দেখতে হবে।'

'খরচ?' নীপা মুখ ফেরাল, 'আমার বিয়েতে বাবা খরচ করত না?'

কল্যাণী মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, করতেই হবে।'

'সেটা না করে প্লেন ভাড়া দিয়ে দিক, অনেক কমে হয়ে যাবে।'

'অদ্ভুত কথা! তারপর বিয়ের সময় কি হবে?' নন্দিতা চেঁচিয়ে উঠলেন।

'সেটা আমি বুঝব। তোমাদের চিন্তা করতে হবে না।' নীপা গম্ভীর মুখে বলল, 'মেয়েরা বড় হলে বিয়ে ছাড়া তোমরা চিন্তা করতে পার না? যেন বিয়ে দিলেই কাঁধ থেকে বোঝা

নামাতে পারলে। সেই বিয়ে ক্লিক না করলে তো জীবনটাই নষ্ট, তা ভাবতে চাও না। তাছাড়া, বিয়ে ছাড়া মেয়েদের অনেক কিছু করার আছে, এটা বুঝতে চেষ্টা কর।'

নন্দিতা রেগে গেলেন, 'ঠিক আছে, ও যদি পাস করে তাহলে প্লেন ভাড়া দিয়ে দিও। তারপর কোন প্রয়োজন হলে আমাদের কাছে এসো না।'

কল্যাণী বললেন, 'ওদেশে যদি আত্মীয়স্বজন থাকে, তাহলে একা গেলে তেমন অসুবিধে হবার কথা নয়। কেউ নেই?'

নিরাপদ মাথা নাড়লেন, 'আমাদের ফ্যামিলির কেউ বিদেশে যায়নি।'

নীপা বলল, 'আমার মামার বাড়ির দিকেও কেউ নেই। অথচ আমার বন্ধুদের কেউ না কেউ লণ্ডনে অথবা নিউ ইয়র্কে থাকে।'

'নিউ ইয়র্ক। না, নিউ জার্সি—।' উচ্চারণ করেই থেমে গেলেন নিরাপদ।

'নিউ জার্সি মানে?' নীপা জিজ্ঞাসা করল।

'ওটা আমেরিকার একটা জায়গায় নাম।'

'সেটা জানি। সেখানে তোমার পরিচিত কেউ থাকেন?'

'আমার নয়।' নিরাপদ ফাঁপরে পড়লেন, 'তোর মায়ের পাড়ায় একজন থাকত, সে এখন ওখানে আছে। খুব বড় শিল্পপতি।' নিরাপদ বলে ফেললেন।

'আমার পাড়ায়? কি যা তা বলছ?' নন্দিতা খেঁকিয়ে উঠলেন।

নিরাপদ স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'তোমার এখন মনে নেই।'

'আশ্চর্য! আমার মনে নেই আর তুমি মনে রেখে বসে আছ! তুমি দেখেছ তাকে?'

'না। তুমি বলেছিলে।'

'আঃ, নামটা বলবে তো?'

'পার্থ। পার্থ সান্যাল।' নিরাপদ স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্ট করলেন।

'অসম্ভব।' শব্দটা ছিটকে এল নন্দিতার মুখ থেকে।

'অসম্ভব কেন?' নীপা জানতে চাইল।

'ওঃ। তুমি! তুমি এখনও মনে করে রেখেছ? ওর ওখানে নীপা যাবে?'

নিরাপদ মাথা নাড়লেন, 'যাবে বলিনি। কারো নাম মনে পড়ছিল না বলে ওর কথা মনে এল। তা ছাড়া, ভদ্রলোক তো আমারই বয়সী। ওখানে এখন প্রতিষ্ঠিত।'

'আপনাদের আত্মীয়?' কল্যাণী জানতে চাইলেন।

'না, না। পাড়ায় থাকত। বাজে টাইপের ছেলে। মেয়েদের দেখলেই পেছনে লাগত।' নন্দিতার গলায় একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল।

'ছেলে বলছেন?' কল্যাণী একটু অবাক।

'তিরিশ বছর আগে ছেলে ছিল, এখন প্রৌঢ়।' নিরাপদ বললেন।

নীপা হেসে উঠল শব্দ করে, 'মা, তুমি একটা যাচ্ছেতাই! তিরিশ বছরে মানুষের সব কিছু পাল্টে যায়। ভদ্রলোক ওদেশে প্রতিষ্ঠিত মানে কি বোঝ না?'

নন্দিতা বলতে বাধ্য হলেন, 'এতগুলো বছর আমি যাকে জানি না, তার কাছে তুই যাবি! তার ঠিকানাও আমার জানা নেই।'

'ঠিকানা বের করতে অসুবিধে কি? আড়িয়াদহে নিশ্চয়ই ওঁর আত্মীয়স্বজন থাকেন। তাঁরাই বলে দেবেন। আমি ঠিকানা জোগাড় করে আনছি। তুমি একটা চিঠি লিখবে মা? প্লিজ।' নীপা আবদার করল।

'মরে গেলেও না।'

এই সময় শ্যামল ঢুকল, 'গম্ভীর ব্যাপার মনে হচ্ছে!'

নীপা বলল, 'দ্যাখ না শ্যামল, মায়ের ছেলেবেলার একজন এখন আমেরিকায় থাকে, একবারও বলেনি। আমি যদি পাস করে ওখানে যাই ভদ্রলোকের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। মাকে বলছি একটা চিঠি লিখে ভূমিকা করে রাখতে, মা রাজি হচ্ছে না।'

'নো কমেন্টস। বাবাকে ওই ব্যাপারে কথা বলে অনেক জ্ঞান শুনেছি, আর ফারদার ভিক্টিম হতে চাই না। হ্যাঁ, পিসিমা আপনার ব্যবস্থা হয়েছে।'

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল শ্যামল?'

'আজ বিকেলে ডক্টর এস কে সেন মালবিকাকে দেখবেন। ভদ্রলোকের এক মাস আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় না। ম্যানেজ করেছি। আর আমার বন্ধুর বাবার একটা গেস্ট হাউস আছে, সেখানে দিন কয়েক থাকেত পারবেন। খুব সামান্য চার্জ।'

'এখনই যাওয়া যাবে তো?' কল্যাণী খুব খুশী।

'ইচ্ছে হলে যেতে পারেন।' শ্যামল যেন রাজ্যজয় করে এসেছে।

'সে কি? এখনই যাবেন মানে?' নন্দিতা প্রতিবাদ করলেন।

'না, ও বলছে যখন—।' কল্যাণী থতমত।

'বলুক। এ বাড়িতে পা দিয়ে ভাত না খেয়ে যাওয়া চলবে না। আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, বুঝলেন?' নন্দিতা জোর গলায় বললেন।

'পিসিমা থাকুন, কিন্তু আমি বিয়ে করব না মা। শুধু তুমি চিঠিটা লেখ।'

সবাই হেসে উঠল। নন্দিতা রাগ করে ভেতরে চলে গেলেন। শুধু হাসলেন না নিরাপদ। তাঁকে চোর চোর দেখাচ্ছিল।

এখন বিকেল। দৃশ্যান্তর হওয়ায় দেখা গেল সেই একই ঘর। নন্দিতা চুপচাপ বসে আছেন। কোথাও কোন শব্দ নেই। নিরাপদ প্রবেশ করলেন, 'গেস্ট হাউসটা খারাপ নয়। শ্যামল আর নীপা ওখানেই থেকে গেল। পরে আসবে।'

নন্দিতা কথা বললেন না। নিরাপদ এক পা এগোলেন, 'কি হয়েছে?'

'এইভাবে নিজের গায়ের জ্বালা মেটালে?'

'মানে?'

'ছেলেমেয়ে, এমনকি ওই মহিলার সামনে অপমান করলে?'

'কি বলছ?'

'কি বলছি তা বুঝতে পারছ না, না? এতকাল ভাবতাম সরল গোবেচারা। ভুল ভাবতাম। পেটে পেটে তোমার এত ছিল? ছিঃ!'

'নন্দিতা—?'

'তুমি আমাকে অপমান করেছ!'

'কিভাবে?'

'ওই মহিলাকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বলায় তুমি প্রতিশোধ নিলে পার্থর কথা তুলে। তুমি আমাকে সন্দেহ কর?'

'না।'

'নিশ্চয়ই কর। তিরিশ বছর ধরে তুমি আমার সঙ্গে অভিনয় করে এসেছ ভালমানুষের, মনে মনে সন্দেহ করেছ। আজ সুযোগ বুঝে সেটা ব্যবহার করলে।'

'তুমি ভুল করছ।'

'ভুল? আমার মেয়েকে তুমি পার্থ সান্যালের সাহায্য নিতে পরামর্শ দিচ্ছ! তুমি জানো, পার্থকে আমি কোনদিন প্রশ্রয় দিইনি। সে যখন জানবে আমার মেয়ে তার কাছে যাচ্ছে তখন—। ওঃ, আমি ভাবতেও পারি না। শোন, তোমার সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কি বলব।'

'ওই মহিলা আসায় তুমি খুশি হওনি? আমি তোমার কাঁটা?'

'দ্যাখো, তুমি তো প্রায়ই বল আমার সম্পর্কে তোমার কোন আগ্রহ নেই। দশ বছর তুমি এক বাড়িতে থেকেও আলাদা। তাহলে আমাকে নিয়ে এত জ্বলো কেন তুমি?'

'এর উত্তর আমি তোমাকে দেব না। উঃ। ছেলেমেয়েরা ভাবল তোমার মত আমারও একজন বয়ফ্রেণ্ড ছিল। বুড়ো বয়সে দাঁত পড়ে গেলে লোকে মাড়ি দিয়ে চিবোয়। তুমি সেই কাজটা করলে।' নন্দিতা কান্না চাপতে চাপতে বেরিয়ে গেলেন।

নিরাপদ তাঁর যাওয়া দেখলেন। তারপর থপথপে পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন, 'কি নাটক করার কথা ছিল, কি নাটক হয়ে গেল! নন্দিতা বলে গেল আমি ইচ্ছা করে ওকে অপমান করেছি। ওকে সন্দেহ করি। আমি জানতাম না। এখন মনে হচ্ছে হয়তো তাই। তাহলে আমি সত্যি কথা বলি, পাপ করিনি—এ সব বলার কোন মানে হয় না। নন্দিতা আমাকে ভালবাসে না অথচ কাউকে ভালবাসতে দেবে না। আমিও নন্দিতাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, অসহ্য হলেও। আচ্ছা, ধরুন, না, খামোকা ধরতে যাবেন কেন, নিজের চোখেই

দেখুন, আজ যে নাটকটা করার কথা ছিল তাতেই অভিনয় করছি আমরা। তবে একটু ছোট করে নিতে হচ্ছে, অনেকটা সময় চলে গেছে তো! তবে তার আগে একটু বিরতি দেব। পাঁচ মিনিটের।'

নিরাপদ ইঙ্গিত করতেই পর্দা পড়ে গেল। বাইরে বেরিয়ে সিগারেট খেতে খেতে আমরা ঠিক করতে পারছিলাম না নিরাপদ পাপ করেছেন কিনা! বস্তুত সবাইকে আমাদের খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। নিরাপদ একটু ভালমানুষ, ওরকম স্বামী হলে বিয়ের কিছুদিন বাদে স্ত্রীরা একটু হম্বিতম্বি করবেনই। তবে পার্থ সান্যালের ব্যাপারটা তোলা নিয়ে আমরা দ্বিমত হলাম।

বিরতির পর মঞ্চটির কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। নন্দিতা খাবারের ব্যবস্থা করছেন। সময়টা রাত। নীপা তাঁকে সাহায্য করছে। নন্দিতা বললেন, 'ওদের ডাক।'

নীপা চেঁচাল, 'খাবার দেওয়া হয়েছে।'

নিরাপদ ঢুকলেন। ধোপদুরস্ত। চেয়ার টেনে নিয়ে বললেন, 'শ্যামল কোথায়?'

নন্দিতা মাথা নামিয়ে বললেন, 'এই ফিরল। বাথরুমে গিয়েছে।'

'রাত সাড়ে ন'টায় বাড়ি ফেরা তুমি অ্যালাউ করছ নন্দিতা! দিস ইজ টু মাচ। কলেজে পড়া ছেলের এতখানি স্বাধীনতা আমি বরদাস্ত করব না।'

'বলি, কিন্তু শোনে না।'

নিরাপদ মাথা নেড়ে চেয়ারে বসলেন, 'আমার ওষুধটা।'

নীপা একটা কৌটো এগিয়ে দিলে তিনি সেটা থেকে ক্যাপসুল বের করে মুখে দিয়ে জল খেতেই শ্যামল ঢুকল, 'আজকের মেনু কি?'

'চিকেন কারি, রুটি, স্যালাড আর পায়েস।'

'কাল পুডিং করো তো।' শ্যামল বলল।

'বাপের পয়সার পায়েস পুডিং প্যাঁদাচ্ছ অথচ কোন কথা কানে যাচ্ছে না!' নিরাপদ ছেলের দিকে তাকালেন।

'তার মানে?'

'তোমাকে বলেছি এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবে না।'

'ইউনিয়নের কাজে দেরি হয়ে যায়।'

'ওঃ! শোন শ্যামল, এ বাড়িতে থাকতে হলে তোমাকে ইউনিয়ন ছাড়তে হবে।'

'কেন?'

'কারণ, আমি চাই না আমার ছেলে একটা হ্যাগার্ড হোক। ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি আর কাঁধে ব্যাগ। ভবিষ্যতের বারোটা বাজানোর পক্ষে যথেষ্ট।'

'তুমি বুর্জোয়াদের মত কথা বলছ।'

'তাই? কোন সর্বহারা চিকেনকারি আর পায়েস খায়?' নিরাপদ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোমাদের সর্বহারার নেতার ছেলে তো ক্যাপিটালিস্ট!'

এইসময় দর্শকরা উসখুস করে উঠল। একজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'পার্সোনাল অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে। নাটক বন্ধ করে দেব।'

নিরাপদ আমাদের দিকে তাকালেন, 'তা আপনারা পারেন। হিটলার কিংবা মুসোলিনি ডিক্টেটার ছিলেন। এখন একটা কমিটি সেই ভূমিকায় চলে গিয়েছে। কিন্তু ভাই আপনারারই তো হাসমিকে নায়ক করেছেন, খামোকা ভিলেন হবেন কেন? আমার ছেলে আমার পয়সায় বাউণ্ডুলেপনা করলে, তাকে বলার অধিকার আমার আছে।' নিরাপদ ছেলের দিকে মুখ ফেরালেন, 'শ্যামল, তোমার নেতাদের চেহারা ছিয়াত্তরের আগে দেখেছি। সিড়িঙ্গে ছিল। এখন শাঁসে-জলে। দাদাদের নাম ভাইদের নামেই হয়। কোনরকমে গ্র্যাজুয়েট হও, তোমার চাকরি হয়ে যাবে। ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

শ্যামল কথা বলল না। নীপা বলল, 'বাবা, জি আর ই পাস করলে আমি আমেরিকায় যাব তো?'

নন্দিতা বললেন, 'অসম্ভব। ওসব চিন্তা মাথা থেকে ছাড়।'

নীপা বলল, 'বাবা!'

নিরাপদ বললেন, 'আগে পাস করো তারপর দেখব।'

নন্দিতা বললেন, 'তুমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছ! ওদেশে ও একা থাকবে?'

'একা কেন থাকবে? আমাদের বোস সাহেবের ভাই থাকেন নিউ ইয়র্কে। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর।'

'বাবা, তুমি গ্রেট।'

খেতে খেতে নিরাপদ বললেন, 'যতীন খুব ঝামেলায় পড়েছে।'

নন্দিতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি? কেন?'

'আরে রেখে ঢেকে নে। চোখের পর্দা বলে তো একটা কথা আছে! পার্টিদের ট্রাবল দিয়ে টাকা নিলে কমপ্লেন হবে না?'

'তোমার কিছু হবে না তো গো?'

'দূর! আমি অত বোকা নাকি!'

শ্যামল উসখুস করে বলল, 'বাবা, তুমি অন্যায় করছ।'

'তা তো বলবেই। উপরির পয়সায় তুমি ফুটুনি করছ আর নিচ্ছি বলে আমার দোষ হয়ে গেল! তা ছাড়া আমি ঘুষ নিই না।'

'নাও না?'

'না। এটাকে ঘুষ বলে না। টিপ্‌স দেয়। ঘুষ নেয় বড়কর্তারা, মন্ত্রীরা। তারা দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে। সেই ক্ষমতা আমার নেই। মাংস দাও।'

নন্দিতা মাংস দিলেন। নীপা বলল, 'মা আমি পায়েস খাবো না।'

'কেন?' নিরাপদ জানতে চাইলেন।

নন্দিতা হাসলেন, 'মিষ্টি খেলে ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তোরা আজকাল কত কনসাস হয়ে গিয়েছিস। ওকে একটু ফল দিও নন্দিতা।'

'আচ্ছা।'

হঠাৎ নীপার মনে পড়ে গেল, 'ওই যাঃ।'

'কি হল?' শ্যামল জিজ্ঞাসা করল।

'একটা চিঠি এসেছে মায়ের নামে। দিতে ভুলে গিয়েছি।'

'কার চিঠি?'

'খুলিনি। দাঁড়াও আনছি।' নীপা উঠে দাঁড়াল।

'খাবি না?'

'আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।' নীপা বেরিয়ে গেল।

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে আবার কে চঠি লিখল?'

'জানি না। হয়ত মেজ মাসিমা টাকা চেয়েছেন।'

'দ্যাখো। দিতে দিতে তো ফতুর হয়ে যাব।' নিরাপদ ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উপরি আছে বলে তোমার গা জ্বলে কিন্তু কত লোককে দিতে হয় তার খবর রাখো? ননসেন্স। শ্যামল, একটু প্র্যাকটিক্যাল হও।'

নীপা ফিরে এল রঙিন খাম হাতে।

নন্দিতা বললেন, 'খুলে পড় না।'

নীপা খামটা ছিঁড়ল। তারপর ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও মা, নিউ জার্সি থেকে লিখেছে। সুচরিতাসু, আশা করি ভাল আছ। আমাকে তোমার মনে রাখার কথা নয়। আড়িয়াদহে তোমাদের পাড়ায় আমি থাকতাম। তোমাদের বিয়ের সময় আমি বেকার ছিলাম। তারপর ঘটনাচক্রে আমেরিকায় আসি। এখন ব্যবসাপত্তর করে আমি সচ্ছল। দেশে যাইনি আঠাশ বছর। সম্প্রতি আমার বোন ভগ্নিপতি আমার কাছে বেড়াতে এসেছিল। তাদের কাছে তোমার ঠিকানা পেলাম। আমি এই মাসে দেশে যাচ্ছি। সবার সঙ্গে দেখা করব। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। যদি আপত্তি থাকে তাহলে আড়িয়াদহের ঠিকানায় জানিয়ে দিও। তরুণ বয়সে বিরক্ত করতাম বলে ক্ষমা চেয়ে আসব। আপত্তি থাকলে যাব না। আশা করি তোমার স্বামী অখুশী হবেন না। শুভেচ্ছা সহ, পার্থ সান্যাল।'

'লোকটা কে মা?' শ্যামল জানতে চাইল।

'বাজে লোক। আমি যখন ক্লাস টেনে পড়তাম তখন রকে বসে খুব আওয়াজ দিত। গায়ে পড়ে কথা বলতে চাইত। আমি পাত্তা দিইনি।'

নীপা হাসল, 'রকবাজ রোমিও?'

'ইয়ার্কি মারিস না। তুই লিখে দে আসার দরকার নেই।'

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

'বাঃ। চিনি না জানি না, এখানে এসে কি করবে?'

'তুমি চেন না! তোমাকে তো চেনেন। আঠাশ বছর বিদেশে আছেন, দেশে এসে সবার সঙ্গে কথা বলতে তো ইচ্ছে করবেই।'

নীপা বলল, 'তা ছাড়া নিউ জার্সিতে থাকেন, আমার উপকার হতে পারে।'

নন্দিতা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না। সে এ বাড়িতে আসবে না।'

নীপা বলল, 'কেন? তুমি মিছিমিছি রাগ করছ।'

নিরাপদ হাসলেন, 'নীপা ঠিকই বলছে।'

নন্দিতা আচমকাই চলে গেলেন ঘর ছেড়ে, নিরাপদ বললেন, 'তোদের মা ভাল অভিনেত্রী নয়, বুঝলি!'

শ্যামল বলল, 'মায়ের পরিচিত এবং মা আপত্তি করছে যখন, তখন ভদ্রলোকের আসা উচিত নয়। তোমারা যে যাই বল।'

দৃশ্য পরিবর্তন হল। কথাটা ঠিক বলা হল না। ঘর এক রইল শুধু সময় পাল্টে গেল। এখন সকাল। নিরাপদ খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আর তখনই বেল বাজল। নিরাপদ চেঁচালেন 'কে এল দ্যাখ।'

শ্যামলের গলা পাওয়া গেল, 'নীপা দ্যাখ।'

একটু বাদে নীপার গলা, 'কাকে চান?'

'নন্দিতা আছেন?'

'হ্যাঁ। উনি রান্না করছেন। আপনি?'

'তুমি নন্দিতার মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি পার্থ সান্যাল। আমেরিকা থেকে আসছি।'

'ও। আসুন আসুন। আমরা আপনার চিঠি গতকাল পেয়েছি।'

নীপা ঘরে ঢুকল এক চকচকে প্রৌঢ়কে নিয়ে, 'আমার বাবা। বাবা, ইনি পার্থ সান্যাল।'

নিরাপদ নমস্কার করলেন। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নিরাপদকে জড়িয়ে ধরলেন, 'অনেকদিন বাদে দেশে এলাম। আপনাদের বাড়িতে এসেছি বলে কিছু মনে করেননি তো?'

নিরাপদ হাসলেন, 'না না, মনে করব কেন?'

'আমি পার্থ সান্যাল। কুইনসে থাকি। ব্যবসা করি। আপনি?'

'আমি নিরাপদ মিত্র। সরকারি চাকরি করি।' নিরাপদর গলা মিনমিনে শোনাল। নীপা বলল, 'বসুন।'

পার্থ বললেন, 'দেশে তো আসাই হয় না। তুমি কি কর?'

'পড়ি। এম. এ. দিচ্ছি। জি আর ই দিয়েছি।'

'তাই? আমেরিকায় যাওয়ার ইচ্ছে আছে নাকি?'

'যদি সুযোগ পাই—।'

'আলবাত পাবে। আমি আছি ওখানে। আমার কাছে উঠবে। তোমরা কয় ভাই বোন?'

'দুই ভাই বোন। মা, মাগো, মা এদিকে এসো।'

নন্দিতা এলেন। একপাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালেন। পার্থ তাঁর দিকে অবাক চোখে তাকালেন, 'আমাকে চেনা যাচ্ছে?'

মাথা নাড়লেন নন্দিতা, 'না।'

'আমার ভাইই চিনতে পারেনি। বলল, দাদা তুই এত ফর্সা, মোটা আর টাক ফেলেছিস মাথায় যে, চেনা যায় না। তবে চেহারা দেখছি খুব একটা বদলায়নি। সামান্য মোটা, সেটা স্বাভাবিক। তবে মেয়ে একদম মায়ের ধাত পেয়েছে।'

'আপনি তো আমার আগে ওকে দেখেছেন।' নিরাপদ বললেন।

'দূর মশাই, দূর থেকে দেখতাম। কথা বলার চান্স দিত নাকি! ওহো, তোমার নাম কী যেন!'

'নীপা।'

'হ্যাঁ, নীপা, এই নাও।' পার্থ সান্যাল অ্যাটাচি কেস খুললেন। একে একে বিদেশি পারফিউম, আফটার শেভিং লোশন, চুল শুকোবার ব্লোয়ার বের করে টেবিলে রাখলেন, 'এসব তোমাদের জন্যে।'

নীপা বলল, 'সব?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ নন্দিতা বললেন, 'না। ওগুলো আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।'

'কেন?' পার্থ সান্যাল অবাক।

'আপনার সঙ্গে আমাদের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই যে, ওগুলো নেওয়া যেতে পারে!'

'আমি কিন্তু একদম সরল মনে এনেছি।' পার্থ সান্যাল বললেন।

'ঠিকই করেছেন।' নিরাপদ কথা বললেন, 'ভালবেসে কেউ কিছু দিলে নিতে হয়।'

'থ্যাঙ্কু মিস্টার মিত্র। আজ আমাকে উঠতে হচ্ছে!'

'সে কি! চা খেয়ে যাবেন না?' নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল।

'নাঃ। আমি কাল দিল্লি যাচ্ছি। ওখান থেকেই ফিরে যাব। আজ বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। নীপা, আমার কার্ডটা রাখো। যদি ও দেশে পড়তে যাও একটা চিঠি আগেভাগে পোস্ট করো। তারপর তোমার সব দায়িত্ব আমার।' পার্থ উঠলেন। কার্ডটা টেবিলে রাখলেন।

নিরাপদ বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল।'

'একই কথা আমিও বলছি। আচ্ছা, আপনাদের ছেলেকে দেখলাম না?'

নিরাপদ নীপাকে বললেন, 'শ্যামলকে এ ঘরে আসতে বলো।'

নীপা চলে গেল। পার্থ সান্যাল একটু ইতস্তত করে বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারছি না। আমার চিঠি পেয়ে অথবা আমি এ বাড়িতে আসায় আপনাদের মনে কোনও প্রশ্ন দেখা দেয়নি?'

নন্দিতা অন্য দিকে মুখ ফেরালেন। নিরাপদ হাসলেন, 'না না। আপনারা এক পাড়ায় থাকতেন, আলাপ পরিচয় ছিল, এতকাল বাদে দেশে ফিরছেন, দেখা করতে আসাটা স্বাভাবিক ভদ্রতার মধ্যেই পড়ে। তাই না?'

মাথা নাড়লেন পার্থ সান্যাল, 'না। আপনি ঠিক জানেন না।'

'বুঝলাম না।'

'নন্দিতার সঙ্গে আমার কখনও কথাবার্তাই হয়নি। আমি যে ওঁর নাম ধরে কথা বলছি, সেটা বয়সের অ্যাডভান্টেজ থেকে।'

'আচ্ছা!'

'আমার এখানে আসার কারণ এক ধরনের কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে।'

'কৃতজ্ঞতা?'

নিরাপদ স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ। আমি খুব সাধারণ ছেলে ছিলাম। রকে আড্ডা মারতাম আর মেয়েদের দেখলে টিটকিরি মারতাম। ওইভাবে আর কিছুকাল চললে এদেশের আর একজন ব্যর্থ নাগরিক হাওয়া ছাড়া আমার কপালে অন্য কিছু ঘটত না। তা নন্দিতাকে দেখে ওর সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করল। যেচে কথা বলতে গিয়ে দেখলাম, ও ঘৃণা বা অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। সেদিন ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিলাম। বুঝতে পারলাম আমাকে একজন ভাল মেয়ে কী চোখে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমাকে বড় হতে হবে। যোগ্য হতে হবেই। ওই ধাক্কা আমাকে তাড়িয়ে বেড়াতে বেড়াতে শেষপর্যন্ত আমেরিকায় পৌঁছে দিল। তারপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। আপনার স্ত্রী না জেনে আমার বিরাট উপকার করেছিল। জানি এভাবে আসা ঠিক নয়, তবু না এসে পারলাম না।'

'আপনি কি একা এসেছেন?' নিরাপদ জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। আমার বৃদ্ধা মার আমার কাছেই আছেন। উনি আসতে চাইলেন না।'

'আপনার স্ত্রী?'

'কপালে নেই মশাই। এক বঙ্গললনাকে বিয়ে করেছিলাম, তিনি অকালে চলে গেলেন।' পার্থ সান্যাল ম্লান হাসলেন। নীপা এবং শ্যামল ঢুকল।

নীপা বলল, 'ও আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট। ওর নাম শ্যামল।'

'আচ্ছা! কি পড় তুমি?'

'কলেজে পড়ছি।'

নীপা হাসল, 'বামপন্থী ইউনিয়ন করে।'

'আচ্ছা! এই যে বুশ সাহেব হারলেন। দেশজুড়ে নির্বাচন হল। ওই সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া দেশে নীরবে ব্যালট বাক্সে বিপ্লব হয়ে যায়। তোমরা কি বল?'

'আমাদের কাছে বুশ বা ক্লিন্টন-এর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।'

'ঠিক। এখন পৃথিবীতে যারা রাজনীতি করে তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সবাই কিছু পাওয়ার জন্যে করে। আচ্ছা, চলি। নমস্কার মিস্টার মিত্র। নন্দিতা, নীপা এলাম।' পার্থ সান্যাল হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

শ্যামল বলল, 'এইসব জিনিস ওই লোকটা এনেছে?' সে টেবিলের দিকে তাকিয়েছিল।

নীপা বলল, 'হ্যাঁ। লোকটা বলছিস কেন?'

'ঘুষ দিয়ে গেল।'

নিরাপদ হটাৎ ধমকে উঠলেন, 'শ্যামল!'

শ্যামল অবাক হয়ে তাকাল। নিরাপদ রাগত গলায় বললেন, 'একজন ভদ্রলোক ভাল মনে উপহার দিয়ে গেলেন আর তুমি তাকে ঘুষ বলছ?'

'কেউ এমনি এমনি উপহার দেয় না।'

'তোমরা তা হলে এমনি এমনি কিউবার জন্যে সাহায্য সংগ্রহ করছ না?'

'বাবা, দুটো ব্যাপার এক করো না। আমেরিকা যাকে এক্সপ্লয়েট করছে আমরা তার পাশে দাঁড়াচ্ছি। পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মানুষ এখন এক প্লাটফর্মে।' শ্যামল চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থেকে নিরাপদ বললেন, 'আর কদিন পরে বুঝবে। সবে দাঁত গজালে খুব সুড়সুড় করে। নীপা, এগুলো ভেতরে নিয়ে যা।'

'আমি এই পারফিউমটা নিচ্ছি।'

'ঠিক আছে। শোন, ওই আফটার শেভ লোশনটা শ্যামলের টেবিলে রেখে দিবি।' ঘাড় নেড়ে নীপা উপহারগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঘরে এখন নন্দিতা আর নিরাপদ। আমরা নন্দিতাকে চুপচাপ কাঁদতে দেখলাম। ওঁর পাশে এসে নিরাপদ সেটা বুঝতে পারলেন, 'একি! তুমি কাঁদছ?'

নন্দিতা হঠাৎই স্বামীর হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'আমার ভীষণ ঘেন্না করছে।'

'ঘেন্না?'

'ওই লোকটা আমাকে অপমান করে গেল।'

'কি যা-তা বলছ?'

'যাকে আমি অবজ্ঞা করতাম তার দান নিলে তোমরা।'

'আঃ, এভাবে ভাবছ কেন!'

'কিন্তু শ্যামল বলল, এমনি এমনি কেউ কাউকে উপহার দেয় না। শোন, তুমি আমাকে সন্দেহ করছ না তো। বিশ্বাস করো, ওর সঙ্গে আমি কখনও কথা বলিনি।'

'ইটস অলরাইট। তিরিশ বছর আগে তুমি কি করেছ, তাতে আমার বিন্দুমাত্র যায় আসে না। উনি আসায় আমাদের বরং উপকার হল।'

'তার মানে?'

'নীপার একটা চ্যানেল তৈরি হয়ে গেল। আর আমরা জানলাম তোমার একজন ভাল বন্ধু আছে। ইটস অলরাইট।'

নন্দিতা উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি স্পষ্ট বল, আমাকে বিশ্বাস করছ?'

'না করে উপায় আছে?'

'তার মানে?'

'সকাল দুপুর বিকেল কাটিয়ে দিয়েছি। এখন এই সন্ধ্যেবেলায় এসে তোমাকে অবিশ্বাস করলে আমি যে একা হয়ে যাব নন্দিতা। ছেলেমেয়েরা যে যার মতন জীবন কাটাবে। রাত নেমে আসা পর্যন্ত সময়টায় আমাদের একসঙ্গে থাকা দরকার। অবিশ্বাসে জ্বলেপুড়ে মরার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকাও ঢের ভাল। তাই না?'

নন্দিতা অবাক হয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন। তারপর মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিরাপদ তাঁর যাওয়া দেখলেন। এবার এগিয়ে এলেন মঞ্চের সামনে। হাতজোড় করে বললেন, 'ভদ্রজনেরা, এটা নাটক। সময়াভাবে ছোট করে নিয়েছি। এই নাটকে আমি সৎ নই, ঘুষ নিই, দাপটে থাকি। তবু নন্দিতা আমার কাছে জানতে চাইছে, আমি তাকে সন্দেহ করি কিনা! বিশ্বাস করুন, আমি নিজেই সেটা বুঝতে পারছি না। সৎ বা অসৎ যে কোন জীবন যাপনের পরে একটা সময় আসে, যখন পুরুষ মানুষ একা হয়ে যায়। মেয়েরা হয় কিনা জানি না। তখন সব কিছু মানিয়ে নিতে হয়। মেনে নিতে হয়। শান্তি না হোক স্বস্তি হবে তাতে। এটুকুই বা কম কী!'

নিরাপদ ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেলেন। পর্দা পড়ল না, আলো জ্বলে উঠল।

স্রো ত স্বি নী

এক বছর আগে স্বামীকে সুস্থ করে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিল সোহাগ। মাত্র দিন দশেক হাসপাতালে ছিল অবনী। এই দশদিন ঝড় বললে কম হয়, মনে পড়লে শরীর হিম হয়ে যায় এখনও। কলকাতায় সেই হাসপাতালে ঈশ্বরের একজন পুত্র আছেন। সে সময় সোহাগের এমনই মনে হয়েছিল। কারণ যে মানুষটা আর বাঁচবে না বলে চেনাজানা ডাক্তার, আত্মীয়স্বজন রায় দিয়েছিল তাকে উনি বাঁচিয়ে দিলেন।

অবনী স্কুলে পড়ায়। একদিন পড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময় মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সবাই ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসে। ধুম জ্বর চলে কিছুদিন। পাড়ার ডাক্তার জ্বর কমাতে না পেরে রক্ত পরীক্ষা করতে বললেন। পরীক্ষায় জানা গিয়েছিল অবনীর রক্তে ক্যানসার হয়েছে। কান্নাকাটি সামলে সোহাগ ছুটেছিল কলকাতার হাসপাতালে। অবনীর বন্ধু সতীশ সেই সময় অনেক করেছে, এ ডাক্তার সে-ডাক্তার, সোহাগ তো কিছুই চিনতো না। সতীশই ঘুরে ঘুরে সন্ধান নিয়েছে। যে শুনেছে সে-ই বলেছে এই কেসে আর কিছু করার নেই।

সতীশ বন্ধু বটে কিন্তু বেশী মাখামাখি পছন্দ করত না অবনী। চল্লিশ পেরিয়েও বিয়ে থা' করেনি। রাত্রে একা একা মদ খায়। এমন লোক বাড়িতে যত কম আসে তত ভাল। বাইরের বন্ধুত্ব বাইরেই রাখতে চেয়েছিল সে। কিন্তু অবনীর অসুখ হতে সতীশই ঝাঁপিয়ে পড়ল। সোহাগ আর তার ছেলে নবনীকে বলল, ভয় নেই, চেষ্টার শেষ দেখব।

লোকটা সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছিল, কিন্তু সেটা কাটতে সময় লাগল না। ওই সতীশই পার্ক স্ট্রীটের হাসপাতালের খবর আনল। সেখানে এই রোগের চিকিৎসা হয়। তিনজনে মিলে অনেক কষ্টে অবনীকে নিয়ে পৌঁছে গেল এক সকালে। টিকিট করে দোতলায় উঠতেই মনে হয়েছিল কোন নার্সিং হোমে এসেছে। ডাক্তারবাবুর চেম্বারে তখন বেজায় ভিড়। সবাই একসঙ্গে নিজেদের অসুখের কথা বলছে। সুদর্শন বৃদ্ধ ডাক্তার হাসিমুখে সব শুনছেন, জবাব দিচ্ছেন। অবনী ভর্তি হয়ে গিয়েছিল এক শর্তে। কেনা রক্ত আনা চলবে না, নিজেদের রক্ত দিতে হবে আত্মীয়কে বাঁচাতে। তাতে টান থাকবে প্রাণের।

দশদিন রোজ দু'বেলা সোহাগ গিয়েছে সতীশের সঙ্গে হাসপাতালে। একটু একটু করে ডাক্তারবাবু আশার কথা বলেছিলেন। জ্বর কমে গেলে সতীশের হাত জড়িয়ে অবনী বলেছেন, আমাকে বাঁচাও সতীশ, আমি বাঁচতে চাই।

সতীশ কথা দিয়েছিল। সে চেষ্টা করবেই। দশদিনে আট হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। দু'হাজার ঘরে ছিল, বাকিটা সতীশ দিয়েছিল। এই দশদিনে একই সঙ্গে অবনীর জন্যে আশংকা

আর সতীশ সম্পর্কে কৌতূহল বেড়ে গেল সোহাগের। কোন কোন দিন প্রয়োজনে দুপুরে থাকতে হয়েছে হাসপাতালে। তখন সতীশ তাকে খেতে নিয়ে গিয়েছে পার্ক ষ্ট্রীটের চিনে দোকানে। কোনদিন এসব অভিজ্ঞতা ছিল না সোহাগের। সতীশ খুব গম্ভীর মুখে বসে থাকত, সঙ্গে হাঁটত। কোন রকম তরল কথা বলত না । শেষ পর্যন্ত সোহাগ বলেছিল, 'আপনার অনেক টাকা বন্ধুর জন্যে খরচ হচ্ছে, তার ওপর এসব—।'

সতীশ জবাব দেয়নি। সোহাগ আবার বলছিল কথাগুলো। তখন সতীশ গম্ভীর মুখে বলেছিল, 'আপনাকে খাওয়াতে আমার ভাল লাগছে। আজকাল খুব কম ভাল লাগে, লাগে না বললেই হয়, এটুকু থেকে বঞ্চিত করবেন?'

'আপনি বিয়ে-থা করেননি কেন?'

'করা হয়নি। তাছাড়া করে ফেললে সে কি রোজ আপনার সঙ্গে আসতে দিত?'

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠেছিল সোহাগের, কিন্তু সেই সঙ্গে যে ভাল লাগা ছড়িয়ে পড়েছিল সেটাও সত্যি। মুখ নামিয়ে নিয়েছিল সে। শুধু কথা নয়, ব্যবহারেও পরিবর্তন হয়নি তার।

বাড়িতে ফিরে বারো বছরের নবনীকে অকারণে জড়িয়ে ধরেছিল সোহাগ। এমন আদরে ইদানিং অভ্যস্ত নয় নবনী। জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বাবা কি বাঁচবে না মা?'

চমকে সোজা হয়ে সোহাগ জবাব দিয়েছিল,'না, না। ডাক্তারবাবু বলেছেন তোর বাবার শরীরে ওষুধ খুব ভাল কাজ করছে। বেঁচে যাবেই।'

'সতীশকাকুর জন্যে বাবা বেঁচে যাবে, না?'

'ভগবানের জন্যে রে। তিনিই সব করেন।'

দশদিনের পরে ডাক্তার অবনীকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ওকে প্রতি মাসে একবার করে এখানে নিয়ে আসবে। আমি পরীক্ষা করব। এই চিকিৎসা তিন বছর ধরে চলবে। যে ওষুধগুলো লিখে দিয়েছি তা নিয়ম করে খাওয়াবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে যেন তিনি দয়া করেন।'

বাড়িতে এসে খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদিতে বেশ তাজা হয়ে উঠল অবনী। কাজে যোগ দিল। যারা বলেছিল বাঁচবে না তারা এবার বলল, নিশ্চয়ই ব্লাড ক্যানসার হয়নি, অন্য কিছু হয়েছিল। প্রথম মাসে কলকাতায় ওকে এনে দেখিয়ে গেল সতীশ। ডাক্তার উন্নতি দেখে খুব খুশী।

সতীশ বাড়িতে রোজ আসছে, সোহাগের সঙ্গে কথা বলছে এটা মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না অবনীর। সতীশের কাছে ধার হয়ে গিয়েছে অত টাকা, এটাও ভাল লাগছিল না। সে সতীশকে ডেকে একদিন বলল, 'তোমার টাকা কিভাবে শোধ করব—।'

'আমি তোমাকে শোধ করতে বলেছি? নিজের পরিবারের জন্য লোকে কি করে না? আমাকে যদি বাইরের লোক বলে মনে কর তাহলে অন্য কথা ।'

হঠাৎ এক ধরনের স্বস্তি হল অবনীর। মনে যাই থাক সে মুখে কিছু বলল না। যতই তাজা ভাব দেখাক, ভেতরে ভেতরে সে বোঝে আগের মত নেই শরীরটা। ডাক্তার যেসব নিষেধ করেছেন তার মধ্যে একটি হল যৌনসম্পর্ক করা। এ ব্যাপারে অসুখের আগেই আগ্রহ কমে গিয়েছিল। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। সোহাগকে যেহেতু স্পর্শ করতে হচ্ছে না তাই সতীশ যদি ওর সঙ্গে দুটো কথা বলে খুশী থাকে তাতে তার আপত্তি করার কিছু নেই।

দ্বিতীয় মাসে অবনীকে তাড়া দিল সোহাগ কলকাতা গিয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে আসতে। সতীশ সঙ্গে যেতে চাইল। কিন্তু যাওয়ার দিন সে খবর পাঠাল তার জ্বর হয়েছে। উঠতে পারছে না। অবনী তাকে দেখে এসে বলল, 'নিজেই যাবো। এখন তো আর চলাফেরার কোন অসুবিধে নেই।'

অবনী চলে গেল। নবনী স্কুলে। সোহাগের মন ছটফট করছিল। লোকটা অসুস্থ হয়েছে অথচ অবনী দেখে এসে বলল না কেমন আছে। মানুষটা তাদের জন্যে এত করল আর তার অসুখের সময় চুপ করে থাকবে। হঠাৎ মনে হল অবনীর অসুখের সময় যেতে যেতে উদ্বেগ কমে গিয়ে এক ধরনের ভাললাগা তৈরী হয়েছিল। সেইটে আর নেই। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। সতীশের বাড়ী বেশী দূরে নয়।

একটা বুড়ো চাকর নিয়ে সতীশ থাকে। চাকরটিকে সে চিনত। প্রয়োজনে সতীশ অনেকবার ওকে বাড়িতে পাঠিয়েছে। চাকর বলল, 'বাবুর খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকতে দিচ্ছেন না। আপনি একটু চলুন।'

সতীশ শুয়ে ছিল বিছানায়। চোখ বন্ধ। পায়ের শব্দেও চোখ খুলল না। কপালে হাত রেখে সোহাগ দেখল পুড়ে যাচ্ছে। চাকরকে বলে জল আর ন্যাকড়া এনে জলপটির ব্যবস্থা করল। মাথার পাশে বসে জলপটি দিতে লাগল। সতীশ কালো চোখ মেলে হাসল। সোহাগ জিজ্ঞাসা করল, 'জ্বর বাধালেন কি করে?'

'ঠাণ্ডা লেগে। কিছু না। সেরে গেলে ভাল হয়ে যাব।' তারপর হাসল, 'এখন আমার জ্বর কমে যাবে।'

একটু কাঁপুনি এল যেন শরীরে। সোহাগ ঠোঁট কামড়াল। বুড়ো চাকর ডাক্তার ডেকে আনল। তিনি ওষুধ দিলেন। এরকম জ্বর আজকাল খুব হচ্ছে। ভয়ের কিছু নেই। তবে মাথা ধুইয়ে গা মুছিয়ে দিতে হবে।

ডাক্তার চলে গেল। বুড়ো চাকর গেল ওষুধ আনতে। আর ওসব কাজ নিজের হাতে করল সোহাগ। ঠিক এই সময়ে এ-বাড়িতে এল অবনী। এসে দৃশ্যটা দেখেও রাগ করল না। বলল, 'বাড়িতে ফিরে বুঝলাম তুমি এখানে এসেছ, তা কেমন আছে ও এখন?'

'জ্বর আছে।'

'বেচারা। ভাগ্যিস তুমি এসেছ।' কিছুক্ষণ বসে রইল অবনী। সে আসার পর থেকে সোহাগ আবিষ্কার করল তার মধ্যে আড়ষ্টতা এসেছে। কিছুতেই সহজ হতে পারছে না।

সতীশ ওই অবস্থায় জিজ্ঞাসা করল, 'কলকাতায় গিয়েছিলে?'

অবনী জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'ডাক্তার কি বলল?'

'উন্নতি হচ্ছে।'

'বাঃ, খুব ভাল খবর!' সতীশ হাসল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর হঠাৎ সোহাগকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল অবনী। পাশের ঘরে নবনী শোয়। তার দরজা আলাদা। সোহাগ বলল, 'শুয়ে পড়।'

অবনী শুনল না। মরীয়া হয়ে সে তার স্বামীত্ব প্রতিষ্ঠা করল। অনেক বাধা দিয়েছিল সোহাগ। ডাক্তারের নিষেধের কথা বলেছিল। অবনী জানিয়েছিল আজ নাকি সে ডাক্তারের অনুমতি পেয়েছে। পেতে পারে, কিন্তু সোহাগের মনে হয়েছিল অসুস্থ সতীশকে সেবা করতে দেখার পর এই কাণ্ড করল অবনী। মন তেতো হয়ে গেল সোহাগের। আর সেই সঙ্গে অবনীর ওপর রাগ। পরদিন সে ইচ্ছে করেই গেল না সতীশকে দেখতে। অবনী বিকেলে জিজ্ঞাসা করল, 'সতীশকে দেখতে যাওনি?'

জবাব দিল না সোহাগ। সেদিন রাত্রে অবনী তাকে স্পর্শ করল না।

পরের দিন সতীশ নিজেই এল। রুগ্ন শরীর নিয়ে তাকে আসতে দেখে রাগ করল সোহাগ। সতীশ হাসল, চা খেল, তারপর রিকশায় চড়ে ফিরে গেল। সেই রাত্রে আবার জোর-জবরদস্তি। কোনমতে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ফোঁস করে উঠল সোহাগ, 'তুমি কি চাও? সতীশবাবু এবাড়িতে না আসুক?'

'হঠাৎ সতীশের কথা?'

'তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো?'

'করি। তাই রোজ মনে করিয়ে দিতে চাই আমি তোমার স্বামী।'

ঘেন্নায় কথা বলতেও ইচ্ছে করল না সোহাগের।

বাক্যালাপ বন্ধ। সতীশ নিয়মিত আসে। তার সঙ্গে কথা বলে অবনী। কিন্তু নিজেকে সরিয়ে রাখে সোহাগ। যতটা সম্ভব সতীশ সম্পর্কে সে নিস্পৃহ হয়ে পড়ল। সতীশ এসে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করে। তখন কথা বলতেই হয়। আর মনে মনে শঙ্কিত হয় রাত্রে আক্রমণ হবে। কিন্তু ইদানিং অবনীর প্রায়ই জ্বর হচ্ছে। মাথা ঘোরে। অবনীকে ডাক্তার দেখানোর কথা বললে সে জানায় কলকাতার ডাক্তার বলেছে উন্নতি হচ্ছে, এটা নেহাতই সাধারণ জ্বর।

সতীশের সঙ্গে সোহাগ কথা বলে না লক্ষ্য করেছে অবনী। এই নিয়ে সে রাগারাগি করে। আর এইটে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে সোহাগকে। তার মনে হয় অবনী তাকে ব্যবহার করতে চাইছে। একদিন এক জোড়া সোনার বালা বিক্রি করে টাকা জমিয়ে রাখল সে। সতীশ এলে

ধারটা শোধ করবে। তার মুখের ওপর বলে দেবে আর এ বাড়িতে না আসতে। বলে দেবে অবনীর মনের কথা।

কিন্তু সেই দুপুরেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল অবনী। সেইসঙ্গে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। শুধু বলছে মরে যাব, মরে যাব।

নবনীকে স্কুল থেকে ডাকিয়ে এনে সঙ্গে সঙ্গে অবনীকে রিকশায় তুলে কলকাতার ট্রেন ধরতে ছুটল সোহাগ। যাওয়ার সময় সতীশের জন্যে টাকাটা নিতে ভুলল না।

কোনভাবে অবনীকে হাসপাতালে এনে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ছুটে গেল সোহাগ। ওই অসময়ে ডাক্তারবাবু রক্তের স্লাইড দেখছিলেন। চমকে উঠলেন কান্না শুনে, 'আমার স্বামীকে বাঁচান ডাক্তারবাবু।'

'তোমার স্বামী? কি হয়েছে তার?'

'আমাকে চিনতে পারছেন না ডাক্তারবাবু! এক বছর আগে ওঁকে নিয়ে এসেছিলাম। অবনী, অবনী দত্ত। ব্লাডক্যান্সার পেশেন্ট।'

'ওঃ গড! এতদিন কোথায় ছিলে?'

'এতদিন আমি আসিনি, ও তো এসেছিল প্রতি মাসে।'

'মিথ্যে কথা। একবার এসেছিল এক বন্ধুর সঙ্গে। আর আসেনি।'

চমকে গেল সোহাগ, 'কি বলছেন! ও প্রতি মাসে আপনার কাছ থেকে ঘুরে গিয়ে বলত উন্নতি হচ্ছে।'

'তোমার স্বামী গত এগার মাস আমার সঙ্গে দেখা করেননি। আমি পই পই করে বলে দিয়েছিলাম প্রতিমাসে চেক্ না করালে আমি বাঁচাতে পারব না। নিশ্চয় স্বামীর প্রতি তুমি কেয়ারলেস। আমি কিছুই করতে পারব না।'

'আপনার কাছে ও আসেনি?' বিস্ময় তখনও কাটছিল না। আপনি সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেননি?'

'কোন নিষেধাজ্ঞা? তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।'

ডুকরে কেঁদে উঠল সোহাগ। এই কান্নার অর্থ ভুল বুঝলেন ডাক্তারবাবু। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় সে?'

'নিচে।' কাঁদতে কাঁদতে সোহাগ বলল, 'আজ দুপুরে আবার ওইরকম হয়েছে, আপনি ওঁকে বাঁচান ডাক্তারবাবু। আপনি ওঁকে ভর্তি করে নিন।'

'আজ কোন বেড খালি নেই। অসম্ভব। কাল নিয়ে এসো।'

'ওকে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না।' সোহাগ কাঁদছিল।

ডাক্তারবাবু ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'কে ব্লাড দেবে?' আমি ফ্রেশ ব্লাড নেব। কেনা ব্লাডে কাজ চলবে না।'

'আমি দেব। আমার ছেলে দেবে।'

'তোমাদের গ্রুপ কি?'

'তা তো জানি না।'

ডাক্তার নির্দেশ দিলেন ব্লাড ব্যাঙ্ককে এদের রক্ত পরীক্ষা করতে। তারপর ছুটলেন পেশেন্টকে ভর্তি করতে। রক্ত পরীক্ষায় জানা গেল অবনীর সঙ্গে মা বা ছেলের রক্তের গ্রুপ মিলছে না। ডাক্তার আবার এলেন। এসে রাগত গলায় বললেন, 'তোমরা লোকটাকে প্রায় মেরে ফেলেছ। এক বছর এই রোগে চিকিৎসা ছাড়া থাকা মানে মরে যাওয়া। তোমরা আপাতত রক্ত দাও, আমি অন্য ডোনারের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করিয়ে দিচ্ছি। দেখি কি হয়!'

রক্ত দেওয়া হয়ে গেলে বসে ছিল ওরা ডাক্তারবাবুর প্রতীক্ষায়। নবনী ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, বাবা মরে যাবে না তো?'

'কেউ যদি আত্মহত্যা করে তাহলে আমরা কি করব বাবা!'

'বাবা আত্মহত্যা করেছে?'

সোহাগ জবাব দিল না। দু হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। হঠাৎ নমনী উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'মা, সতীশকাকু!'

চমকে মুখ তুলল সোহাগ। হন্তদন্ত সতীশ কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'অবনী কোথায়? কেমন আছে এখন?'

নবনী জবাব দিল, 'ডাক্তারবাবু বাবাকে স্ট্রেচারে করে ওপরে নিয়ে গেছে। আমরা রক্ত দিয়েছি কিন্তু রক্তের গ্রুপ মেলেনি।'

'সেকি! ঠিক আছে, তোমরা বসো। আমি যাচ্ছি, অবনীর আর আমার রক্তের গ্রুপ এক। কোন চিন্তা করতে হবে না।'

ব্লাড ব্যাঙ্কের দিকে চলে গেল সতীশ প্রায় দৌড়ে। নবনীর হাত আঁকড়ে বসেছিল সোহাগ। এবার ফিসফিস করে সে নবনীকে বলল, 'শোন্!'

নবনী বলল, 'কি?'

সোহাগ আরও স্বর নামাল, 'আমি যে অত টাকা সঙ্গে এনেছি কাউকে বলার দরকার নেই। কেউ যেন না জানে।'

স্বামীর আত্মা

সকালবেলার সদ্য চায়ের কাপ শেষ করেছে সৌরভ, বেল বাজল।

আজ রবিবার, ক্রমাগত বেল বাজবেই। গত রবিবারে দরজা খোলা নিয়ে তৃণার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। হকারের দল, ঝি, দুধওয়ালা থেকে শুরু করে সৌরভের বন্ধুবান্ধব, আসার আর শেষ নেই। আজ সৌরভই দরজা খুলল। খুলে জিজ্ঞাসা করল, 'একি? আপনারা?'

শাশুড়িঠাকরুন গম্ভীর মুখে বললেন, 'খুশি হওনি মনে হচ্ছে?'

'সেকি! আসুন আসুন। হঠাৎ না বলে কয়ে এলেন কেন।' সরে দাঁড়াল সৌরভ।

শ্বশুরমশাই দরজায় দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনু কোথায়?'

'ভেতরে। মানে, রান্নঘরে।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরমশাই শাশুড়িঠাকরুনের দিকে তাকালেন। যেন খুব ঘাবড়ে গিয়েছেন। শাশুড়িঠাকরুন দ্রুত ছুটলেন ভেতরে। তারপরই তাঁর গলা পাওয়া গেল, 'ওগো, এদিকে এসো। তিনু লুচি বেলচে।'

'অ, লুচি বেলচে।' বলে শ্বশুরমশাই ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

সৌরভ কিছুই বুঝতে পারছিল না। শ্বশুরমশাই বাইরের ঘরের সোফায় বসলেন। অগত্যা তাকেও বসতে হল। টেবিলে রাখা খবরের কাগজটি তুলে শ্বশুরমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি রোজ আনন্দবাজার পড়?'

'হ্যাঁ। ছেলেবেলা থেকে ওই কাগজটা...।'

'তুমি কখন বাড়ি ফের? অফিস তো পাঁচটায় ছুটি হয়ে যায়।'

'কোনও ঠিক নেই। আটটা নটা হবে।'

'আমি যখন চাকরি করতাম তখন সাড়ে পাঁচটায় থেকে পৌনে ছটায় বাড়িতে ফিরে আসতাম। অতক্ষণ বাইরে কী কর?'

'এই মানে বন্ধুবান্ধব, ক্লাব—।'

'ভেগ কথাবার্তা। কোন ক্লাবের মেম্বার তুমি?'

'কেন বলুন তো?' থই পাচ্ছিল না সৌরভ।

'তুমি শেষবার আমাদের বাড়িতে কবে গিয়েছ মনে আছে?'

'হ্যাঁ মানে, এত ঝামেলায় থাকি।'

'তিনু ভাইফোঁটায় গেল, তুমি গেলে না। '

'ও ওর ভাইয়ের কাছে গেল, আমি আমার বোনের কাছে গিয়েছিলাম।'

'জামাইষষ্ঠীতে যাওনি।'

'দেখুন বিয়ে হয়ে গেছে বছর আটেক। এখনও ওসব.....।'

'যখন তুমি বিয়ে করেছিলে তখন সাধারণ ক্লার্ক ছিলে, এখন অফিসার।'

'আপনাদের আশীর্বাদ ছাড়া এটা হত না। '

এইসময় শাশুড়িঠাকরুন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দু'প্লেট লুচি আর বেগুনভাজা নিয়ে। সামনে রেখে বললেন, 'ব্যাপারটা কি জানো, আগে মেয়েদের বিয়ে হত এগোরো বারো বছর বয়সে। শাশুড়ির কাছে রান্না শিখত তারা। তাই তাদের বরদের মনে হত মায়ের হাতের রান্না খাচ্ছি। এখন তো বাইশ তেইশের নীচে কেউ বিয়ে করে না। যা কিছু শিখে আসে তা নিজের মায়ের কাছেই শেখে। সে রান্না যদি বরদের পছন্দ না হয়, হতেই পারে পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু মানিয়ে নিতে দোষ কি! তোমার ধর লাল লাল লুচি পছন্দ, তরকারিতে মিষ্টি একদম সহ্য করতে পার না। তিনু আবার মিষ্টি দেওয়ার ধাতটা আমার কাছেই পেয়েছে। হুট করে তো টেস্ট পাল্টাতে পারে না।'

সৌরভ হতভম্ব গলায় বলল, 'এসব কথা উঠছে কেন?'

শাশুড়িঠাকরুন শ্বশুরমশাই-এর দিকে তাকালেন। তিনি মাথা নেড়ে কিছু ইশারা করতে গিয়েই সামলে নিলেন। বললেন, 'খাওয়া যাক। ঠাণ্ডা করে লাভ নেই।'

এইসময় আবার বেল বাজল। সৌরভ গেল দরজা খুলতে। ভবমামা দাঁড়িয়ে আছেন। কলকাতা পুলিশের জাঁদরেল অফিসার ছিলেন। এখনও তাঁর খুব প্রতাপ। ওদের বিয়েটা ভবমামাই দিয়েছেন সম্বন্ধ করে।

'বাড়ির খবর কী?' হুঙ্কার উঠল।

'ভাল'। মিনমিন করে বলল সৌরভ। গত পাঁচ বছর ভবমামা এখানে আসেননি।

'তাহলে বাড়িতে ঢুকতে পারি?' জিজ্ঞাসা করে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে ভবমামা ভেতরে ঢুকলেন। ঢোকামাত্র তাঁর নজরে পড়ল শ্বশুরমশাই লুচি দিয়ে বেগুনভাজা মুড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গলা থেকে শব্দ বের হল, 'যাক! মিত্তিরমশাই তাহলে জামাই-এর বাড়িতে এসে লুচি খাচ্ছেন। আমি তো ব্রেকফাস্ট না করেই ছুটে এলাম।'

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'আপনি কি লুচি খাবেন?'

'নো। শসা-টোস্ট, ঘি এবং জেলি ছাড়া আর দু-মুঠো মুড়ি। ভবমামা সোফায় বসলেন। বসেই জিজ্ঞাসা করলেন 'আমার ভাগ্নে হয়ে তুমি, তুমি—।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' সৌরভ কাতর গলায় বলল।

'লুচি খাও! তুমি জান না লুচি একটা মানুষকে খুন করতে পারে?'

'সপ্তাহে একদিন। আমাকে মা প্রতি রবিবার সকালে লুচি ভেজে দিতেন।'

'দিদির কোনও ডিসিপ্লিন সেন্স ছিল না। তোমার বাবা ব্লাড সুগার, ক্লোরোস্টাল, ইউরিক অ্যাসিড কাম হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন ওইসব খাবার খেয়ে খেয়ে। আমি তো দিদিকে

বলেছি জামাইবাবুকে তুমিই খুন করেছ। তাই আত্মগ্লানিতে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করল।' ভবমামা সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

শ্বশুরমশাই-এর লুচি বেগুনভাজা পোরা হাঁ-মুখ বন্ধ হল না, 'সৌরভের মা আত্মহত্যা করেছেন একথা বিয়ের আগে বলেননি কেন?'

'বললে বিয়ে দিতেন না?' ভবমামা সটান জিজ্ঞাসা করলেন।

'আলবত দিতাম না।'

'ব্যাপারটা ভাবার বিষয়। জামাইবাবু মারা যাওয়ার পর দিদির মনে বৈরাগ্য এল। তিনি লুচি পরোটা মাছ মাংস তো ছাড়লেনই, চব্বিশ ঘণ্টায় একবার বিকেল সাড়ে তিনটের সময় চারটি ভাত আর একটু তরকারি খেতেন। তারপর সারা বিকেল-সন্ধে-রাত অম্বলের জ্বালায় জ্বলতেন। কাউকে কিছু বলেননি। যখন ধরা পড়ল তখন সিরোসিস অব লিভার। বেশি মদ্যপান করলে যে রোগ হয়। তা আপনি একে আত্মহত্যা বলবেন না মিত্তিরমশাই? জামাইবাবু যদি আমার মতো শসা টোস্ট মুড়ি খেতেন তাহলে দিদিকে বিধবা হতে হত না, আর তাহলে সিরোসিস অব লিভারের প্রশ্ন উঠত না।'

এই সময় শাশুড়িঠাকরুন একটা শসা চার পিস করে কেটে দুটো সেঁকা পাঁউরুটির সঙ্গে নিয়ে এলেন। সঙ্গে এক বাটি শুকনো মুড়ি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'চা খাবেন তো?'

'কোথাকার চা?', ভবমামা জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরটা সৌরভকেই দিতে হল, 'কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে।'

'মাই গড। কোন বাগানের চা? দার্জিলিং, ডুয়ার্স না আসাম?'

'হ্যাপি ভ্যালি।'

'গুড। চিনি এবং দুধ ছাড়া।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে না হতেই আবার বেল বাজল। সৌরভ দরজা খুলে দেখল রোগাসোগা একজন দাঁড়িয়ে আছেন।

সৌরভ জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন?'

'আপনি মিস্টার সৌরভ দত্ত?'

'হ্যাঁ।'

'আমি লোক্যাল থানার ওসি।'

'ও।'

'আপনার স্ত্রী কোথায়?'

'রান্নাঘরে, লুচি ভাজছে।'

'লুচি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'গ্যাসে, না কেরাসিনে?'

'গ্যাস শেষ হয়ে গিয়েছে। কাল দেবে বলেছে। কেরাসিনেই ভাজছেন।'

'মিস্টার ভবরঞ্জন বসু আপনার মামা?'

'হ্যাঁ। উনি ভেতরে আছেন।'

'ও, তাই নাকি?' ওসি ভেতরে এলেন। এসে শ্বশুরমশাইকে বললেন, 'আমি এসে গিয়েছি মিস্টার বোস।'

ভবমামা বললেন, 'জীবনে প্রমোশন হবে না।'

'আমি ঠিক,.....' ওসি থতমত হয়ে গেলেন।

'কেরাসিনের ভয়ঙ্করত্ব জানা সত্ত্বেও আপনি কোনও স্টেপ নিলেন না। উল্টো এখানে এসে মিস্টার বোস মিস্টার বোস করছেন। আমদের আমলে রিটয়ার্ড সিনিয়ার অফিসারদেরও আমরা স্যার বলতাম।' ভবমামা গম্ভীরমুখে শসা চিবোতে লাগলেন।

ওসি ব্যস্ত হয়ে উঠতেই শাশুড়িঠাকরুন তাঁকে জানালেন স্টোভ নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, আপাতত চিন্তার কোনও কারণ নেই। শ্বশুরমশাই ওসিকে বসতে অনুরোধ করলেন। ওসি চেয়ারে বসে ভবমামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার, এবার কী করতে হবে?'

ভবমামা শাশুড়িঠাকরুনকে বললেন, 'মিসেস মিত্তির, আপনি শুরু করুন।'

শাশুড়িঠাকরুন শ্বশুরমশাই-এর দিকে তাকালেন, তিনি মাথা নাড়লেন। শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'কী বলব! এসব তো আমাদের আমলে কখনও ছিল না।'

'কীসব?' ওসি জিজ্ঞাসা করলেন।

ভবমামা বলে উঠলেন, 'হচ্ছে না। এভাবে হবে না। বউমা কোথায়? বউমা?'

তৃণা মাথা নিচু করে এসে দাঁড়াল রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে।

'এঃ, সাতসকালে ঘেমেনেয়ে একসা হয়ে গেছে। এত টেনসন হচ্ছে কেন তোমার?'

সৌরভ বলল, 'আজ্ঞে রান্নাঘরে খুব গরম তো!'

'গরম যদি মনে হয়ে-থাকে তাহলে ফ্যান লাগাওনি কেন?'

'গ্যাস স্টোভ নিভে যাবে যে।'

'রাবিশ। হ্যাঁ বউমা, ইদানীং তোমার কী হয়?'

তৃণা বলতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর সৌরভের দিকে তাকাল, 'তুমি কিছু মনে করবে না তো? বিশ্বাস কর, আমি একটুও বিশ্বাস করি না, তবু ভয় হয়।'

ভবমামা বললেন, 'ভয় হয়? ওসি নোট করুন। কেন ভয় হয়?'

'খবরের কাগজ পড়ে!'

'কী পড় তুমি?'

'গত তিনমাসে একশো বাইশটা বউ হয় খুন হয়েছে নয় আত্মহত্যা করেছে।'

ওসি চমকে উঠল, 'মাই গড। স্ট্যাটিস্টিকসটা পেলেন কি করে?'

'খবরের কাগজ থেকে। আমি লিখে রেখেছি।' তৃণা দ্রুত একটা খাতা নিয়ে এল। ভবমামা সেটা নিয়ে চোখ বোলালেন, 'মগরার নমিতা মণ্ডল, গুসকরার অঞ্জলি দাস, লিলুয়ার কৃষ্ণা

দত্ত.....ও এগুলো খুনের লিস্ট। আত্মহত্যার লিস্টটা দেখছি বেশ বড়। আত্মহত্যার আবার রকমফের আছে, কেরাসিনের আগুনে, গলায় দড়ি দিয়ে, বিষ খেয়ে, জলে ডুবে, ট্রেনের তলায় মাথা দিয়ে। শেষের দুটোর সংখ্যা দেখছি খুবই কম।'

ওসি খাতাটা চেয়ে নিয়ে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসব খবর কাগজে পড়ে আপনার নিজের জন্যে ভয় করে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কি মনে হয় আপনার অবস্থা এইসব মহিলার মতো হতে পারে?'

তৃণা জবাব দিল না। শাশুড়িঠাকরুন ওর পাশে এসে কাঁধে হাত রাখলেন, 'জবাব দে, তিনু। তোর চিঠি পড়ে আমাদের প্রেসার বেড়ে গেছে। সবাইকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছি।'

হঠাৎ ভবমামা বলে উঠলেন, 'ওই ছোকরা তোমাকে খুন করতে পারে বলে সন্দেহ করছ?'

'আজ্ঞে না। তবে—।'

'তবে কী?'

'ওইসব স্বামীরাও তো ভাল ছিল।' কাঁপা গলায় জবাব দিল তৃণা।

শ্বশুরমশাই বললেন, 'সব জামাই প্রথম প্রথম সোনার টুকরো থাকে।'

ওসি বললেন, 'এক মিনিট। বিয়ের সময় যা যা পণ জামাই চেয়েছিল দিয়ে দিয়েছেন?'

ভবমামা মাথা নাড়লেন, 'নোঃ। সৌরভ এক পয়সা পণ নেয়নি।'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'কথাটা সত্যি।'

'আপনার স্বামীর জীবনে অন্য কোনও মহিলা এসেছে?'

'কী করে বলব?'

'বলব মানে? স্ত্রীদের ঘ্রাণশক্তি ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।' ওসি বললেন।

'আমি বুঝতে পারি না।'

'তাহলে আসেনি। থার্ড পয়েন্ট, আট বছরে আপনাদের কোনও ইস্যু হয়নি?'

'না।'

'এটা একটা সিরিয়াস পয়েন্ট। কিন্তু ম্যাডাম, কী থেকে মনে হল আপনার স্বামী আপনাকে খুন করতে পারেন?' ওসি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার ঠিক তা মনে হয়নি, আবার....। আসলে রেগে গেলে ওর চোখ খুনির মতো হয়ে যায়। তখন চিনতে পারি না ওকে।'

'তাই! রাগে কেন?'

'রান্না ভাল না হলে রেগে যায়, এক কথা বারবার বললে রেগে যায়......!'

'তখনই খুনি-খুনি দেখতে হয়ে যায়?'

'ওর চোখ দুটো।'

ভবমামা শব্দ করে হেসে উঠলেন, 'মাতুল বংশের ধারা। আমারও নাকি ওরকম হয়!'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'আপনি অবিবাহিত, আপনার চোখ নিয়ে কে ভাবছে?'

ওসি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ বাড়িতে আর কে কে থাকেন?'

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'কেউ না। একটা ঠিকে ঝি আছে। সে দেখছি আজ আসেনি।'

ভাবমামা বললেন, 'তাহলে তো বউমাকে সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়। ক্রিমিন্যাল।'

এতক্ষণ সৌরভ অসহায় হয়ে শুনে যাচ্ছিল। এবার না বলে পারল না, 'আপনারা কী বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না। আমি ওকে খুন করতে যাব কেন? তৃণা, তুমি আমাকে এত অবিশ্বাস কর আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'ও তোমাকে অবিশ্বাস করে না। কিন্তু চারপাশে যা ঘটছে সেটা ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। এ বাড়িতে তোমার বাবা মা কাকা জ্যেঠা থাকলে তো ও ভয় পেত না!'

ভবমামা বললেন, 'এটা কী রকম কথা হল? বিয়ের সময় ছেলে বউকে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকবে শুনে খুশিতে ডগমগ হয়েছিলেন, কী হননি?'

'তখন এত খুন আত্মহত্যা হত না।' শাশুড়িঠাকরুন বললেন।

ওসি বললেন, 'দাঁড়ান। আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে দিন। তৃণা দেবী, আপনার কি মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে?'

তৃণা মাটির দিকে তাকাল। তাকিয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'সর্বনাশ। কেন করে?' ওসি চিৎকার করে উঠলেন।

'ও যখন আমাকে ভুল বুঝে রেগে যায়, তখন।'

'আপনি ডিভোর্স চান?'

'ও মা কেন? ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না। পারব না বলে খুন হতে অথবা আত্মহত্যা করতে একদম চাই না।' তৃণা জোরে জোরে মাথা নাড়ল।

ওসি ভবমামার দিকে তাকালেন, 'স্যার, আপনি তো আইন জানেন। আগামের ব্যবস্থা এখানে আছে। আগাম জামিন যেমন নেওয়া যায় তেমনি আশঙ্কার কথা থানায় জানানো যায় আগাম। সেটা কেউ করলে পুলিশ অ্যাকশন নিতে বাধ্য।'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'সেটা আমি লিখিতভাবে জানিয়ে দিচ্ছি।'

ওসি বললেন, 'আপনি নন, ওঁকে জানাতে হবে। সেটা পাওয়ামাত্র আমি সৌরভবাবুকে জানিয়ে দেব যে তৃণা দেবীর আত্মহত্যা অথবা খুনের দায়িত্ব তাঁর ওপরই পড়বে। অন্য কেউ করলেও তিনি রক্ষা পাবেন না।'

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'চমৎকার। আমার মেয়েটা যদি খুন হয়ে যায় তাহলে তাকে কোথায় পাব আমি? খুন যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করুন।'

এই সময় আবার বেল বাজল। সৌরভ উঠল না। তৃণাই গেল দরজা খুলতে। একটা বারো তেরো বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে, 'কালোর মা তোমাদের বাড়িতে কাজ করে?'

'হ্যাঁ। কেন রে?'

'আমাকে বলতে পাঠাল আজ আসতে পারবে না। কাল আসবে।'

'কী হয়েছে ওর?'

'কাল রাতে কালোর বাপ মারা গিয়েছে। বডি আনতে হাসপাতালে গেছে সবাই।'

'সেকি, কী করে হল?'

'কী করে আবার? মাল খেয়ে গাড়ির তলায় পড়েছে। সবাই বলছে কালোর মা বেঁচে গেল। খুব প্যাঁদাত তো। কান্নাকাটি করছে না। আমায় বলল খবরটা দিতে।'

এ ঘরের সবাই শুনছিল সংলাপগুলো। ওসি বললেন, 'ও, ওই লোকটার বউ বুঝি এখানে কাজ করে! হ্যাঁ, কাল মারা গিয়েছে। গিয়ে ফ্যামিলিটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। যাক গে, সৌরভবাবু, আপনাকে আমার শুধু একটা কথা বলার আছে। মেয়েদের মন খুব টেণ্ডার হয়, সাবধানে হ্যাণ্ডেল করবেন। আচ্ছা চলি স্যার।'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সৌরভ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি বিয়ে করেছেন?'

'না। কেন? ও, আরে বইতে তো পড়েছি। কুসুম কোমল। হে হে হে।' ওসি চলে গেলেন।

ফিরে এসে সৌরভ বলল, 'তৃণা, আমার মনে হয় তোমার বাপের বাড়ি চলে যাওয়া উচিত।'

'একদম নয়। বিয়ের পর কেউ বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকে নাকি।' তৃণা প্রতিবাদ করল।

'এই যে আজ যা করলে—।'

'আমি কিছুই করিনি। দেখেছ মা, খামোকা আমাকে দোষ দিচ্ছে। একটু পরেই ওর চোখ লাল হয়ে যাবে, ঠিক খুনির মতো।' তৃণা মায়ের কাছে চলে গেল।

ভবমামা বললেন, 'না সৌরভ, চোখ লাল করার অভ্যেস ছাড়ো। আমার মনে হয় এখন তোমার উচিত ছোটদি, তোমার মেজমামি, বড়মামিদের ডেকে এনে পালা করে বাড়িতে রাখা। আমিও মাঝে মাঝে থাকতে পারি। আপনারাও আসুন। কী বলেন?'

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'জামাই-এর বাড়িতে তো বেশিদিন থাকা শোভন নয়, মেয়েজামাই আমাদের ওখানে পাকাপাকি থাকতে পারে।'

তৃণা বলল, 'এখন না মা। কটা দিন দেখি, তারপর বলব।'

দুপুরের স্নানখাওয়া শেষ করে ওঁরা বিদায় নিলেন। সৌরভের মনে হচ্ছিল বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। তৃণাকে সে এত ভালবাসে, তবু ও তাকে এতটা সন্দেহ করে! কেউ সন্দেহ করলে তার মন জোর করে পরিষ্কার করা যায় না। কালোর বাবার সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য নেই। তবু লোকটা মদফদ খেয়ে জীবনটা তার মতো উপভোগ করে গেছে। নিজেকে প্রচণ্ড অপমানিত বলে মনে হচ্ছিল তার।

এইসময় তৃণা কাছে এল, 'এই, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?'

সৌরভ জবাব দিল না।

'আসলে জানো তোমার সঙ্গে আমার অনেক কিছু মেলে না।'

'এতদিন বলনি তো?'

'বললে তুমি শুনতে? আমার যা করতে ইচ্ছে করে তা তোমার ভয়ে করতে পারতাম না।'

'তাই নাকি? যেমন?'

'যেমন ধরো, আমার কোনও ছেলেবন্ধু নেই। বিয়ের অগেও ছিল না, এখন তো কথাই ওঠে না। কিন্তু বইতে পড়ি দ্রৌপদীর সখা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তোমাকে ওই ইচ্ছের কথা বললে তুমি শুনতে?'

'বেশ তো, এখন যাও না, শুধু কৃষ্ণ কেন আরও চার পাণ্ডবকে ডেকে আনো।'

'ধ্যাত। ওটা বিশ্রী ব্যাপার।' তৃণা চলে গেল, যেন লজ্জা পেয়েছে।

রাত্রেও তেমন কথা হল না। কথা বলতে ইচ্ছেই করছিল না সৌরভের। কিন্তু সে খুব চেষ্টা করে ক্রোধ সংবরণ করছিল।

পরদিন সকালে কালোর মা এল, 'কাল কামাই করতে হল, কিছু মনে কারো না বউদি। লোকটা হাজার হোক মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছিল। বডি বের করে না পুড়িয়ে থাকি কী করে!'

'তোমার একটুও কষ্ট হয়নি?' তৃণার গলা।

'নাঃ। বেঁচে থাকতে যা কষ্ট দিয়েছে তাতে সব হয়ে গেছে।'

'এক ফোঁটা কাঁদোনি?'

'না। কাঁদব কেন? বেঁচে গেছি আমি। ও না মরলে আমাকে ঠিক খুন করত।' কাজে লেগে গেল কালোর মা।

পায়ে পায়ে ঘরে এল তৃণা। বিছানায় বসে পাথর হয়ে কথাগুলো শুনছিল সৌরভ। তৃণা এসে ওর গায়ে ঠেলা দিল, 'এই কী ভবছ? যাঃ, এরকম করে বসে থেকো না। বিধবা হবার কথা ভাবলে আমার এখনই কী কান্না পায়! এই জানো?'

'তখন কেঁদে কি লাভ হবে।' অদ্ভুত গলায় গলায় বলল সৌরভ।

'শুনেছি বিধবা বউ কাঁদলে স্বামীর আত্মা শান্তি পায়। বাঙালি মেয়ের উচিত স্বামীকে শান্তি দেওয়া, তাই না? ওঠো বলছি।' তৃণা হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল।

রেগে যেতে যেতেও নিজেকে সামলে নিল সৌরভ। চাপা গলায় বলল, 'তুমি আমাকে অপমান করছে।'

তৃণা চেঁচাল, 'মোটেই না। আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। আমি আত্মহত্যা করলে বা খুন হলে পুলিশ তোমাকে ধরতই। সারাজীবন ধরে জেলে যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে তা থেকে বেঁচে গেলে, একটু কৃতজ্ঞ হও, প্লিজ।'